সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রমা

প্রমা প্রকাশনী

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭

SAMARESH BASU'S SRESHTHA GALPA

a collection of Bengali Short Stories

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী । ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ

কলকাতা-১৭

মুদ্রক

হরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস । ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট । কলকাতা-৬

বাঁধাই

এ. জি. বাইণ্ডার্স । ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

নবনীতা দেবসেনকে
আন্তরিক প্রীতিসহ

গল্পক্রম

জীবনকে জানতে জানতে নিজেকে

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে যে দিগন্ত বারে বারে উন্মোচিত তা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার, চেতনার, উপলব্ধির এবং পুরুষার্থ আবিষ্কারের স্বকীয় বার্তা বহে এনেছে। তার মূল কথা প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যদি সংক্ষেপে সংহৃত করে আনতে চাই, তবে তা হল আজকের জটিল জীবনে ব্যক্তির সঙ্কট। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আদাব'-এই এ বিশিষ্ট উপলব্ধিটি সেদিনের অমানবিক পরিস্থিতিতে মানবিক মূর্তি ধারণ করেছিল। এই মানবিকতা, ব্যক্তির একান্ত অন্তর্জগৎকে এই নির্দ্বিধ স্বীকৃতি দান, শ্রীবসুর গল্পে সর্বদা অম্লান। 'আদাব', 'প্রতিরোধ', 'জলসা' থেকে 'সানা বাউড়ির কথকতা' পর্যন্ত সমরেশ অবশ্যই প্রত্যক্ষ একটা দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সেই বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির অভিভাবকত্বের মধ্যে এই তরুণ লেখক বিস্মৃত হননি তাঁর স্বোপার্জিত বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান। সেদিন আমরা যারা সমরেশের সমবয়সী ছিলাম, আমরা যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোঠুলিপরা আলোর মধ্যে কৈশোর পার হয়ে যুবক হয়েছি, আমরা যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে শিখেছি, তারা সমরেশের লেখা পড়ে সেদিন লাফিয়ে উঠেছি। তার কারণ ছিল। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমাদের অগ্রজেরা সমাজ বাস্তবতার যে সব তত্ত্ব মনন দিয়ে মণীষা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ধীরে ধীরে এবং মহাকালের রথের টানে অনিবার্য ভাবে হয়ে উঠছিল আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী। সমরেশ আমাদের উপলব্ধির সেই বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের যুগের প্রথম লেখক নন, কিন্তু একমাত্র লেখক যিনি আমাদের সাহিত্যে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। সে দিগন্তটি রাজনীতির লাল মশালে জ্বালা দিগন্ত নয়। অন্য বামপন্থী লেখকের সঙ্গে সমরেশের পার্থক্য এখানে যে, সমরেশ জেনেছিলেন যে, সংঘসত্য নয়, জীবনসত্যই তাঁর লক্ষ্য। অনেক পরে শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে সমরেশ বলেছিলেন—লিখি জীবনকে জানার জন্য। একথা তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলি সম্বন্ধে খুবই সত্য। এ সময়ে তাঁর অনেকগুলি লেখার মধ্যে ব্যবহৃত হ'ল উত্তর চব্বিশ-পরগণার চটকলকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলের নিচেতলার জীবন। এতদিন বাংলা-সাহিত্যে এই অঞ্চল থেকে, এর জলমাটি কাদা বস্তি গঙ্গার পাড় থেকে, এর

ধোঁয়া কুয়াশা, জট ও বঞ্চনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে—এরই ভিতর থেকে কোনো লেখক দেখা দেননি। এতদিন আমরা যারা এ অঞ্চলের অধিবাসী আমরা জেনেছিলাম, যাকে জীবনবৈচিত্র্য বলে তা বুঝি এই পাটকল উপনগরীগুলির বুকচাপা ধোঁয়াশা ও ধূসরতায় চিরকালের মতো অবলুপ্ত। সমরেশ দেখালেন আদিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো খাপড়ার চালের ঘিঞ্জি বস্তি, জেটির চন্‌চনি, খাটাল, দেহ ব্যবসার শস্তা পল্লী, কুলিলাইন, বিমর্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত গেরস্থালি এবং ইত্যাদি এবং ইত্যাদির মধ্যে মহানাগরিক কল্লোলিনীর সমান্তরাল বয়ে চলেছে জীবনের ভোগবতী। এই শিল্পাঞ্চলের যদি কোনো টোপোগ্রাফি থাকে, যদি থাকে তারই মধ্যে কোনো পিক্‌টোরিয়াল এলিমেণ্ট, সমরেশ তার সম্পূর্ণ ব্যবহার করলেন। আমাদের মনে আছে 'উরাতিয়া' গল্প, মনে আছে 'ফুলবর্ষিয়া'। মনে আছে সেইসব গল্প যখন একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে, পাঠকশ্রেণী প্রতিবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল গ্রহণে ও বৈমুখে, বরণে ও প্রত্যাখ্যানে। কিন্তু একটা ব্যাপারে এ-ঐকমত্য কখনো খণ্ডিত হয়নি যে, এই সব গল্পে এমন কিছু আছে যা, আর কোনো লেখক কখনো হাতে করেননি। লেখক পাঠক সমালোচকমাত্রেই জানেন—শুধু সাহস থাকলেই এ কাজটা সম্পন্ন হয় না। বিষয়, 'থীম্' বিষয়ার্থ সম্বন্ধে একটা গভীর প্রত্যয়ও থাকা দরকার। অন্য বামপন্থী গল্প লেখকেরা কেউ কেউ যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যর্থ মার্কস্‌বাদী পর্যায়ের অনুবর্তন চর্চায় মগ্ন ছিলেন, অথবা মোদ্দা কথাটাকে গল্প ভেবে সংঘনির্দেশ পালন করছিলেন, সমরেশ তখন তাঁর গল্পকার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্তির শ্রেণীরূপ ও ব্যক্তিরূপের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার সন্ধানী হয়েছেন। আরোপিতের অন্তরালে যে স্বরূপ তাকে খুলে আনতে চেয়েছেন। প্রতীয়মান ও বাস্তবের মধ্যে জটবাঁধা গ্রন্থিলতাকে সব সমেত তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ক্রমশ নিজেরই মধ্যে একটা জায়মান উপলব্ধিকে তিনি আর অস্বীকার করতে পারছিলেন না, জীবনকে জানার জন্যই লেখা। প্রথম পর্যায়ের গল্পে এই লেখকের আর অর্জিত কৃতিত্বের কথা এখানে উল্লেখ্য। জীবনকে জানতে গিয়েই তিনি যথার্থ মার্কস্‌বাদীর যেটা করণীয় সেটা করলেন। শ্রেণী কথাটির মধ্যে অবশ্যই একটা অর্থনৈতিক সংজ্ঞার্থ স্বতঃব্যক্ত থাকে। সমরেশ তাকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু একথাটাও তিনি বুঝেছিলেন সমাজ যে শ্রেণী পরিচয় কোনো ব্যক্তির গায়ে ঝুলিয়ে দেয় তা ব্যক্তিটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কৌশল। বাইরের ছক, ছাপ, ছাদগুলির আড়ালে যে সে স্বরূপতঃ অখণ্ড মানুষ। তার নামরূপের আর স্বরূপের মধ্যে

যে ব্যবধান বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে, সমরেশের প্রতিটি গল্পে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—কখনো বঙ্কিম, কখনো ঋজু, কখনো ক্ষুব্ধ, কখনো ক্রুদ্ধ। এবং আমরা যারা সমরেশকে অনেকদিন ধরে 'অশ্লীল' বলে অভিযুক্ত করলাম—এমন কি বুর্জোয়া আদালতেও, তারা ভেবে দেখলাম না, সমরেশের ঈষৎ জ্যেষ্ঠ যাঁরা সেদিন লিখছিলেন, পাংশু আঙ্গিকচর্চার নাম করে যাঁরা সেদিন আত্মলীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন, তাঁরা যথার্থ বলতে কি সেদিন ব্যস্ত ছিলেন মধ্যবিত্তের মসৃণ বর্তুলতায় কতখানি বা কতটুকু টোল খেয়েছে সে কথা বলতে। ফুলবরিয়া, এস্‌মালগার, অকালবসন্ত বা পাড়ি প্রভৃতি গল্পে পক্ষান্তরে ছিল জীবনের বেগার্ত বাঁকে দাঁড়িয়ে ফেনিল অথচ গহীন স্রোতাবর্তকে প্রত্যক্ষ করা।

'পাড়ি' গল্পটির একটু নিবিষ্ট পাঠ আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অবান্তর নয়। 'কাজ নেই তাই বসেছিল দুটিতে' বলার পরেই শুরু হয়েছে পটভূমি বর্ণনা। তিনটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে একটা উদ্দেশ্যহীন নদীচরের ছবির পরেই প্রধান রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত – এবার এল হিংস্র জলস্রোতের বর্ণনা। প্রতিকূল জড় প্রকৃতি আর তার মুখোমুখি দুটি নরনারী। অষ্টম অনুচ্ছেদের আগে তাদের নারীত্ব বা পুরুষত্ব স্পষ্ট নয়। 'সহসা মনে হয় পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে'। তারপর স্তরে স্তরে আকাশে জমতে থাকে মেঘ, দাপটে ঝাপটে বেড়ে ওঠে ঝোড়ো হাওয়া—আর এই দুই নরনারীর প্রাণান্ত লড়াই ঘন হতে থাকে জলের সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে। গোল গল্প বলতে যা বোঝায় তা এখানে নেই। মোদ্দা কথাটি কত স্বল্প! ওরা শুয়োরগুলিকে ওপারে নিয়ে যেতে পারল। কিন্তু সমরেশ জানেন মূল কথা আর মোদ্দা কথা এক ব্যাপার নয়। মূল কথাটি হল লড়াইটা—মূল কথাটি হল এই লড়াইয়ের প্রতিটি মুহূর্ত এই দুই নরনারীর পারস্পরিকতায় ভরাট হয়ে যাওয়া। সেটাই গল্প। যদি মাস্টারি বুদ্ধিতে আমরা কেউ ভাবি, প্রতীকী ঘটনায় লেখক এই কথা বোঝাতে চাইলেন যে, হাজার প্রতিকূলতাও এদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, তাহলে তা ভাবতেই পারি। কিন্তু এ গল্পের সার কথা হল—এরা পাড়ি দেবেই—বারবার পাড়ি দেবে, দুজনে মিলেই দেবে। গল্পটা শুরু হবার একটু পরেই বোঝা যায় চোরাটানের মতো একটা নাতিপ্রচ্ছন্ন নাটক রয়েছে। সে নাটকের কুশীলব—মানুষ, পশু ও প্রকৃতি। পায়ের নিচে মাটি হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নাটকের শুরু, আর ঘূর্ণির সঙ্গে লড়াই সে নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্তের উদ্যোগ। এত কিছুর মধ্যেও নারীপুরুষের মানসিকতা কেমন আলাদা অথচ সম্পূরক। গল্পটিতে মানুষের

দারিদ্র্য নিয়ে হা-হুতাশ নেই, বৃথা সহানুভূতি জানানোর প্রয়াস নেই, শোষক শ্রেণীর প্রতি মুখস্থ কটূক্তি নেই—আছে আমাদের ভারতীয় সমাজবিন্যাসে যারা সব থেকে নিচেতলায়, তাদের সাহস, শ্রম ও বীরত্বের যে গৌরবের খবর তারা নিজেরাও রাখে না, সেই খবর। গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদটি সফলশ্রমের অন্তে মিলিত নারীপুরুষের পরম প্রশান্তির অনুচ্ছেদ।

সমরেশের প্রধান গল্পমাত্রেইএস্টাব্‌লিশমেন্ট্‌ বিরোধী গল্প। সে গল্প একটা কথা বারে বারে আমাদের দেখায় যে আক্রমণাত্মক না হয়েও এ গল্প কত নির্মম সমাজসমালোচক হতে পারে। সেখানে সমরেশ আপোষহীন। 'এস্‌মালগার' গল্পটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি। শিশু বা কিশোর বয়সীরা এই সমাজব্যবস্থায় পেষিত, লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হচ্ছে—এটা সমরেশের একটা প্রিয় বিষয়। আমার মনে পড়ে,আমাদের মফস্বল ইস্টিশনের সামনের রেস্তোরাঁয় বসে বসে সমরেশ কতদিন গোর্কি বা চেখভের এ জাতীয় গল্পের কথা বলেছে। 'এস্‌মালগার', 'পেলে লেগে যা' প্রভৃতি গল্পে সমরেশ রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে কোনো দাম না পাওয়া—বরং পীড়িত লাঞ্ছিত কিশোর মানবতার কথা বলেছেন। এস্‌মালগার গল্পের চালের চোরাচালানকারী ছেলেটি সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের থেকে অনেক বেশী মানবিক—গল্পটি সে কথাই বলে। 'পেলে লেগে যা' গল্পে সামাজিক দৃষ্টিকে লেখক সূচীমুখ করেননি। তীব্র করে তুলেছেন পেলের সমাজ নিয়তির শোচনীয়তা।

একটা কথা আমরা প্রায় বলে থাকি—সেটা হল সমরেশের বিস্তৃত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর যে কোনো গল্পই প্রমাণ করে তাঁর অসামান্য তথ্যজ্ঞান, প্রমাণ করে তাঁর অনুপুংখ সম্বন্ধে নির্ভুল অবধানতা। কিন্তু মাত্র এইটুকুর জন্য আমরা তাঁর গল্প পড়ি না। অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে ঘিরে যে মানসিক বাতাবরণ সৃষ্ট হয় সেটাই তাঁর গল্পের টান। এবং এই বাতাবরণ সৃষ্টির মূলে একটা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে নিশ্চয়, কিন্তু তার থেকেও বেশী আছে জীবন সম্বন্ধীয় একটা এ্যাটিট্যুড। একটা নৈতিক প্রেক্ষণবিন্দু। যথার্থ জীবন সমালোচনা সেই প্রেক্ষণবিন্দুর দান। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা সেই সমালোচনার ফল। 'অকালবৃষ্টি' গল্পটিতে হয়তো তারাশঙ্করী মেজাজ খানিকটা টের পাই—কিন্তু এ অনুভবে কোনো ভুল নেই যে বিষয়ার্থটি সমরেশের স্বোপার্জিত। 'অকাল বসন্ত' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটির আদল আসে ঠিকই, কিন্তু চরিত্রপাত্র নির্ণয়ে ও লক্ষ্যনির্দেশে গল্পটির রসপরিণাম স্বাতন্ত্র্য পায়। 'অকাল বৃষ্টি', 'অকাল বসন্ত' ও 'পাড়ি' সমরেশের এক পর্যায়ের

গল্প নয়। প্রকাশকালের দিক থেকে একথা বলছি না। বলছি সমরেশের বলবার কথা, বলবার মেজাজ, বলবার চালের দিক থেকে। প্রথম দুটি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে জীবন সম্বন্ধে দরদ, তৃতীয় গল্পটিতে প্রকাশিত হয়েছে জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা। প্রথম দুটি গল্পের চরিত্রপাত্রেরা মধ্যবিত্ত জীবনের অপভ্রংশ। তৃতীয় গল্পটি মেহনতী মানুষের বীর্যবান দাম্পত্য বন্ধনের স্মারক। প্রথম দুটি গল্পে লেখক চরিত্রপাত্রগুলির গল্প বলছেন—তৃতীয় গল্পে গল্পের চরিত্রপাত্র আর তিনি এক হয়ে গেছেন। প্রথম দুটি গল্প পরিণামমুখী। তৃতীয় গল্পে তথাকথিত কোনো ঘটনাপরিণাম নেই। প্রথম দুটি সমরেশের প্রস্তুতিপর্বের গল্প, তৃতীয়টি তাঁর পরিণতির পতাকাবহ। প্রথম দুটি গল্প আবারও আর কেউ লিখতে পারেন—তৃতীয় গল্প যদি ফের লিখতে হয়, সমরেশকেই লিখতে হবে।

ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার বিপন্ন অভিজ্ঞান নিয়ে পাঁচের দশকের ক্রান্তি লগ্ন থেকেই সমরেশ ভাবিত হতে থাকেন। এই ভাবনা কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধৃত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অস্তিত্বের যে নিগূঢ় সঙ্কট ব্যক্তিচিত্তে কালো হয়ে উঠছিল, সমরেশের কোনো কোনো গল্পের চরিত্র সে সঙ্কটকে অঙ্গীকার করেছে। 'স্বীকারোক্তি' গল্পটি তার এই জাতীয় গল্প। এই গল্পের 'আমি'-কে লেখকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য প্রলুব্ধ হওয়া সঙ্গত নয়। স্বীকারোক্তির 'আমি', বিবর-এর আমি লেখক সৃষ্ট চরিত্র। এই দুই চরিত্র 'থীম'। উপাদান, প্যাটার্ন সব দিক দিয়ে পৃথক। সে কারণেই স্বীকারোক্তি খুব উন্মুক্ত গল্প। এ গল্প শুরু হয়েছে '…তারপর বলে, শেষও হয়েছে 'তারপর…' বলে। দুই 'তারপর'-এর মাঝখানে গল্পের মূল চরিত্রপাত্রের ঘটনাগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিলোকের সমাহার, তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তাস্রোতের মিশ্রণ সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া। 'তারপরে' বুঝিয়ে দিচ্ছে অনেক অভিজ্ঞতা আহৃত হয়েছে, 'তারপর' বলে দিচ্ছে আরো অনেক কিছু ঘটবে। এই অভিনব কাঠামো বা গল্পের গঠন শৈলীর মূল উদ্দেশ্য হল চরিত্রটিকে খুলে রাখা। খুলে রাখার কারণ তার সঙ্গে আমরাও তর্ক করতে পারি। তার যে স্বাধীনতা তিনটি স্তরে ব্যাহত হয়েছে, যে তিনটি স্তরে সে লাঞ্ছিত হয়েছে—তার মধ্যে কতখানি স্বাধীনতার সঙ্গে অন্বিত রয়েছে দায়িত্বের চেতনা এ প্রশ্ন আমরা চরিত্রটিকে করতেই পারি। পার্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, আর দাম্পত্য সম্পর্কে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অন্বয়ে টানা হেঁচড়া এক মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। কিন্তু লেখক চরিত্রটিকে নিয়ে গেছেন অন্য একটা রোহভূমিতে, দিয়েছেন অন্য একটা মাত্রা। দুঃখের, যন্ত্রণার, গ্লানির একটা ক্ষমতা আছে—এগুলির কারণসমূহের কোনো শ্রেণীবিভাগ সে ঘটতে দেয় না। এই

গল্পের চরিত্র সে ব্যাপারটি খুব সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। চরিত্রটিকে আমরা সমর্থন করি কিনা এ প্রশ্ন লেখক তুলতে চাননি। তিনি যে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন তা হল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রশ্ন। তার জীবনে তিনটি জটিল সূত্র একটা অমোচনীয় গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে। যে কোনো একটাই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে সংখ্যাবাহুল্যে কিছু আসে যায় না। শেষ প্রতিপাদ্য ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা। এতক্ষণে নিশ্চয় 'পাড়ি' গল্পের কথা আবার আমাদের মনে পড়ছে। মনে পড়ছে দুই নরনারীর সেখানে ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্নটা বরং ছিল কত অচ্ছেদ্য সেই যুগলসম্বন্ধ—লেখক কত গভীর শ্রদ্ধায় সে সম্বন্ধের জয়গান করলেন। এটা কোনো নতুন কথা নয় যে ব্যক্তির অনন্বয়ের ছবি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের আধারে বারে বারে পরিবেষিত হয়েছে, ব্যক্তির লড়াই, অমোঘ প্রতিকূলতাকে জয় করার সংকল্প, অথবা হারের মুখেও সে প্রতিকূলতার বিপরীতে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাঁর শ্রমজীবি মানুষের গল্পে ফুটে ওঠে। জীবন ছেড়ে দেবার সামগ্রী নয়, ফুলবর্ষিয়া ঝড়ের আকাশের নিচে নদীর পাশে ছুটতে ছুটতে নিজেই ঝড় হয়ে গিয়ে একথাই বলে। 'ষষ্ঠ ঋতু' গল্পের গগন হয়ে ওঠে সব শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পেরিয়ে বসন্তের প্রতীক। অথচ এমন তো নয় নিচের তলার মানুষের জীবনে জট নেই, গ্রন্থিলতা নেই। 'পাপপুণ্য' গল্পটির কথা স্মরণ করি। প্রথম উক্তিটি তো এই যুগের সকল মানুষের সব অভিজ্ঞতার শেষ কথা! একথা ঠিক, সমরেশ দার্শনিক নন। তিনি হতেও চান না দার্শনিক। কিন্তু চোখ মেলে, মন মেলে জীবনকে বুঝে নিতে চান। 'লড়াই' গল্পটি পড়তে পড়তে একথা স্বতঃই মনে হবে গোটা জীবন বুঝি এই রূপকে প্রতিবিম্বিত। জয় বা পরাজয় নয়, পাওয়া বা না পাওয়া নয়, নিরন্তর যে প্রয়াসের জীবনান্ত সংকল্পে মানুষ ছুটন্ত, সেই প্রয়াসটাই জীবন। বদি বাচ্ছে মুখোমুখি হতে "জীবনের সঙ্গে, আর মনের সঙ্গে এইরকম আমাদের সামনাসামনি দাঁড়াতে হয় বাবা বদি"।—যে জলচরটির সঙ্গে বদির লড়াই তার সম্বন্ধে বদির কোনো আক্রোশ নেই—'সেও বাঁচবার জন্য আসে। আমিও বাঁচবার জন্য আসি।' 'কিন্তুন আমি মাছমারার ছেলে, তোর সঙ্গে আমার হারজিতের খেলা।' এ খেলায় জীবনটাকে বাজি রাখতে হয়। 'মানুষকে ক্ষুধা দিয়েছেন উনি, আর তার জ্বালায় লড়তে বলেছেন, বুইলি কিনা বাবা'—এই লড়াইটা আসল কথা। দক্ষিণের বাদা অঞ্চলের পটভূমিতে জল-জলচর আর মানুষের গল্প। ভয়ানক আর বীভৎস-কে সঞ্চারী হিশাবে ব্যবহার করে এখানে অঙ্গীরস হয়ে উঠেছে বীররস। লেখক কোথাও সচেতন ভাবে প্রতীকী হতে চাননি। কিন্তু যে অর্থে জীবনের পরম সত্য

মাত্রেই প্রতীকী আলম্বন, সেই অর্থে এ গল্পও প্রতীকী।

প্রত্যেক বড় লেখকের মতো সমরেশের লেখাতেও মৃত্যু একটা পৌনঃপুনিক মোটিফ। যে মৃত্যু মানবিক অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই মৃত্যুকে জীবনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে লেখক ব্যবহার করেন। লড়াই—শুধু 'লড়াই' কেন, সমরেশ বসুর বেশ কিছু গল্পে জীবনের গৌরব ও অপচয়, সম্পদ আর অবক্ষয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মৃত্যু। লড়াই গল্পের প্রথমাংশের ফ্যাণ্টাসি থেকে শেষ প্যারার কঠিন বাস্তবতা পর্যন্ত বিবৃত কাহিনীতে মাছ-মারাদের জীবন-মরণের নিষ্ঠুর কঠিন ভবিতব্য প্রাধান্য পেয়েছে। জ্যাক লণ্ডনের কোনো কোনো গল্পের মতো এখানেও অভিনবত্বে নয়, অভিজ্ঞতার বিচিত্রতায় নয়, মানবতার রসগ্রহণে লেখকের সাফল্য আসল কথা। কত নির্মম এই আজকের জীবন, কত নিষ্ঠুর! তারই মধ্যে ক্ষীণ কিন্তু বেগবান বয়ে চলেছে জীবন, হোক তার উপল ব্যথিত গতি। 'মরেছে প্যালগা ফরসা' আমাদের বহু আড়ম্বর আর বহু আত্মতৃপ্তির বালির প্রাসাদ ভেঙ্গে দেয়। এই গল্পের ছোট ছেলেগুলি আমাদের এত কাছে থাকে অথচ কত দূরে! কিন্তু সেই দুঃখ দুর্দশার ছবিটা বলার জন্য গল্পটির বিষয় লেখকের কাছে আকর্ষক হয়ে ওঠেনি। লেখক দেখিয়েছেন একেবারে তলানি এই প্রাণবিন্দুগুলির মধ্যে কোথা থেকে ভেসে আসে হাস্যের কিরণকণা, কেমন করে আদিম গুহামানবের মতো আস্তানায় ফিরে এসে এরা আহৃত খাদ্য যৌথ সম্ভোগে রত হয়, কেমন করে সেই আস্তানায় তারা বাইরের জীবনের ইমিটেশনে আনন্দ পায়। প্যালগার শববাহী ছেলেগুলির হুল্লোড় তাদের প্রাণোচ্ছ্বাসের অবরোধের প্রতীক। সে অবরোধ এ মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে সব ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চায়—কিন্তু আরও ভিতরে থেকে যায় সবে জেগে উঠছে এমন একটা সর্বনাশা শিশু ঘূর্ণি। অনাড়ম্বর এ গল্পের ভাষা। যেখানে জীবন সব থেকে ধূসর, সব থেকে ম্লান, সেখানে ভাষাও সব থেকে বহতা অথচ অথবা সেজন্যই উচ্ছ্বাসহীন।

শহীদের মা, ফটিচার, সোনাটরবাবু, ছুলে বাড়ির ভাত গল্পগুলিতে লেখকের অন্তর্জগত কত সংবেদনশীল, মানুষের অষ্টাবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মানবিক কৌতূহল কত সজাগ, তার পরিচয় অবশ্যই পাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করি তাঁর গল্পের টেকনিক। সেই বিশিষ্ট কথন শৈলী তিনি আয়ত্ত করেছেন জীবনকে জানতে জানতে। আবার নিজেকে জানতে জানতে সেই টেক্‌নিক্‌ও পেয়েছে বিকাশধর্মিতা। জানতে চাওয়ার রূপ ও রূপান্তর ধরে বদলেছে তাঁর গল্প বলার কলা কৌশল। নিছক স্টোরিপ্রধান গল্প নয়, যে গল্পের আপাত বর্ণবিরল

ঝিনুকের দুই পাটির মধ্যে লুকুনো থাকে আশ্চর্য মুক্তা, জীবন নামক সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে লেখক তাকে তুলে আনেন। 'আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাহিনীবিহীন গল্পের মধ্যেও অন্তঃস্রোতে একটি আশ্চর্য প্রবাহ বহে চলে।'—এ উক্তি সমরেশের। তথাকথিত গল্পবিহীন গল্পের মধ্যে যে অন্তর্নাট্য গূঢ় স্রোতের মতো টানে, ভাসায় ডোবায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলে দেয় বৃহত্তর উপলব্ধির তটে সেই ফল্গুনাট্য লেখকের একাধিক গল্পে অনুভূত। এটাই সমরেশের গল্পের আঙ্গিকরীতির গোড়ার কথা, শেষের কথা।

জীবনকে জানার পালা শেষ করে সমরেশ নিজের জানার পালা শুরু করেছেন—এমন ধরনের পর্যায়ভাগ করা যাবে না। কেননা স্বীকারোক্তি যখন লেখা হয়েছে তখন থেকে সমরেশ আরেকটা পর্যায়ে প্রবেশ করেছেন এমন কথা বলবো কী করে! স্বীকারোক্তির পরেও তিনি লিখেছেন পেলে লেগে যা, মরেছে প্যালগা ফরসা—অর্থাৎ জীবনকে জানতে জানতেই তো নিজেকে জানা। নিজেকে জানতে জানতে জীবনের গভীরে চলে যাওয়া। পারস্পরিক এই আলোকসম্পাতে পূর্ণতা পায় লেখকের শৈল্পিক সত্তা। নিজেকে ছিঁড়ে-কুটে দেখতে না জানলে সমাজকে ছিঁড়েকুটে দেখা হবে কী করে। গল্পলেখক সমরেশ বসু তাই আজও অফুরন্ত।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অকাল বৃষ্টি

'আবার তুই মেয়েমানুষ এনে তুললি এখানে।' জিজ্ঞাসা করল ভূতেশ হালদার তার কটা ক্রুদ্ধ চোখ তুলে।

'হাঁ, আনলুম।' কথা শেষ করে দেওয়ার মত একটা ভাব করে কোমরের কাছ থেকে কাপড় সরিয়ে দাদ চুলকোতে লাগল সিধু ডোম।

আর যে মেয়েমানুষটিকে আনা হয়েছে সে বুড়ো বেঁটে গাট্টাগোট্টা বটতলার চালাটার দরজায় বসে তার দীর্ঘ চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে মুখ টিপে টিপে হাসছে এদের দুজনার দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে।

ওদিকে পাঁচিল দিয়ে আড়াল-করা শ্মশানের মধ্যে একটা মড়া পুড়ছে। তাপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মড়া বয়ে-আনা দলটি পশ্চিম দিকের ঘাটে গঙ্গামুখো বসে নিজেদের মধ্যে জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটা খুব উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত। শ্মশানের কুকুরগুলো নেশাখোরের মত জুলজুলে চোখে লেজ গুটিয়ে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে, মুলো বাড়িয়ে ছাই আর পোড়া কাঠের গাদা ঘাঁটছে, নয়তো তাদের লাল দগদগে মুখের বিশাল কশ বিস্ফারিত করে লোভিষ্টির মত দেখছে মড়া পোড়ার দিকে।

ভাঁটা পড়ে গঙ্গা নেমে গেছে অনেকখানি। অগ্রহায়ণের গঙ্গা, জল খানিক স্বচ্ছ। স্রোতস্বিনী গাঙের মত গঙ্গা কলকল করে বইছে। তরঙ্গায়িতা গৈরিক সুরেশ্বরী যেন ছেয়ালো একহারা এক কিশোরী মেয়ে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। বটগাছের উপর মাটির দিকে ঘাড় নোয়ানো শকুন-গুলোর চোখ কানা হয়ে যাচ্ছে। রাতকানা পাখি ওরা।

আগে গঙ্গার ধারে ধারে ঘাটে-অঘাটে মড়া পোড়ান হত! এখন এ গাঁ হয়েছে চটকল শহর। মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে মস্ত বড়। কোন এক চটকলের সাহেব এ শ্মশান তৈরি করে দিয়েছে। ইটে খোদাই করে ইংরেজীতে লেখা আছে, এস্ট. ১৯২৬। মস্ত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও শ্মশান। মড়া যখন পোড়ে তখন দূর থেকে মনে হয় বুঝি কোন চটকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পুবদিক ঘেঁষে বটতলায় ডোমচালার মেঝেটা ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভূতেশ হালদার তার ছোট ছোট কটা চোখের চোরা দৃষ্টিতে মেয়েটাকে একবার দেখে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াল যেন একটা লম্বা ছিপছিপে পোড়া কাঠ। কালো নয়, গায়ের রংটা ছাই ছাই। সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা ঘোড়ার নাকের মত লম্বা, চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। কানে একটা হলদে পেন্সিল গোঁজা, গায়ে তার শরীরের অনুপাতে নিতান্ত ছোট খাকী শার্ট, গঙ্গার জলে কাচা লালচে ধুতি, দশ হাত হলেও হাঁটুর বেশি নিচে নামেনি।

এই হল ভূতেশ, চিত্রগুপ্তের অবতার অর্থাৎ মৃত্যু রেজিস্ট্রার। মাইল কয়েকের

এলাকার মৃত্যুর খতিয়ান তার কাছে। নামধাম, কারণ অকারণ, স্ত্রী কি পুরুষ, মৃতের চৌদ্দপুরুষের ঠিকানা লেখা আছে ভূতেশের চটের সুতো দিয়ে বাঁধা মোটা খাতাটায়। এই হল তার আসল পদমর্যাদা, বাকি কাজটুকু স্যানিটারি ইনস্পেক্টরের অ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে সকালের কয়েক ঘণ্টা এদিকে ওদিকে ঝাড়ুদার মেথরের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ান। তবে এটা হল ফালতু কাজ। মাইনে ত্রিশ টাকা। নামের গেরোতেই বোধহয় তাকে এ কাজটি বেছে নিতে হয়েছে। এখানকার লোকে অন্তত তাই বলে। মৃত্যু-রেজিস্ট্রার হিসাবে তার এখানকার সহকর্মী হল সিধু ডোম। দোহারা শক্ত কালো শরীর, চোয়াল ওঠানো গাল, আ-ছাঁটা গোঁফ, একজোড়া কালো কুচকুচে মস্তবড় টেরা চোখ। একমাথা কালো পাঁশুটে ভেড়ার লোমের মত কোঁচকানো চুল। রেজেস্ট্রি হয়ে গেলে চিতায় কাঠ সাজায় সে, মড়া তোলার আগে শত শোক ও আপত্তি সত্ত্বেও মড়ার গায়ের জামাকাপড় খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে, মরা মেয়েমানুষের গায়ে গয়না থাকলে চেষ্টা করে তা খুলে নেওয়ার। সে হিসাব রাখে এ চাকলার কাকে পোড়াতে কত কাঠ লেগেছিল, কাকে আধা পোড়ানো হয়েছিল, কার কোন অঙ্গটা পুড়েছিল আগে, কিংবা লোকে যেমন শুকনো ও ভেজা কাঠের গুণ বর্ণনা করে, তেমনি কার মড়া পোড়াবার পক্ষে বেশ খনখনে ছিল বা স্যাঁতসেঁতে ছিল তার হিসাবও সে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে পারে।

ভূতেশ যদি চিত্রগুপ্ত হয়, সিধু ডোম তাহলে সাক্ষাৎ যম। সিধুর অবশ্য ধারণা, এটা তার রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত এ জীবনের ভোগান্তি, আগামী জন্মটা তার ভালই হবে।

তারা দু'জনে এ গাঁয়েরই মানুষ। তারা বলে গাঁ, লোকে বলে শহর। উভয়ে তারা ছোটকাল থেকে পরিচিত। তবে একজন হল ডোম, অপরজন বামুন। মেলামেশা তাদের সম্ভব ছিল না, দরকারও ছিল না, আর আজ দীর্ঘ দশ বছর ধরে একই সঙ্গে কাজের মধ্যে থেকে ভূতেশ 'বাবু' থেকে সিধুর কাছে 'ঠাকুর' হয়েছে। সম্পর্কটা ঠিক বন্ধুত্ব না হলেও রেজিস্ট্রিবাবু আর ডোমের মর্যাদাপূর্ণ ফারাকটা যেন নেই। একজন কথায় কথায় ইংরেজী বলে, অপরজন রেগে গেলে বলে হিন্দী। ভূতেশকে উঠতে দেখে সিধু বলল, 'একটা বিড়ি দেও দিনি ঠাউর।'

'বিড়ি নেই।' বলে ভূতেশ একটা বিড়ি পকেট থেকে নিয়ে তার নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল।

বিড়ি এখন পাবে না বুঝেই সিধু চিতার কাছে গিয়ে তার হাতের পোড়া লাঠিটা দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া আগুন উসকে দিল, দগ্ধ মৃতদেহটা দিল উলটে পালটে এবং দিতে দিতে আগুনের তাতে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল সে, ঠাকুর মেয়েমানুষ দেখলেই এমন খেপে যায় কেন?

যাদের মড়া, তাদের একজন বলল, 'একটু আস্তে সুস্থে দাও বাবা, এমন ঠ্যাঙাড়ের মত করছ কেন?'

সিধু হেসে বলল, 'মরতেও এত, তবু তো ঠেকে রাখতে পারলে না বাবু।' মনে

মনে বলল, 'আর শালা আমি য্যাখন মড়ার জামাটা চাইলাম ত্যাখন তো দরদ দেখা গেল না।'

কথাবার্তা একটু চেপেচুপে না বললে বখ্‌শিসটা ফাঁক যাওয়ার সম্ভাবনা। ভূতেশেরও পাওনা আছে। তবে ভূতেশ সেটাকে বখ্‌শিস বলে না, বলে রেজিষ্ট্রির নজরানা। পাওনা বলতে পারে না, কারণ দাবির ব্যাপার নয় ওটা। তা ছাড়া কারণে-অকারণে ভূতেশ নানান রকম গণ্ডগোল করে থাকে। আইবুড়ো মেয়ের মড়া হলে তো কথাই নেই। সে তার ঘোড়ার মত লম্বা নাক ফুলিয়ে কটা খটাশ চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করবে, 'কী হয়েছিল মেয়েটার?'

'কালাজ্বর।'

'হুঁ, কিন্তু মড়াটা থাক্, কালকে মেডিকেল অফিসার এলে দেখে অনুমতি দেবে।'

'কারণ?'

বুঝুক না বুঝুক, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ভূতেশ বলে, 'কী করব মশাই, এ রকম কত সুইসাইড কেস্ কিংবা এই ধরুন যুবতী মেয়ে কোন গোলমাল করে ফেলল, সেটাতে গিয়ে হয়তো ফসকে গেল জান। তখন—'

অপর পক্ষ থেকে হয়তো প্রশ্ন আসে, 'তা এটাও সেরকম মনে হচ্ছে নাকি?'

ভূতেশ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'হয়তো নয়। তবে বোঝেনই তো, হুকুম আছে, কোনরকম সন্দেহ-টন্দেহ হলে।...আমি তো আর ডাক্তার নই।'

ফলে কখনো হয়তো পকেটে পাঁচ-দশ কিছু এসে পড়ে, নয়তো গালাগাল আর শাসানি। কিন্তু ঢিল একবার ছুঁড়ে দিলে যা হোক একটা হবেই। পয়সা এলে ভূতেশ আরও গম্ভীর হয়ে বলে, 'খামোখা বকালেন। যাই হোক, ডোমের পাওনাটা মিটিয়ে দেবেন। না হলে রাতভর মড়া আটকে রেখে মেডিকেল অফিসারকে খবর দিতে ছোটে সকালে।' সিধু ডোম এ সময়ে তার নিষ্পলক ট্যারা চোখে ঠাকুরের মারপ্যাঁচ লক্ষ্য করে আর মনে মনে তারিফ করে। কথা চলে। শ্মশানের কুকুরগুলোর মতো উৎসুক নিবিষ্ট চোখে মুখের কশ বিস্ফারিত করে নীরবে হাসে সে।

সিধু ফিরে এসে দেখল তখনও ভূতেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ঠোঁটের কোণে বিড়িটা গেছে নিভে। গাঁয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন যাবার জন্য পা বাড়িয়ে কিছু মনে পড়েছে তার। আর মেয়েটা আঁট করে খোঁপা পিটিয়ে পিটিয়ে বেঁধে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সিধু ফিরে এসেছে টের পেয়ে পেছন ফিরেই ভূতেশ বলল: 'আবার বলছি, মিছে এ সব ঝঞ্ঝাট করিস্‌নি। শ্মশানে মেয়েমানুষ নিয়ে কেউ থাকে না! এর আগে যে মেয়েটাকে এনেছিলি, দেখলি তো সেবারের মড়কে ছুঁড়ি পালিয়ে গেল। মড়া ঠ্যাঙাচ্ছিস মড়া ঠ্যাঙা, ওসব রমজানি কেন?'

সিধু সবেমাত্র তাড়ির ভাঁড় নিয়ে প্রথম চুমুকটা দিয়েছিল। হঠাৎ সেই পুরনো স্মৃতিটা ঠাকুর উসকে দিতেই ভাঁড়টা নামিয়ে নিল সে মুখ থেকে। তার ট্যারা চোখের ভাব বোঝা দায়। মনে হল যেন জবাব দিতে গিয়ে অসহায় বোধ করছে সে। পর-

মুহূর্তেই আর একটা চোখের তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে শুধু সাদা ক্ষেত্রটি চকচকিয়ে উঠল। গোঁফজোড়া মুচ্‌ড়ে দিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'তুমি কি ঠাউর তোমার মতো হতে বলছ আমাকে? তা হবে না। একটা পালিয়েছে, এই তো ধরে নিয়ে এসেছি আর-একটাকে। ক'টা পালাবে। যত পালাবে, তত আনব।'

'হ্যাঁ, তোর জন্যে মেয়েমানুষ হতো দিয়ে পড়ে আছে।'

'ঠাউর, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'নেলো বকিস্‌নি। ভাত তোর ঘরে হাঁড়ি ভরতি, না? বলে তাড়ির দাম যোগাতে পারিস্‌নে, ভাত ছড়িয়ে কাক ডাকবি।'

কথাটা নির্মম সত্য এবং তার নিয়ে-আসা মেয়েমানুষের সামনেই ভূতেশ ব্যঙ্গ করে সে কথা বলে তার বুকে অসহ্য জলুনি ধরিয়ে দিল। কয়েক ঢোক তাড়ি গিলে সে হঠাৎ বলল, 'বউ নিয়ে তো কখনো ঘর করলে না ঠাউর, এ সবের আদর তুম নহি সমঝেগা।'

চকিতে ভূতেশ ফিরে দাঁড়ালো। ভাঁটার মত জ্বলে উঠল তার কটা চোখ। পোড়া কাঠের ধারে ধারে যেন লুকানো অঙ্গার আচমকা হাওয়ায় গনগনে হয়ে দেখা দিল। বলল, 'বউ নিয়ে আমি ঘর করিনি, তুই করেছিস, না? ব্লাডি ডোম।'

সিধুর গলা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'তা বেলাডি-ফেলাডি যাতই বল, ওকে কি ঘর করা বলে? এমন অপ্সরীর মত বউ, কন্দর্পকান্তি ছেলে তুমি ত্যাগ দিয়ে রাখলে। পাণ তোমার অমন পাষাণ বলেই না আমাকেও তাই বলছ।'

'আমি পাষাণ আর তোরা সব কাদার মত নরম।' ভূতেশ তার লম্বা লম্বা দাঁত দিয়ে যেন ভেংচে উঠল। পোড়া বিড়িটা ধরাল আবার।

বটগাছের ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নামে অন্ধকার। পাখা ঝাপটানর শব্দ শোনা যায় শকুনের। চিতার কাঠ পোড়ার চড়বড় শব্দে মনে হয় পুঁটকে ফটাস ফাটছে। ওদিকের খেয়াঘাটের নৌকো বুঝি ভিড়ল। এলোমেলো গলার স্বর শোনা যায় দু'-একটা। অনেক অদৃশ্য মানুষের নিশ্বাসের মত হাওয়ায় সরসরিয়ে ওঠে বটপাতা।

মেয়েটা একটা লম্ফ জ্বালিয়ে ভূতেশ-সিধুর মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। গায়ে তার একটা দামী জামা। এ পরিবেশের মধ্যে যেন কাদায় আধ-ঢাকা সোনার চকচকানি। শাড়িটাও নিতান্ত অল্পদামী নয়, আর তার যৌবনভরা বলিষ্ঠ শরীরে আনাড়িভাবে পরনে শাড়িতে তাকে মহাভৈরবী নয়, ইন্দ্রাণীর রূপ দিয়েছে। মৃতদের দৌলতে অমন দু-একখানা জামা আর শাড়ি সিধু ডোমের বেড়ার মাকড়সার ঝুলের মধ্যে গোঁজা আছে। মেয়েটির কালো কালো টানা চোখের রহস্য, বঙ্কিম হাসি লেগেই আছে। শুধু মুখে কোন কথা নেই।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে হঠাৎ ভূতেশ বলল, 'এক পাত্তর দে দিনি তোর ওই ভাঁড়ের মাল।'

শান্ত আর গম্ভীর গলায় বলতে বলতে সে বসল। সিধুর কাছে এসব নতুন নয়। সেজন্য একটা আলাদা ছোট হাঁড়ি বাড়িয়ে দিল ঠাকুরের দিকে। নিজের এঁটো সে

কখনো দেয় না তাকে। কিন্তু ঠাকুর এমন তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বসে খুব কচিৎ যখন এ দুনিয়ার উপর বিরক্তির সীমা থাকে না। নেশার ঘোরে সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে মেয়েমানুষের পিণ্ডি শ্রাদ্ধ করার জন্য প্রাণ তার জ্বলতে থাকে।

পাত্রটি প্রায় নিঃশেষ করার পর ভূতেশের গম্ভীর আর বিদ্রূপ করা গলা শোনা যায়।

'অপ্সরীর মতো বউ আর কন্দর্পের মত ছেলে আমি ত্যাগ দিয়েছি, আমি পাষাণ!...তুই ব্যাটা কানা, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাক্ দিনি?'

ব্যাপারটা না বুঝে সিধু তার ড্যাবা ট্যারা চোখ তুলে ধরল ভূতেশের দিকে। মেয়েটিও তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু তার ঝরব ঝরব করছে।

চোখের কোণ কুঁচকে ভূতেশ বলল, 'আমার কখনো অপ্সরীর মতো বউ হয়, না কন্দর্পের মতো ছেলে হতে পারে—অ্যাঁ? বিয়ের রাতে তোদের অপ্সরী বউ ভয় পেয়ে বলেছিল, 'মা গো, যেন পোড়া কাঠ!' আমি হলাম পোড়া কাঠ। আমার সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারে? কিন্তু তখনো নিজের মুখটা ভাল করে কোনদিন দেখিনি, তাই রাগে ঘেন্নায় মাথায় রক্ত চিনচিনিয়ে উঠল। ফুলশয্যার রাতে পায়ের জুতো খুলে বেধড়ক ঠ্যাঙালাম নতুন বউকে। আহা, দুধে আলতার সে রং, আমার বুক-জ্বালানো সে হাসি ফেটে বেরুল রক্ত আর চোখের জল। পরদিন শ্বশুর লোকজন নিয়ে এসে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। একে হাভাতে বামুন ঘরের আকাট ছেলে, তায় এই কুৎসিত চেহারা আর নামটাও আমার কি চমৎকার বল্ দি'নি? কিন্তু ঘরের লোক অবধি বললে দোষ আমারই। মাস কয়েক পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে ডাক এল, জামাইয়ের ডাক, বুঝলি? গেলাম। অপ্সরী বউয়ের বোন সব উর্বশী শালীরা পালিয়ে গেল আমাকে দেখে। শাশুড়ি এল না দেখা করতে। বউ এল। তার কার্তিকের মত সুন্দর জামাইবাবুর গা ঘেঁষে ভয়ে ভয়ে। ভায়রাভাইরা আমার সঙ্গে কথা বলল না। রাতে শুতে গেলাম। মনের কথা আর তোকে বলব কি, সে জীবনে একবারই হয়েছিল সে অবস্থা। কিন্তু সারারাত বউ এল না। পরদিন দেখলাম বউ তার জামাইবাবুর সঙ্গে হেসে জমিয়ে কথা বলছে। আবার রাত হল, শুতে গেলাম। অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চুড়ির শব্দে জেগে দেখি, অন্ধকার। পাশে হাতিয়ে দেখলাম বিছানা ফাঁকা। উঠে বারান্দার জানালার কাছে গিয়ে দেখি তোদের অপ্সরী বউ ভগ্নিপতির বুকে মুখ গুঁজে বলছে, 'ওই রাক্ষসটার কাছে যদি আমাকে তোমরা পাঠাও গলায় দড়ি দেব আমি।'

বলতে বলতে ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের মত জ্বলে উঠল ভূতেশের কটা চোখ, কান দুটো নড়ে উঠল, মাথার শিরে টান পড়ে, অশনাসারন্ধ্র উঠল ফুলে ফুলে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'যদি সত্যিই রাক্ষস হতুম তা হলে ঘাড় মটকে ওর রক্ত খেতুম আমি, মাইরি! মাইরি বলছি, রাক্ষস হলে এই মেয়েমানুষগুলোকে—'

বাক্‌রুদ্ধ হল তার চালার দরজায় ঠায় তার দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটার উপর চোখ পড়ে। ভয়-বিস্ময়ে বেদনায় সে কালো চোখ বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এক মুহূর্ত

তাকিয়ে থেকে ভূতেশ আচমকা তাড়িশূন্য হাঁড়িটা বটতলায় ছুঁড়ে দিয়ে ছাইগাদায় গিয়ে দাঁড়াল গাঁয়ের দিকে মুখ করে।

সিধুর ট্যারা চোখের ভাষা বোঝা দায়। সে চোখে বিস্ময় না বেদনা, বোঝা গেল না। সে আস্তে আস্তে উঠে ভূতেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শ্মশানের বটতলার আলো-আঁধারিতে মানুষ চেনা যায় না, মনে হয় দুটো কালো কালো প্রেতমূর্তি কাড়ানো ছাইগাদায় দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকিয়ে মতলব ভাঁজছে। যেন প্রতীক্ষা করছে নতুন শব আসবার। তাদের পাশে এসে কুকুরগুলোও জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে গ্রামের দিকে। পাশ দিয়ে খেয়াঘাটের পথ। যাত্রীরা সে মূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়। বলাবলি করে, শালা ভূত দুটো এবার কাকে টানবে তাই দেখছে।

হঠাৎ ভূতেশ বলল, 'কিরে লোহার না ইটের মড়া পুড়ছে যে এখনো শেষ হল না।'

সে কথা বোধহয় ভাবছিল না সিধু। আচমকা একটা নিশ্বাস ফেলে চিতার কাছে চলে গেল। যাওয়ার সময় নিচের হাঁড়িটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে গেল, 'নে, দু চুমুক দিয়ে নে।'

মেয়েটা তাকিয়ে দেখল কিন্তু চুমুক দিল না।

মাটিতে পোঁতা একটা শিশুর তাজা মৃতদেহ মুখে নিয়ে একটা শেয়াল গঙ্গার ধারে চলে যাচ্ছিল। কুকুরগুলোর নজরে পড়তেই অন্ধকারে হাওয়ার বেগে ছুটে গেল সেদিকে।

একগাদা থুথু ফেলে কটূক্তি করে উঠল ভূতেশ, 'ভাল করে পুঁতেও দেয়নি। খা শালারা পেট ভরে।'

মড়া পোড়ানো শেষ হল। ভূতেশ এগিয়ে এল সামনে। মড়াওয়ালা দলের একজন ভূতেশের হাতে একটা টাকা দিল।

'এই দিলেন।' রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল ভূতেশ।

লোকটা বলল, 'ওই নিয়ে নিন দাদা, আর বেশি নেই।' বলে সিধুর দিকে একটা আধুলি বাড়িয়ে দিল।

সিধুর ট্যারা চোখে নির্মম শ্লেষ। বলল, 'ওই পোকাও মড়াটা পুড়োতে মাত্তর আট আনা? বারো আনার তো বাবু তাড়িই খরচা হয়ে গেল।'

'আমরা কি তোমার তাড়ির খরচা যোগাতে এসেছি?' লোকটা বলল।

সিধু হাত উল্টে বলল, 'তা ছাড়া আর খাই কি বাবু? ও পয়সা আপনি মায়ের মন্দিরে গিয়ে দেন গে, জোর তো কিছু নেই।' মনে মনে বলল, মড়ার গায়ের জামাটা দিলেও না হয় কথা ছিল।

লোকগুলো এক বিচিত্র ভয়-ঘেন্না মেশানো চোখে শ্মশানের এ মানুষ দুটোকে একবার দেখে একটা টাকা ছুঁড়ে দিল সিধুর দিকে।

সিধু টাকাটা উঠিয়ে বলল, 'জন্মালে ধাইমাগী আর ম'লে এ ডোম বেটা, এ দু'হাত

ছাড়া তো চলে না বাবু।'

বলে সে চিতা সাফ করতে লেগে গেল। চিৎকার করে চালার দিকে মুখ করে ডাকল, 'আরে হুই, কি নাম তোর, এগিয়ে আয় মাগী।'

মেয়েটা এগিয়ে এল গাছকোমর বেঁধে। শ্মশানের মাঝে এক বেখাপ্পা জীব, গাছ-কোমর বেঁধে শাড়ির রেখায় যার উছলানো যৌবন চলতে ফিরতে গায়ে ঝাপটা দেয়।

মুখ টিপে কটা চোখ খটাশ দৃষ্টি নিয়ে ভূতেশ দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের কাজকর্ম সারা হলে সিধু এসে বলল, 'দেও দিনি ঠাউর বিড়ি একটা এবার।'

'কেন, তাড়িতে হল না?'

সিধুর তাড়িমত্ত লালচোখ হাসিতে বুজে এল।—'তোমার অমন বাবার পেসাদ পোরা বিড়ি! দুটো টান দিলে শরীলের জাম একটু ছাড়ত।'

অর্থাৎ ভূতেশের বিড়ির মধ্যে শুখা তামাক নেই, আছে গাঁজা ভরা। সিধু তাকে বাবার পেসাদই বলে।

ভূতেশ মুখ ভেংচে বলল, 'মাইরি আর কি!'

তারপর কি মনে করে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল সিধুর দিকে। সিধু বিড়িটা মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ছাইগাদা থেকে ধরিয়ে নিয়ে আয় তো!'

মেয়েটা ভ্রূ টেনে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'মাগো! এর মধ্যে গাঁজা পোরা রয়েছে যে?'

'তা নয় তো কি, বিষ রয়েছে?' সিধু বলল ট্যারা চোখ বাঁকিয়ে, 'বিড়ি-গাঁজা ফুঁকতে পারবিনে, পারবিনে তাড়ি টানতে, তবে কি পোড়া মড়া খেয়ে থাকবি?'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল, অমনি ভূতেশ মুখটা বিকৃত করে ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে মেয়েমানুষ নিয়ে রাসলীলা করবি এখানে?'

কী একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে সামনে এসে সিধু নেশামত্ত চোখ দুটো যতটা সম্ভব বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ঠাউর লোকে যে বলে সে কন্দর্পকান্তি ছেলেটা তোমারই?'

'তোমার মাথা স্টুপিড্।' ধমকে উঠল ভূতেশ। মেয়েটা তখন জলন্ত অঙ্গারের গায়ে বিড়িটা ঠেকিয়ে ফুঁ দিচ্ছে। সেদিকে একবার দেখে ভূতেশ ফিরে বলল, 'ব্যাটাচ্ছেলের শিক্ষা হয়নি। দাঁড়া আসুক ফাগুন-চৈত, লাগুক মড়কটা, কে ঠেকায় তোর মেয়েমানুষকে একবার দেখব।'

মড়ক লাগবে এটাও যেমন তার কাছে নিশ্চিত, মেয়েটাও পালাবে সেটাও তেমনি নির্ভুল!

সামনে শহরের ধারে জেলেপাড়াতেই হাফগেরস্ত শৈলী জেলেনীর বাড়িতে তার ঘর। পথটুকু এক লাফে পেরুতে পারলেই যেন ভাল হত, এত তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলো ভূতেশ। মনটা তার ওলটপালট হয়ে গেছে। সিধুর উপর রাগ না

নিজের উপর বিতৃষ্ণা, তা সে নিজেই বুঝল না।

খানিকটা এগুতেই বুড়ো হরেন কৈবর্তের একঘেয়ে কাশির শব্দ তার কানে এল। শৈলীর ভাসুর। কাশে বুড়ো সারা রাতই। মনে হতেই ভূতেশ খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা বুড়ো মলেও দুটো পয়সা আসত পকেটে।'

আর বস্তির ভিতরে যে সব মেয়েপুরুষেরা ঝগড়া লাগিয়েছে তাদের মৃত্যুতে অতগুলো পয়সা পাওয়া দুরাশা ভেবে বোধহয় বলল, 'কবে এ-আপদগুলোর নাম উঠবে খাতায়, কে জানে?' অর্থাৎ তার মৃত্যু-রেজিস্টার খাতায়।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল ভূতেশকে লক্ষ্য করে, 'কোত্থেকে খুড়ো?'

'দক্ষিণ দোর থেকে।' দেখতে দেখতে বাড়ির অন্ধকার গলিটাতে ঢুকে পড়ল সে।

দিন যায়। ভূতেশ সেই সকাল থেকে দুপুর অবধি ঝাড়ুদার মেথরের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ায়। কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো গালাগাল শোনে কিংবা তাকে মধ্যস্থ করেই কেউ হয়তো মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কমিশনারের আদ্যশ্রাদ্ধ করে। কেন না, সে মিউনিসিপ্যালিটির লোক তো? আবার এসব লোকেরাই যখন শ্মশানে শব নিয়ে যায় তখন শত পরিচিত হলেও ভূতেশ তার কটা চোখ কুঁচকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, নাম কী? বয়স কত? বাপের নাম? ঠিকানা? যেন এখানকার জমিদারীটা তারই। এদিক-ওদিক হলে রেহাই নেই।

শীতকাল। শ্মশানের বটগাছটার পাতা ঝরে যায়, ন্যাড়া হয়ে যায় একেবারে। বেশির ভাগ সময় শ্মশান ফাঁকাই থাকে এখন। এ সময়টা মানুষ মরে একটু কম। তবে এটা চটকল শহর, মানুষে ঠাসাঠাসি। গড়ে অন্যান্য জায়গা থেকে অবশ্য মৃত্যুর হারটা এখানে বেশিই।

তবু ভূতেশকে আজ সিধুর বটতলাতেই বেশি দেখা যায়। হ্যাঁ, তার বদ্ধজমাট প্রাণের কোঠায় যেন হাওয়া বইছে। সিধু খুব আড়ালে গিয়ে মাথা নাড়ে আর মনে মনে বলে, হায় রে পোড়া কপাল!

কিন্তু এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ভূতেশ আর সিধুতে। যেন একটা নূতন সংসার গড়েছে তারা এখানে। হিংসা দ্বেষ তো দূরের কথা, তাদের ফাঁকা জীবন যেন পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূতেশ শুধু অবাক নয়, তার সারা গায়ের মধ্যে এক অপূর্ব শিহরণ জেগে ওঠে থেকে থেকে আর নিজের ছাইবর্ণ ধূসর রুক্ষ শরীরটাকে দেখে আঁতিপাতি করে। প্রথম দিনের সে কথা। একে গাঁজাভরা বিড়ি, তার উপরে সিধু আর সে ভাঁড়ের পর ভাঁড় শেষ করে শুধু বুঁদ নয়, একেবারে অচেতন হয়ে পড়েছিল। আর ওই মেয়ে গঙ্গার জলের ছিটা দিয়েছিল চোখে-মুখে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দু' হাতে সাপটে ধরে টেনে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ছাইগাদা থেকে। অচেতন শরীরে চেতন ফিরেই আসেনি, বিড়বিড় করে বার বার বলেছিল, 'আমি যে পোড়া কাঠ, ছেড়ে দাও, ফেলে দাও।'

সে মেয়ে হেসেছিল। সে হাসির নাম জানে না ভূতেশ। মনে হয়েছিল মাতাল। জীবনে এ মাতলামির স্বাদ যে জানত না।

তবু ভূতেশ মাঝে মাঝে বলে ওঠে, 'শ্মশানের মধ্যে মেয়েমানুষ নিয়ে ধ্যালান ছাড় বাপু। ও তো কাটল বলে।'

তারপর তার কটা চোখ দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে সিধুকে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।'

মেয়েটা ভ্রূ বাঁকিয়ে নীরবে হাসে। কখনো বা কপট গাম্ভীর্যে বলে, 'তা বাপু, না ম'লে কে আসে তোমাদের এখানে?'

সিধু হাসে। ভূতেশের কটা চোখের কোঁচকানিতে অবিশ্বাস্য হাসি ওঠে চকচকিয়ে। তারপর তারা তিনজনে বসে অদ্ভুত গল্প জুড়ে দেয়। কোনদিন মড়া পোড়ে, কোনদিন মড়া পোড়ে না। শ্মশানের কুকুরগুলো তাদের ঘিরে শুয়ে বসে।

মেয়েটি কখনো তাদের চা করে দেয়, বিড়ি ধরিয়ে দেয়, মাটির গেলাসে ঢেলে দেয় তাড়ি। নিজেও কোন সময় গেলে দু' এক ঢোক। তারপর প্রাণের আবেগে তিনজনেই তারা খানিকটা সতেজ হয়ে ওঠে। ভূতেশ বলে, 'এক এক সময় মনে হয়, শালা দুনিয়াটাকেই খাতায় তুলে ছেড়ে দিই।' অর্থাৎ তার মৃত্যু-রেজিস্ট্রির খাতায়।

সিধু বলে, 'খাতায় তুলে কি হবে ঠাউর, দিতে হয় চিতায় তুলে দেও, কাজ হবে।'

মেয়েটি বলে অভিমান করে, 'শ্মশানে-মশানে থেকে তোমাদের খালি এক কথা। পুড়ুতেই শিখেছ খালি। আমাকে পুড়ুবার জন্যেই বুঝি হাঁ করে আছ তোমরা? চিতা ধুয়ে তবে গঙ্গাজলের ছিটা দাও কেন?'

জবাবে তারা দুজনে চুপ করে থাকে। খানিকক্ষণ পরে ভূতেশ বলে, 'শুনলি কথা? দেখবি ও ঠিক কেটে পড়বে।'

কোন-কোনদিন সন্ধ্যার পরে দেখা যায় পুরনো ছাইয়ের ঢিপিটায় ভূতেশ সিধু অস্পষ্ট ছায়া নিয়ে দুটো প্রেতের মত গাঁয়ের দিকে কিংবা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজকাল তাদের দুই মূর্তির মাঝখানে মাঝে মাঝে আর একটা মূর্তি দেখা যায়। নারীমূর্তি। অন্ধকারে সে দেহের রেখায় রেখায় কি যে প্রাণ-ভোলানো বাহার! দুই পুরুষের দিকে বারেক তাকিয়ে সে মেয়ে তাদের পায়ের কাছে বসে গুনগুনিয়ে গান গায়:

মা গো, জম্মো দিলি এ সমসারে মেয়ে করে,
তাখন তো বললি না গো, আবাগী আমি অবলা;
আজ যাতই কেন কাঁদিস না মা, (তবু) পাণ যারে চায়,
তার গলাতে পরাব আমি মালা।

নয়তো সাপের মতো দুলে দুলে মোহিনী হেসে গায়:

মুখের ছায়া জলের তলে, মনের ছায়া দেখি না-হয়—
আমার মনের ছায়া তোমার চ'কেতে,
হায়, পোড়া মন এত ঢাকি এত চাপি সব্বো অঙ্গ উদাস করে
তবু ঘোমটা ঢাকা পড়ে না মোর মনেতে।

গঙ্গার বুক থেকে হাওয়া উঠে সে গান ভেসে যায় পথ পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে জেলেপাড়ায়। হাওয়ার গায়ে সে সুর শুনে গাঁয়ের লোকেরা বলে, শ্মশানে বটগাছে শকুনবাচ্চা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

সিধু হয়তো তাড়ি আনার নাম করে চলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে আর আসে না। তারা দুজনে এসে হয়তো দেখে, সিধু ঘরে না হয় বাঁধানো ঘাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোন সময় ভূতেশ হয়তো খুব রেগে এসে মেয়েটির কাছেই সিধুর নামে অভিযোগ করে, 'এ্যাই, একেই বলে মেয়েমানুষ নিয়ে শ্মশানে র‍্যালা চলে না। বললাম রাসকেল, স্টুপিড ড্যাম ডোম ব্যাটাকে যে, দুটো গোরু মরে গেছে আকালীর গোয়ালে। ভাগাড়ে কেন যাবে। তুই নিয়ে এসে ছাড়া, চামড়াটার দাম পাবি, কথার কথা বলছি—শকুনিগুলোরও পেট ভরে। পড়ে তো থাকবে হাড়টা। তাও দেখি, কতগুলি ছোঁড়া আবার হাড় কুড়িয়ে বেড়ায়, কোথায় কোন্ ফ্যাক্টরিতে নাকি দু'পয়সা সের বিক্রি করে। লোকসানটা কোথায় বলতে পার?'

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়, 'এসব তোমরাই ভাল বোঝ ঠাকুরবাবু। চেলা তোমার সারাদিন তো তাড়ি খেয়েই পড়ে আছে। শ্মশান তো আগলাচ্ছি আমি আর ওই কুকুরগুলো।'

কখনো কখনো সিধুর মনে হয়, আর যাই হোক বামুনের ছেলে হয়ে ঠাকুর তা বলে ডোমের ছোঁয়াও খাবে। কিন্তু বলতে ভরসা পায় না, তাই কায়দা করে বলে, 'জান্লে ঠাউর, আজ তোমার ইঞ্জিন সাহেবকে দেখলাম।'

'ইঞ্জিন সাহেবটা কে?'

'তোমার দাদা গো, বড় হালদার।'

ভূতেশ বলে, 'ব্যাটাচ্ছেলে, ইঞ্জিনসাহেব বলছিস কি রে! বল ইঞ্জিনিয়ার।'

'ওই হল।' একটু থেমে ট্যারা চোখে পিটপিট করে বলে, 'দাদা তোমার অতবড় মানুষ, আর তুমি বামুনের ছেলে হয়ে—'

'অনেক বড় রে, অনেক বড়।' ভূতেশ বলে ওঠে, 'ম'লে পরে এ শর্মার কাছে এসেই আমার লায়েক ভাইপোকে তার বাপ-ঠাকুর্দার নাম বলতে হবে।'

'কী বললে?'

ভূতেশ বলে, 'তবে হাঁ, কথায় বলে কেনে বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মুসলমান—এ তিন ঘুঘুই সমান। আমি তো পোড়া কাঠ!'

কিন্তু সিধু তার আগের কথাটার রেশ টেনেই বলে, 'কী বললে? তোমার ভাইপোকে তার বাপ-ঠাকুদ্দার নাম তোমাকে বলতে হবে?'

'হবে বৈকি।'

'ভাইপোর ঠাকুদ্দা মানে তোমার বাপ তো?'

ভূতেশ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'হলই বা। বাপ বলে তো খাতির নেই। আমি তো ডেথ্ মানে মৃত্যু-রেজিস্ট্রার।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সিধু তার ট্যারা চোখ তুলে বলে, 'আচ্ছা বল তো ঠাউর, তুমি মরে গেলে ওই খাতায় তোমার নামটা লিখবে কে?'

জবাব দিতে গিয়ে থমকে থাকে কিছুক্ষণ ভূতেশ সিধুর চোখের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মুখে কোন কথা যোগায় না তার। তারপর লোম-ওঠা ভ্রূ তুলে বলে, 'আর তুই মরে গেলে তোকে পোড়াবে কে, বল্ দি'নি?'

সিধুর ট্যারা চোখও হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পিটপিট করতে থাকে। এক মুহূর্ত দু'জনেই তারা তাকিয়ে থাকে দু'জনের দিকে। তারপরেই মেয়েটি সুদ্ধ তিনজনেই তারা শ্মশান চমকে হাসিতে ফেটে পড়ে।

কিন্তু মেয়েটি আচমকা হাসি থামিয়ে বলে ওঠে ভ্রূ বেঁকিয়ে, 'তোমাদের খালি এক কথা। মরা মরা আর মরা।'

সিধু বলে, 'তা, মরা নিয়েই তো আমাদের কারবার! জ্যান্ত পাব কোত্থেকে?'

এক বিচিত্র অভিমানক্ষুব্ধ গলায় মেয়েটি বলে, 'দেখতে পাও না বুঝি জ্যান্তটাকে?'

ব'লে চকিতে সিধু আর ভূতেশের দিকে চোখের দৃষ্টিতে মর্মঘাতী নালিশ জানিয়ে চলে যায়।

সিধু বলে, 'এ্যাই সেরেছে। কী হল রে?'

ভূতেশ বলে বিড়বিড় করে, 'শালা! শ্মশানে মেয়েমানুষ! দেখিস ও ঠিক কেটে পড়বে।'

শীত যায়, বসন্ত আসে। বোল ধরে আম গাছে। ন্যাড়া বটগাছটায় গজায় পাতা।

ফাল্গুনের হাওয়ায় উদাস করে প্রাণ—গুটি দেখা দেয় গায়ে গায়ে—বসন্তের গুটি।

ভূতেশ রিপোর্ট দেয় পাড়া-ঘরের রোগের, আবার শ্মশানে এসে খাতায় মৃতের নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে। ঝিম্-ধরা শ্মশান থেকে থেকে আস্তে আস্তে আড়মোড়া ভাঙে। কুকুরগুলোর ঝিমুনি আরো বাড়ে, নেশায় যেন বুঁদ। কেঁদো হয় আরও বেশি। বটের শক্ত ডালে শকুনি গৃহিনী চঞ্চু ঘষে ঘষে করে শক্ত, সাপের মতো চোখ নিয়ে গ্রাম-জনপদের দিকে তাকিয়ে খাবার খোঁজে।

কিন্তু বসন্তের ফাঁড়াটা অল্পেসল্পে কেটে গেলেও চৈত্রের শেষে ভূতেশের কথাকে বেদবাক্যি করেই যেন কলেরার মড়ক নেমে এল সারা চাকলা জুড়ে। ইস্! কী দুরন্ত তার বিস্তৃতির বেগ। রোগ ছড়িয়ে পড়ল যেন হাওয়ার দমকে দমকে! আর এ ফাঁকা গ্রাম নয়, শিল্পাঞ্চল। চটকল শহর। সারিবীজের মত ঘন বস্তি ও বাড়ির ভিড়, তার চেয়েও বেশি ভিড় মানুষের, সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে অগুনতি পিঁপড়ের মতো।

ওলাইচণ্ডী রক্ষেকালীর পুজো শুরু হল, শুরু হল পাড়ায় পাড়ায় অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন। হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে সারা এলাকার অল্প ক'টা ডাক্তার, ফেঁপে উঠছে পকেটও। রোজগারের মরশুম এটা।

ভূতেশ তার খাতায় নতুন পাতা জোড়ে, পেন্সিল নিয়ে আসে নতুন। সময় নেই,

সময় নেই, কেবলি মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু। শব শব শব।

চিৎকার, আর্তনাদ, কান্না। কান্না ভয়ের, আতঙ্কের, নিজের প্রাণের।

ভূতেশ বলল সিধুকে তার কটা খটাশ চোখ তুলে, 'শালা শুরু হয়েছে, দে তো তোর সত্‌রঞ্চেটা চার পাট করে পেতে, একটু জমিয়ে বসি।'

সিধুও ক্লান্ত। চিতার আগুনের তাতে তাতে কালো হয়ে উঠছে সে। বেড়ে যাচ্ছে তাড়ি খাওয়া।

মড়ার যেন পাহাড় জমে উঠছে শ্মশানে।

সিধু মাঝে মাঝে খিস্তি-খেউড় করে উঠেছে, 'কে পোড়াবে অত মড়া? টান মেরে ফেলে দেও গঙ্গায়, ভাল গতি হবে।' তারপর মনে মনে ফিস্‌ফিস্ করেছে, 'শালা কাঠ কোথা? মানুষ দে মানুষ পোড়াতে হবে।'

বিড়িতে গাঁজা পোরার সময় নেই ভূতেশের। হাত চলেছে তো চলেইছে। নির্লিপ্ত নির্বিকার চিত্রগুপ্ত। শোকে কেউ ফুঁপিয়ে উঠলে, কেঁদে উঠলে খ্যাক করে ধমকে ওঠে সে, 'ওসব ন্যাকামো রাখো, নাম বল। বাপের নাম? বয়স? রোগ?' একজন যায়, আরেকজন, আরো আরো। এক কথা, এক প্রশ্ন, 'নাম? বাপের নাম? বয়স? রোগ?' বলে যাও, বলে যাও।

কুকুরগুলো মারলেও নড়ে না। শেয়ালগুলো দিনের বেলাতেই এদিক-ওদিক করে বেরিয়ে আসছে ঝোপ-ঝাড় থেকে। গঙ্গার ধারে ধারে শকুনের ভিড়। হাওয়ায় ভাসে যেন কোন অশরীরী প্রেতিনীর একটানা কান্নার ঢেউ।

এখন পোড়ানো মানে আধপোড়ানো, আধপোড়ানো মানে চিতায় একবার শোয়ানো, কিংবা একই চিতায় কয়েকটা শব। কাঠ নেই, ছোট ছোট চিতা। সিধু মটমট করে মৃতের হাত ভেঙে পা ভেঙে কোনরকমে ঢুকিয়ে দিচ্ছে চিতার মধ্যে। কেউ বারণ করলে চেঁচিয়ে উঠছে, 'তবে পুড়াও এসে তুমি। দেখি তোমার তাগদ। দেবে তো আট আনা কি চার আনা!'

হ্যাঁ, ক্রমাগত রেট কমে আসছে কি ভূতেশের কি সিধুর।

মেয়েটি মাঝে মাঝে যোগান দিচ্ছে ভূতেশ-সিধুর চা। একে তাড়ি, ওকে পুরে দিচ্ছে বিড়িতে গাঁজা। কিন্তু বাক্‌রুদ্ধ হয়েছে মেয়েটার, দম আটকে আসছে বুকের। আর তো সে পারে না! মড়া মড়া মড়া। কেবলি মড়া! আর ওই ভূতেশ ঠাকুর আর সিধু। সেই হাসি মস্করাই বুঝি সত্যি যে, ওরা চিত্রগুপ্ত আর যম। শুধু ওরাই জীবিত, নির্লিপ্ত, নির্বিকার।

কখনো ভূতেশ কখনো সিধুর চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। শ্মশানের ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন তার মুখ। বাঁধা নেই বিনুনি, আঁচল সরিয়ে লতিয়ে দেওয়া বুকে সাপের মতো।

ভূতেশ ও সিধু চোখাচোখি করে আর তাকায় মেয়েটার দিকে। তারপর ভূতেশ বলে, 'দেখছিস একবার ওর চোখ-মুখ! ওরে, কেলেবামুন, পোড়া কাঠ হলেও চিত্রগুপ্তের বেদবাক্যি! ও কাটল বলে।'

সিধুর গলা জড়িয়ে আসে। ঢুলুঢুলু ট্যারা চোখে তাকিয়ে বলে, 'এটা কাটবে, আবার আসবে।'

'ড্যাম ডোম কোথাকার!' ঘোড়ার মতো লম্বা নাকের ভিতর থেকে ফাঁস ফ্যাঁস করে শব্দ করে ভূতেশ। হঠাৎ গলার স্বরটা তার মোটা ও চাপ হয়ে আসে, 'আবার যদি এসব ফিকির করিস্ তবে তোর নামই আমি খাতায় উঠিয়ে ছাড়ব।'

অসীম ক্লান্তির সঙ্গে সিধু বলে, 'ঠাউর, দুনিয়াটা তো পেরায় খাতায় তুলে ফেল্‌লে।'

'যা বলেছিস্ সিধে। চিত্রগুপ্তের খাতাটা বড় সস্তা হয়ে গেছে।' বলে বিড়ি ধরায় সে।

এক-একটা দিন কাটে না, যেন মাস কাটে। কিংবা বুঝি বছর।

হঠাৎ আকাশে মেঘ করে আসে, গুম্ গুম্ শব্দ ওঠে মেঘের ডাকের।

ঘরে ঘরে ডাক পড়ে, আয় আয় আয় আয়, আয় বৃষ্টি আয়, নেমে আয়, নেমে আয়।

অপলক ট্যারা চোখে চালা থেকে সিধু এসে দাঁড়াল ভূতেশের সতরঞ্চির সামনে। ভূতেশ তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। একমাত্র সে-ই জানে প্রাণভরে বৃষ্টিকে সেও ডাকছিল কি না, নাকি ওই শকুনগুলোর মতো ভিজে-ওঠা ঠাণ্ডা শ্যামল পৃথিবীতে অনাহারে গন্ধ শুঁকছিল আকাশের দিকে মুখ করে।

সিধু বলল, 'ঠাউর, কেটে পড়েছে ছুঁড়ি।'

'অ্যাঁ?' চমকে ফিরল ভূতেশ। যেন কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। পর-মুহূর্তেই রেজেষ্ট্রি খাতাটার দিকে চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'শালা, বেদবাক্যি, বেদবাক্যি!'

গুরু গুরু গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠল আকাশ। তবু একটুও হাওয়া নেই, বদ্ধ গুমোট।

সিধু বলল ট্যারা চোখ ছোট করে, 'শ্মশানেও রেহাই নেই, মেয়েটা মরে গেছে গো ঠাকুর, ওলাউঠায়। বেদবাক্যি বটে তোমার।'

'মরে গেছে? ওলাউঠায়?' ভূতেশের কটা খটাশ চোখের চারপাশে মাকড়সার জালের মতো হাজার রেখা ফুটে উঠল। চালার দরজাটার দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল সে, 'এ কখনো আমার বেদবাক্যি নয়, কখনো নয়।' সিধু মেয়েটার শব এনে সামনে শুইয়ে দিল।

মরা মেয়ের এলানো চুল, নোংরা জামা-কাপড়। আর সারা মুখখানি এক অপূর্ব শান্ত সুষমায় ভরা। আধবোজা চোখের পাতা দুটো খুলে দিলে বুঝি এখুনি সেই বিচিত্র লজ্জায় হেসে উঠে বসবে, হয়তো গুনগুনিয়ে উঠবে 'মাগো, জম্মো দিলি এ সমসারে মেয়ে করে…'

ভূতেশ সিধু পরস্পর একবার চোখাচোখি করল। দু'জনেই তারা বোধহয় কিছু

বলতে চায় এ মেয়েটিকে নিয়ে। কিন্তু বলল না।

তারপর গম্ভীর মুখে ঠোঁট টিপে মৃত্যু-রেজিস্ট্রার কান থেকে পেন্সিল টেনে নামাল, আঙুলের ডগায় জিভের থুথু লাগিয়ে পাতা উল্টে চলল। তারপর থেমে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম কি?'

সিধুর ঠ্যারা চোখ ভাষাল না। বলল, 'কি জানি ঠাউর, মাগী বলেই তো ডাকতাম। তবে ওর মা ওকে ডাকত, কি বলে তোমার গো, সুলোচনা বলে।'

তার হাতের পেন্সিল কেঁপে উঠল এই প্রথম। তারপর খস্‌খস্‌ করে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে নামটা লিখে ভূতেশ ঠায় গঙ্গার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'বলেই গেলি ড্যাম ডোম, সুলোচনা মানে জানিস?'

সিধু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি জানি ঠাউর। অত মানে বুঝলে কি আর মরা ঠ্যাঙাই।'

ভূতেশ কয়েকবার খ্যাকারি দিয়ে চোখ বুজে বলল, 'সু মানে সুন্দর, বুঝলি ব্যাটা? আর লোচনা মানে চোখ যার।'

সিধু বলল মুখ ফিরিয়ে, 'হবেই বা। তা ওর চোখ দুটো তো—'

আবার মেঘ ডেকে উঠল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে কালো হয়ে উঠেছে আকাশ।

'ওর বাপের নাম?' পেন্সিল তুলল আবার ভূতেশ।

'জানি নে ঠাউর', বলে সিধু কাঠ কোপাবার কুড়ুলটা নিল তুলে।

'তবে, স্বামীর নাম?'

কুড়ুলটা কাঁধে তুলে বলল সিধু, 'মিছিমিছি যদি লেখ, তবে—আমার নামটা লেখ।'

ভূতেশের আঙুল অযথা নড়ে উঠল। চোখ বুজেই বলল, 'আর যদি সত্যি সত্যি লিখি?—'

'এত ন্যাকামোও তুমি জান ঠাউর!' বলতে বলতে সিধু সরে গেল।

দূর গঙ্গার জলের দিকে চোখ মেলে তাকাল ভূতেশ তার খটাশ দৃষ্টি দিয়ে। ঠোঁটটা বেঁকিয়ে সে বিড়বিড় করতে লাগল।

'লিখব, লিখব, মিছিমিছিটাই লিখব চিত্রগুপ্তের খাতায়! কেবল—'

মরা মেয়ের মুখের দিকে তাকাল সে! মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা, গঙ্গাজলের ছিটা আর পোড়াকাঠের প্রাণের মাতলামি। 'সুলোচনা!'…ঠোঁট নড়ল তার। গলার পেশীগুলি ভিতর থেকে ঠেলে উঠল।—ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল সে, 'ভূতেশ হালদারের খাতায় সত্য নাম লিখব।'

ঘাড় গুঁজে এলোমেলোভাবে খস্‌খস্‌ করে লিখে গেল সে। কী লিখল সে নিজেই জানে না বোধহয়।

সিধু সব ঠিকঠাক করে চিতায় তুলে দিল মেয়েটিকে। তারপর আগুন ধরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘরে জমানো সব কাপড়গুলো এনে চিতার উপর ফেলে দিল আগুনে।

আকাশে আকাশে দুরন্ত মেঘের কলরব। হাওয়া উঠেছে, মেঘ ছুটেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। হয়তো বৃষ্টি হবে, কিংবা কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ বাতাসে।

শকুনগুলো উড়ে উড়ে গাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, কুকুরগুলি জ্বলজ্বলে চোখে একবার আকাশ, একবার মাটি, একবার চিতাটার দিকে দেখছে।

ভূতেশ গিয়ে দাঁড়াল সেই বটতলায় পুরানো ছাইগাদায়। সিধুও দাঁড়াল এসে। আজ আর মাঝখানে তাদের কেউ নেই। কেউ নেই অন্ধকারে বঙ্কিম চোখে আলো ফুটিয়ে, শরীরের রেখায় প্রাণ-ভোলানো রূপের লহর তুলে গুনগুনিয়ে ওঠবার, 'হায় আমার মনের ছায়া তোমার চ'কেতে।......'

কেবল অস্পষ্ট ছায়ার দুটো প্রেতমূর্তির মত গাঁয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

অনেকক্ষণ পরে ভূতেশের মোটা গলা শোনা গেল। 'জান্‌লি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।'

অকাল বসন্ত

অবশেষে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। বর্ষার শেষ, শরতের শুরু। যাই যাই করে তবু বর্ষা এখনো যেতে পারেনি। তার কালো মুখের ছায়া টুকরো টুকরো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে আকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়েছে সেই মেঘের গায়ে। হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লাল ছোপ ধরে গেছে সেই মেঘে। উড়ে চলেছে দিক হতে দিগন্তরে এই মফস্বল শহরের কারখানা ইমারত ও অসংখ্য বস্তির ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

অনেক অলিগলি পেরিয়ে ভেলো অর্থাৎ ভালোরাম আর একটা রুদ্ধশ্বাস কানা-গলির মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে তার অভয়পদ। প্রৌঢ় ভেলো এখানকার স্থানীয় লোক। কাজ করে একটা সামরিক যানবাহনের কারখানায়। অভয় তার কারখানার কর্মী, ভারি ট্রাকের ড্রাইভার। কিন্তু বিদেশী। ভেলো তাকে একটা ঘরের সন্ধান দিয়েছে তাই সে চলেছে তার নতুন বাসায়। সামগ্রী বলতে হাতে তার একটা টিনের স্যুটকেশ ও ছোট বিছানার বাণ্ডিল। গলিটাতে দিনের বেলাও অন্ধকার। দু-পাশে ঘন টালি ও খোলার চালা গলির মাথায় আর একটা দীর্ঘ চালার সৃষ্টি করেছে। আকাশ দেখা যায় না, এক ফালি রুপোলী পাতের ঝিলিকের মতো মাঝে মাঝে দেখা দেয়। গলি-পথটাকে পথ বলার চেয়ে নর্দমা বলাই ভালো। দু-পাশের বস্তির যত ক্লেদ এসে জমেছে সেখানে। নর্দমা থাকলে ময়লা বেরুবার একটা পথ থাকত। কিন্তু তা নেই। সারা গলিটার মধ্যে একটা মাত্র টিউবওয়েল। সেখানে মেয়ে পুরুষ ও শিশুর ভিড় ও পাতিহাঁসের প্যাকপ্যাকানির মতো পাম্পের শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গেই ঝগড়ার চিৎকার ও হট্টগোল। গলিটায় ঢোকবার মুখে একটা বাতি আছে, ইলেকট্রিক বাতি। সেটা এখনো জ্বলছে। সব সময়েই জ্বলে। গলিটা যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির আণ্ডারে, ওই বাতিটাই তার প্রমাণ।

ভেলোর সঙ্গে অভয়কে দেখে গলির লোকগুলি সবাই একবার করে দেখে নিচ্ছে। ভাবখানা যেন কোন আপদ এসে জুটেছে তাদের পাড়ায়।

অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানী খাকীর জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যাণ্ট। মাথায় একটা চাষাদের টোকার মত দীর্ঘবেড় টুপি। পায়ে ভারী বুট। চেহারাটা তার সাধারণ বাঙালীর তুলনায় অনেক লম্বা। মাথাটা চালার গায়ে ঠেকে যাওয়ার ভয়ে ঘাড় গুঁজে চলেছে সে। যেন কোন দলছাড়া সৈনিক চলেছে ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মুখে তার এখনো কোমলতার আভাস। চোখে এখনো স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ তাকে খানিকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে, নয়তো দুর্বোধ্য।

সে আর না ডেকে পারল না, 'ভেলোখুড়ো।'

ভেলোকে ওই নামেই সবাই ডাকে কারখানায়। বলল, 'ভাবছ কেন। তুমি

বামুনের ছেলে, ভালোরাম কি তোমাকে মিছে কথা বলবে। পাকা বাড়ি, যাকে বলে ইটের গাঁথুনি, খুঁটে খুঁটে দেখে নিও, বুঝেছ ?'

বুঝেছে, কিন্তু এই বস্তির ভিড়ে পাকা বাড়ির কোন ইশারাও যে চোখে পড়ে না। ভেলো গোঁফের ফাঁকে হেসে আবার বলল, 'কিন্তু যা বলছিলুম, একটু সাবধানে থেকো, বুঝলে দাদা। মানে, আইবুড়ো ছেলে তুমি। আমার আর কি বল, মরে তো শালার বাদলা পোকাগুলান।'

'তার মানে, আমিও মরব ?' অভয়ের গলায় যেন বিরক্তির ঝাঁজ।

ভেলো বলল, 'ওই, চটলে তো ? ওটা একটা কথার কথা। সেখেনে কি আর পেত্নী আছে যে ঘাড় মটকাবে। মানুষ খুব ভালো, জানলে। তবে মানুষের প্রাণ......'

'মানুষের প্রাণ !' ভেলোর কথার রেশ টেনে বলল অভয়, 'খুড়ো, একদিন মানুষ ছিলাম। এখন ওসব বালাই নেই।' বলতে বলতেই দাঁড়াল দুজনে। সামনেই একটা চালাঘর যেন ঠেলে এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্য রকম একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল তারা। সামনেই একটা মুচকুন্দ গাছ। বড় বড় শালপাতার মতো অজস্র কালচে কালচে সবুজ পাতা আর ছাগলবাটি লতার বেষ্টনীতে ঝুপসি ঝাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। তলা ঘেঁষে স্তূপাকার হয়ে আছে আধলা ইটের রাশি। তার আড়ালে একটা ভাঙা বাড়ির ইশারা জেগে রয়েছে। তার পেছনে যেন ঘন অরণ্যের বিস্তৃতি, মাঠ ও রেল লাইনের উঁচু জমি।

ভেলো বলল, 'ওই যে তোমার বাড়ি।'

বাড়ি ? বাড়ি কোথায় ? বস্তির গায়েই এই হঠাৎ অবাধ উন্মুক্ত জায়গাটা নির্বাক বিষণ্নতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। লোকজন দেখা যায় না একটাও। এ নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে যেন একটা নিরাকার অস্থিরতা অদৃশ্যে ছটফট্ করে মরছে। এর মধ্যে বাড়ি কোথায়।

ভেলো বলল, 'এসো।'

বলে সে মুচকুন্দ গাছটার তলা দিয়ে একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে এগুল। পুকুরটায় কচুরিপানার ঘন বিস্তার। পুষ্ট লকলকে ডগাগুলি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কালকেউটের ফণার মতো। তার মধ্যেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ভাঙা ইট বসিয়ে ঘাট করা হয়েছে। ঘাটের কোলে কালো জল, গভীর কালো জল। গভীর ও নিস্তরঙ্গ।

পুকুরটার দক্ষিণ পাড়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। একটা ভাঙা বাড়ি। পোড়োবাড়ির মতো। বাড়িটাতে ঢোকবার দরজা নেই, একটা ছিটেবেড়ার আড়াল রয়েছে। দেয়ালের ইট চোখে পড়ে না। সর্বত্রই গোবর-চাপটির দাগ। বোঝা যায় একসময়ে দোতলা ছিল, এখন ভেঙে গিয়েছে। বট অশ্বত্থের ছায়া আর বনকলমির লতা নিচে থেকে উপরে অবাধে জড়িয়ে ধরেছে সর্বাঙ্গ। সামনের ঘরটার জানালার

গরাদ নেই। পোকা-খাওয়া পাল্লা দুটো আছে। ফাটল-ধরা ভাঙা বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে ছাগল-নাদি। বারান্দার নিচেই কৃষ্ণকলি গাছের ঝাড়, ফাঁকে ফাঁকে কাল-কাসুন্দের বন। বন সেজেছে। অন্ধকার রাত্রের আকাশে খই ফোটা নক্ষত্রের মতো ফুটেছে কালকাসুন্দের ফুল, হলদে আর লাল কৃষ্ণকলি।

ভেলো বলল, 'কি গো, পছন্দ হয় কি না হয়? ফুলবাগান, পুকুর……'

অভয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'পাকাবাড়ি। খুঁটে আর দেখব কী, এ তো খাসা ইটের বাড়ি। তবে পোষাবে না ভেলোখুড়ো, চল কেটে পড়ি। ও আমার ঘিঞ্জি বস্তিই ভালো, সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে পারব না।'

ভেলো হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'সাপ কোথায়, এখানে মানুষ বাস করে। কলকারখানার বাজারে একটু হাঁফ ছাড়তে পারবে। আর…'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ছিটেবেড়ার আড়াল থেকে একটি মুখ বেরিয়ে এল। একটি মেয়ের মুখ। রংটা মাজা-মাজা, হঠাৎ ফর্সা বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, কিন্তু সিঁদুর নেই কপালে। আঁট করে বাঁধা চুল। মুখে হাসি। কিন্তু সামনে মানুষ দেখে হাসিটা মিলিয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় বেঁকে উঠল ভ্রূ-লতা। অভয়পদর টুপি-পরা বিদঘুটে চেহারার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছ ভেলোখুড়ো?'

বোঝা গেল, ভেলো এ সারা অঞ্চলের সকলেরই খুড়ো। বলল, 'কে বিনি ভাইঝি! বলছি, তোর মাকে একবারটি ডেকে দে, সেই লোকটি এসেছে ঘরের জন্যে।'

বিনি একবার আড়চোখে অভয়কে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

অভয় বলে উঠল, 'খুড়ো, এ যে একেবারে বিয়ের ঘুগ্যি।'

ভেলো বলল, 'বে-র কেন, হলে অ্যাদ্দিনে ক-গণ্ডা হত, তাই বল। তা হলে বোঝ, এর উপরে একজন, নিচে আর একজন। তা বে কে দেবে বল্ল। বাপ থাকতেই খেতে জোটেনি, এখন তো বেধবা মা। আর জাতেও যদি শালা বামুন কায়েত হত একটা কথা ছিল, জাত যে তোমার ভেলোখুড়োর, মানে সৎচাষা। আর মা-ষষ্ঠি দিলে দিলে, তিনটেই মেয়ে দিলে। একে বলে কপাল।'

অভয়পদর নিজেরই বুকে যেন উৎকণ্ঠার কাঁটা ফুটল। বোধহয় তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়েছে, নিজের অবিবাহিতা বোনটির কথা। কিন্তু সে হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু খুড়ো, এখেনে তো আমি থাকতে পারব না।'

ভেলো অবাক হয়ে বলল, 'ওই নাও, তোমার তাতে কী? দেখে শুনে একটা বামুনের ছেলে নিয়ে এলুম বলে, যাকে-তাকে তো আর এনে তুলতে পারিনে। আর মেয়েমানুষগুলো একলা থাকে, একটা সাহসও তো পাবে। তারপরে তুমি তোমার, ওরা ওদের।'

অভয়ের আবার আপত্তি ওঠার আগেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির মালিক, বিধবা বুড়ি। দু-হাতে গোবর মাখা। গায়ে কোনরকমে কাপড়টা জড়িয়ে

দেওয়া। এল হাঁ করে দাঁতশূন্য মাড়ি বের করে। মুখে অজস্র রেখা পড়েছে যেন জট পাকানো সুতোর দলার মতো। গলার চামড়া গলকম্বলের মতো ঝুলে পড়েছে। কাঁপছে থর্থর্ করে। বেঁকে পড়েছে খানিকটা শরীর।

চোখে বোধহয় ভালো ঠাওর পায় না। কয়েক মুহূর্ত অভয়কে দেখে বলল, 'ভেলো, লোকটা বাঙালী তো?'

ভেলো হেসে ফেলল, 'তবে কি পাঞ্জাবী। তোমাকে তো বলেছিলুম সব।'

বুড়ি আর দ্বিরুক্তি না করে অমনি আবার ফিরল, 'না, তা বলছিনে। চেহারাটা যেন কেমন ঠেকল। চোখের মাথা তো খেয়েছি। তা এসো, থাকো। ঘর আমার বেশ বড়সড়। একটু পুরানো, তা……' হঠাৎ চোপসানো ঠোঁট কেঁপে উঠে গলাটা বন্ধ হয়ে এল বুড়ির। চোখের কোলে জল এসে পড়ল। বলল ফিস্ফিস্ করে, 'আমি যে জন্মো পাপিষ্ঠা। আমার গলায় বুকে শুধু কাঁটা। সে মানুষটা যদ্দিন ছিল ভাড়া দিইনি, এখন কেউ নিতেও চায় না। তা থাকো।'

চোখ মুছে ডাকল, 'ও নিমি, ঘরটা খুলে দে।'

অভয় তাকালো ভেলোর দিকে। ভেলো ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলল, 'উঠে পড়ো। দুনিয়ার সব জায়গাই সমান, থাকা নিয়ে কথা।'

বলে বুড়ির পেছনে পেছনে অভয়কে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে। বাড়ি মানে, বেড়াটার আড়ালে একটা গলি। গলির দু'পাশের দুটি ঘর। ভেতরে দেখা যায় একটা উঠোন। উঠোনের উত্তরে একটা পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ। ওপারে সেই মুচকুন্দ গাছ ও ইটের স্তূপ। নজরে পড়ে বস্তির খোলার চালা আর মোড়ের সেই লাইট পোস্টটা। বাতিটা জ্বলছে তেমনি।

অভয়ের ভারি বুটের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠল গলিটার মধ্যে। সে বোধকরি বিনির চেয়েও ফর্সা। কেননা, অন্ধকার গলিটাতে তার মুখটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তার্-পর চুল আঁট করে বাঁধা। দোহারা গড়ন। চোখে তার শান্ত বিষণ্ণতা। বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি।

দরজাটা খুলে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। তার পেছনেই দাঁড়িয়েছে টুনি, সকলের ছোট। বিনির মতোই একহারা ছিপছিপে গড়ন তার। চোখের কালো তারার খর চাউনি, বিস্ময়ের ঝিকিমিকি। অভয়ের চেহারা দেখেই বোধহয় তার ঠোঁটের হাসিটুকু ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার চুল খোলা। হয়তো বেঁধে ওঠার অবসর হয়নি।

ভেলোর পেছনে ঘরে ঢুকে সুটকেস ও বিছানা নামিয়ে অভয় একবার ভালো করে ঘরটার চারদিক দেখে নিল। মেঝেটার অবস্থা মুখে বসন্তের দাগের মতো। সিমেন্ট উঠে গিয়েছে এখানে সেখানে। দেয়ালের অবস্থাও তাই। পলস্তারার 'প' নেই, সর্বত্রই নোনা ইট বেরিয়ে পড়েছে। তবে ঘরটার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা বোঝা যায়। ঘরটার কোলেই সেই বারান্দা, কৃষ্ণকলি ও কালকাসুন্দের ঝাড়, তারপরে পুকুর।

ভেলো বলল, 'নাও, ঘরদোর সাজিয়ে বস, এবার আমি চললুম। ভাড়ার কথা বলাই আছে।'

বলে ভেলো লোম-ওঠা ভ্রূ-সংকেতে ইশারা করল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চললুম গো বউঠান, এবার তোমরা বুঝে পড়ে নিও।'

বলে সে চলে গেল। একে একে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল, নিমি, বিনি, টুনি। বুড়ি বলল, 'ওই পুকুরে নাইবে ; খাবে তো তুমি হোটেলে। না যদি খাও, বাড়িতে আলগা উনুন নিয়ে এস, রেঁধে বেড়ে খেও। আর…'

কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা মেয়েলী গলার উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি যেন তীরের মতো এসে বিঁধল এ ঘরের দুটো মানুষের বুকে। একজনের জিভ আড়ষ্ট, চোখে শঙ্কা, কুঞ্চিত লোল চামড়া আবৃত জড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর এক-জনের ঠিক তা নয়, তবু যেন ভয়। আর একটা নাম-না-জানা তীব্র অনুভূতিতে নিশ্বাস আটকে রইল বুকের মধ্যে।

তারপর হাসিটা নিশ্বাসের দমকে দমকে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল, নিঃশব্দ জলের বুকে বুদবুদের শব্দের মতো। ঈষৎ হাওয়ায় শিউরে উঠল কৃষ্ণকলির ঝাড়।

লাল মেঘের বুকে পড়েছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। এ নৈঃশব্দ্যের ফাঁকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ধ গলিটার হট্টগোল।

বুড়ি হঠাৎ অভয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বুকের দু-পাশ ও গলাটা দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'এই বুকে আর গলায় করে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারিনে, রাখতেও পারিনে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি, যেদিন আমি থাকব না।'

বলেই সে যেন আগুনের হলকার জ্বালায় দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। ঝোল-ঝাব্বা পরা অভয় একটা অতিকায় ভূতের মতো নির্জন ঘরটার অন্ধকার কোলে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় এনে তুলল আমাকে ভেলোখুড়ো। যে নিশ্বাসটা আটকে ছিল বুকের মধ্যে সেটা আর বেরিয়ে আসবার পথ পেল না। বুকের মধ্যেই ছটফট করে মরতে লাগল।

বোধ করি সেই নিশ্বাসটা ফেলবার জন্যেই অভয় সেই ভোরবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে। আসবার সময় রোজই শুনতে পায় পাশের ঘরটায় খসখস কাগজের শব্দ। যে মুহূর্তে গলিটাতে তার বুটের শব্দ হয়, তখন থেকে কয়েক মুহূর্ত শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে বেলোয়ারী চুড়ির রিনিঠিনি। একটু বা ফিসফিস কিংবা চাপা হাসির সঙ্গে কোন গলার একটা মৃদু শব্দ।

অভয় শুনেছে ভেলোখুড়োর মুখে, ওরা তিন বোন কাগজের ঠোঙা আর পিসবোর্ডের বাক্স তৈরি করে। ওটাই ওদের প্রধান উপজীবিকা।

কিন্তু অভয়ের শরীরটা তখন অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। সারাদিনে ভারি-ট্রাকের হুইলের কাঁপুনি আর বিরাট হাতির মতো বডিটার ঝাঁকুনি গায়ের মাংস-

পেশীতে ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে। নাকের মধ্যে ভারি শ্লেষ্মার মতো ধুলো জমে হয়ে থাকে।

কোনরকমে লম্ফটা জ্বালিয়ে বিছানা পেতে বিড়ি ধরিয়ে লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়া। খাওয়া হয়ে যায় সন্ধ্যার একটু পরেই। তারও অনেক পরে শোনা যায় হয়তো নিমি ডাকছে বিনিকে কিংবা বিনি টুনিকে। ওদের খাওয়ার সময় হল। খাওয়ার পর গলিটার বুকে ওদের পায়ের টিপটিপ শব্দ শোনা যায়, ভীত চকিত মানুষের বুকের দুরুদুরু যেন। আবার সেই চুড়ির রিনিঠিনি। রাত্রির নৈঃশব্দ্যে আবার সেই চাপা চাপা গলার আভাস। পুকুরঘাটে শোনা যায় বাসন ধোয়ার আওয়াজ।

তিন বোনের গলা আলাদা করতে পারে না অভয়। শুধু শোনে, কেউ বলে, 'উঃ পায়ে কি ব্যথা হয়েছে রে।' কেউ বলে, 'তাড়াতাড়ি কর, বড্ড ঘুম পেয়েছে।' কেউ বা, 'সেই মুখপোড়া সাউটা সাত সকালেই মাল নিতে আসবে, বাক্সের গায়ে তো এখনো লেবেল আঁটা হল না।'

অন্ধকারে যতই ঝিম মেরে পড়ে থাকুক, অভয়ের কান দুটো যেন হাঁ করে থাকে। তারপর হঠাৎ কি কারণে তীব্র মিষ্টি গলার খিলখিল হাসিতে শিউরে ওঠে রাত্রি। যেন একটা অসহ্য গুমোট অস্থিরতার মধ্যে হাসিটা মুক্তির সন্ধান খোঁজে। কিন্তু হাসিটা শেষ হয়ে আবার সেই অস্থিরতাই দলা পাকিয়ে ওঠে।

অভয় অশরীরী সাক্ষীর মতো উত্তরের খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখা যায় মুচকুন্দ গাছে ঝুপসি আর মোড়ের সেই বাতিটা। তার এক চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিটা যেন বিদ্রূপ করে বলতে থাকে অভয়কে, আমি জেগে আছি বহুদিন, এবার তুইও জাগছিস।

পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদের হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়ের ঘরে, তার গায়ে। সে ছেলেমানুষের মতো ঝটকা মেরে পড়ে অনুভব করে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি ফুটছে তার গায়ের মধ্যে।

তারপর আবার নিঃশব্দ ও অন্ধকার। শুধু দূরের কারখানার বয়লারের ধিকিয়ে চলার একটানা ঘুস ঘুস শব্দ।

সেদিন রাত্রে ফিরতে গিয়ে কৃষ্ণকলির বনে থমকে দাঁড়াল অভয়। কে যেন কাঁদছে। এখনো বস্তিতে হট্টগোল, টিউবওয়েলের প্যাঁকপ্যাঁকানি। তার মধ্যে এখানকার নিরালায় কান্নার শব্দ।

অভয় কান পাতল। ভুল হয়েছে। কান্না নয়, গান গাইছে। দুটি গলার মিলিত সরু গলার গান। গাইছে দুই বোন।

বনের আগুন সবাই দেখে
মনের আগুন কেউ না দেখে,
সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।

সে গানের টানা সুরের লহরীতে রাত্রি দুলছে না, আড়ষ্ট ব্যথায় থমকে দাঁড়িয়েছে। শরতের আকাশে আধখানা চাঁদ, অসংখ্য অপলক চোখের মতো তারা। নিচেও তারার মতোই রাত্রির নিরালায় ঘোমটা খোলা কৃষ্ণকলি।

কিন্তু হাসি নেই, সুপ্তির আরাম নেই। চাপা আগুনের পোড়ানিতে যেন এ বিশ্বসংসার দিশেহারা, তবুও নির্বাক নিরেট।

ধিকিধিকি আগুন জলে যেন অভয়ের বুকেও। ভাবে, পিছুবে। কিন্তু পিছিয়েও সামনেই এগোয়। গানটা থেমে গেছে। তবুও আবার থামতে হয়। শোনা যায়, একজন বলছে, 'না, এখনো আসেনি।'

আর একজন, 'কে, সেই মিলিটারি তো?'

'মিলিটারি নয় রে, ভেলোখুড়ো বলছিল, মোটরের মিস্তিরি।'

অভয় নিজের অজান্তেই আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শোনে, 'মাইরি, লোকটা যেন কী। আমাদের যেন ভয় পায়।'

আর একজনের তীব্র বিদ্রূপাত্মক গলা শোনা যায়, 'ভয় নয়, ঘেন্না করে। ভাবে ধুমসী পেত্‌নীগুলো কোনদিন দেবে ঘাড় মটকে।'

তারপর একটা হাসির উচ্ছ্বাস উঠতে গিয়েও মাঝপথেই ট্রাকের অ্যাকসিলেটর চাপার মতো সেটা থেমে যায়। শব্দ ওঠে কাগজের খসখস।

অভয়ের গায়ে যেন আগুন লাগে। নিজেকে কিছু জিজ্ঞেস করেও জবাব না পাওয়ায় বোকার মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খট খট শব্দ তুলে ঝনাৎ করে শিকল খুলে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু পরদিন শরৎ আকাশের রং-বাহারী বাড়ন্ত-বেলায় অবিশ্বাস্য রকমে অভয়ের বুটের শব্দ শোনা যায় গলিতে। শব্দটা অভয়ের নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয়, কী একটা মহাপাপ করে ফেলেছে সে।

ওদিকে তিন বোনের কী একটা গুলতানি চলছিল। ওরাও একেবারে চুপ হয়ে গেল।

ওদের বুড়ি মাও আশেপাশেই আছে কোথাও। বুড়ি সারাদিন ওই মুচকুন্দ গাছের মোটা গোড়া থেকে শুরু করে এখানে সেখানে ঘুঁটে দিয়ে ও গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে, না বিষ না মধু সেই অমূল্য বস্তুগুলির প্রতি তার নিয়ত সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা ঘুরছে।

অভয় এই মুহূর্তের সংকোচ ও আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে তোলার জন্যেই যেন দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢোকে, খাকি ঝোল-ঝোব্বা খোলে। গামছাটা কাঁধে নিয়ে হুসহুস করে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে এসে বসে। অনেকদিন পরে বিকালের দিকে শরীরটা ক্লেদমুক্ত হয়ে একটু আরাম পায়। কিন্তু মনের মধ্যে থাকে একটা বিষের খচখচানি।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির বনে তিন বোনের মূর্তি ভেসে ওঠে। খালি পায়ের উপর কাপড় জড়ানো। তিনজনেই সদ্য বাঁধা মস্ত খোঁপায় দিয়েছে চন্দনের বিচির মতো

লাল মটর দেওয়া সস্তা কাঁটা। সেগুলি যেন কুণ্ডলীপাকানো কালসাপিনীর চোখের মতো জলজল করে। আর আশ্চর্য। এতখানি বয়সেও ঘোচেনি কারো লালিত্য। যৌবনের জোয়ারে ধরেনি ভাঁটার টান। জোয়ার যেন বাধা পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম ঢেউ উদ্ভাসিত সুউচ্চ রেখায়।

তবু যেন মনে হয় একটা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতা ঘিরে রয়েছে তাদের। নিমি যেন এক ছেলের মরা মা, বিনি মন-গোমড়ানো বউ, টুনি প্রেমিকা কিশোরী।

তিন বোন যেন তিন সই। মিটিমিটি হাসে, আড়ে আড়ে চায়। তবু চাইতে পারে না। তিনজনে গায়ে গায়ে গিয়ে নামে পুকুরের জলে। ঢেউয়ে দোলে কচুরি-পানা ফণা তোলা কালনাগিনীর মতো।

অভয় চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারে না। জানলা থেকে সরে আসব আসব করেও সময় বয়ে যায়। না দেখতে চেয়েও দেখে ছপছপ শব্দে গা ধুয়ে ফিরে চলেছে তিনজন। না হাসি না হাসি করেও ফিক করে হেসে উঠে মোহাচ্ছন্ন করে রেখে যায় সমস্ত জায়গাটা।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে চমকে ওঠে অভয়। পেছনে দেখে বুড়িমা। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণের আকাশের দিকে। থরথর করে কাঁপছে অতিকায় গিরগিটির মতো গলার চামড়া। অভয় ফিরে তাকাতে ফিসফিস করে বলে, 'বুকের মধ্যে ধুকধুক করে, গলায় ধড়ফড় করে। কোথা রাখি, যাই কোথা। খালি তরাসে তরাসে মরি।' বলেই বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়। অভয়ের মনে হয় সে পাথর হয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বস্তির গণ্ডগোল হাসি ও হল্লা। ঢোলক অথবা খঞ্জনির বাজনা।

এমনি চলে কয়েকদিন। রোজই অভয় ফিরে আসে বিকালের ছুটির পর। আসব না করেও আসে।

কয়েকদিন পর, বিকেলে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে ঢুকে অভয় থমকে দাঁড়াল। চোখের সামনে এক অবিশ্বাস্য বস্তু দেখে চমকে উঠল। দেখল অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে খয়েরী রঙের ধূমায়িত চা। চা? চা-ই তো, হ্যাঁ। মনে হল গেলাসটা সাগ্রহে চুমুকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সংশয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখে।

অভয় একবার ভাবল, পেছন ফিরে দেখে। কিন্তু দেখে না। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে ধীরে সুস্থে চায়ের গেলাসটি নিয়ে চুমুক দেয়। ঢোকে ঢোকে উষ্ণতাতে বুকের মধ্যে একটা দরজা খুলে যায়। মনটা ভোর হয়ে আসে।

তারপর শূন্য গেলাসটা রাখতে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গেলাস নিয়ে গলিটা পেরিয়ে একেবারে ভেতরের উঠোনে এসে পড়ে। শূন্য উঠোন। কেউ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল তিন বোন মাথা নিচু করে কাজে ভারি ব্যস্ত।

অভয় বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে করেও কথা আসে না

মুখে। কয়েক মুহূর্ত এমনি চুপচাপ।

হঠাৎ টুনিই বলে, 'তুই দিয়ে এসেছিলি বুঝি।'

নিমি বলে, 'আমি কেন, বিনি তো!'

বিনি বলে, 'ওমা, কী মিথ্যুক। আমি কেন বামুনের ছেলেকে চা দিতে যাব।'

অভয় দেখে কালো চোখের চাউনিতে হাসির চমকানি। হাসিটা তারও মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, 'না হয় গেলাসটা হেঁটে হেঁটেই গেল, তাতে বামুনের জাত যাবে না। বামুন আর কোথায়, একেবারে জাত ড্রাইভার। সারাদিনের খাটুনির পর বিকেলে এ রকম, মানে একটু চা পেলে, আচ্ছা আমি না হয় চা চিনিটা··· ।' বলে সে হেসে ফেলে।

ততক্ষণে তারা তিন বোন উচ্চ হাসিতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। টুনি বলে, 'বিনি তুই না হয় চা-টা দিস।'

বিনি বলে, 'নিমি, তুই তাহলে দুধটা দিস?'

নিমিও বলে, 'চিনিটা তাহলে টুনির।'

তারপর আবার হাসি। এবার অভয়ও না হেসে পারে না। এই ভাঙা বাড়ির বুকে মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসি বোধহয় এই প্রথম। যেন এখানকার চাপা-পড়া দুঃসহ অস্থিরতা একটা মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে বেরিয়ে এল।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই হাসিটা থেমে এল বুকে ফিক ব্যথা লাগার মতো। ফিরে এল সেই রুদ্ধ অস্থিরতা।

নিমি বলে, 'বিনি, মা কোথা?'

বিনি বলে, 'মাঠের ধারে গোবর কুড়াতে গেছে। পালের গোরু ফিরবে এবার।'

তবুও কেউই চাপতে পারে না একটা ছোট্ট নিশ্বাস। তিনজনের মধ্যে মূর্তি ধরে ওঠে হতাশা।

পথের মাঝে বেগড়ানো গাড়ির বেয়াকুব ড্রাইভারের মতো অবাক ও মুগ্ধ হয়ে ওঠে অভয়।

কিন্তু এমনি করেই আড় ভেঙে যায়। খুলে যায় সেই রুদ্ধ দ্বার। বাধামুক্ত জোয়ার এগোয়। কখনো সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে, কখনো এড়াবার সুযোগ পাওয়াও যায় না।

প্রথমেই তিন বোনের অসীম কৌতূহল, কোথায় বাড়ি, কে কে আছে।

অভয় বলে, 'কে আবার থাকবে। ছোট ছোট ভাই বোন আর বিধবা মা। ছেলেবেলা থেকেই সবাই আমার পোষ্য।'

'আর বিয়ে?'

'বিয়ে কে দেবে আর কে করবে? কথায় বলে, নিজের জোটে না, আবার

শঙ্করাকে ডাকে।'

তারপর এ পক্ষ থেকে প্রশ্ন ওঠে 'তোমাদের রোজগার কি রকম?'

নিমি বলে, 'ছাই! খেতে জোটে না।'

বিনি বলে, 'তিনজনের খাটনিতে রোজ কুল্লে দু-টাকার বেশি নয়।'

টুনি বলে, 'আর মা ঘুঁটের পয়সা জমিয়ে রাখে।'

'কেন?'

'কেন? আমাদের বিয়ে দেবে বলে।' বলে তারা তিনজনেই তীব্র বিদ্রূপভরে হেসে ওঠে। হাসিটা অভয়ের মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে। কিছুক্ষণ কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। পরে বলে, যেন খানিকটা আপন মনে, 'হবে না কেন, হবে।'

হবে! যেন এমন বিচিত্র কথা তারা কোনদিন শোনেনি, এমনি উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তিন বোন তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে।

একটু পরেই টুনিই বলে, 'আমরা তো শঙ্করী। নিজের না জুটলে কে আমাদের ডাকবে?'

অভয়ের জিভ আড়ষ্ট, বুকে পাথর চাপা। সত্যি, কে ডাকবে, কেমন করে ডাকবে। এ বিশ্বসংসারে সকলের গলা চেপে রেখেছে যেন কোন অদৃশ্য দানব। বুকের মধ্যে এত গুলতানি, মুখ দিয়ে ফোটে না।

ফোটে না, তবু ফোটে। রাত্রির নিরালা অন্ধকারে ফুল ফোটার মতো সে নিঃশব্দে ফোটে। এখানে গড়ে ওঠে আর এক নতুন সংসার। তিন মেয়ে আর এক ছেলের বিচিত্র সংসার।

যাকে বলে ডেয়ো ঢাকনা, তাই একে একে জড়ো হয় অভয়ের ঘরে। আলগা উনুন আসে, কিনে আনে হাতা, খুন্তি হাঁড়ি, থালা গেলাস।

আর দশটা বাড়িতে যা সম্ভব হয়ে ওঠে না, এখানে তাই হয়। সকাল বেলাই ভাত খেয়ে কাজে যায় অভয়। ভোর রাত্রে উনুন ধরে, মোটর মিস্তিরি কেন এসব পারবে। পালা করে আসে তিন বোন। আসে ভোর রাত্রের আবছায়ায়, বাসি খোঁপা এলিয়ে, বিচিত্র বিস্রস্ত বেশে, ঠোঁটের কোণে তাজা হাসি নিয়ে। আবার আসে সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। এসে অভয়কে সরিয়ে নিজেরা বসে রান্না করতে। এক সঙ্গে নয়, পালা করে আসে। ঘরে নিজেদের কাজ আছে, তা ছাড়া সেই সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির খবরদারিও আছে।

তবু আজ আর বাঁধ মানে না। অভয়কে ঘিরে এ-তিনজনের আর-এক নতুন চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অবারিত হয়ে খুলে যায় চাপা প্রাণের দরজা। অভয়ের রান্না খাওয়া, আর জামাকাপড়টুকু পর্যন্ত নিজেরা কেচে দেয়। সবটুকু করেও তাদের তৃষ্ণার্ত গুপ্ত সাধ মিটতে চায় না। এত আছে যে, দিয়েও প্রাণ ভরে না।

জাত-বেজাতের বাধা ডিঙিয়ে ভাত বেড়ে দিয়ে বসে খাওয়ায় তারা অভয়কে।

নিমি খেতে দিয়ে অভয়ের সর্বাঙ্গ আঁতিপাতি করে দেখে। চোখে তার মমতা, ঠোঁটের কোণে বেদনার হাসি।

অভয় বলে, 'কী দেখছ?'

নিমি বলে, 'দেখছি তোমাকে। জাত মারলুম মিস্তিরি, তবু তোমার শরীরটা ভালো করে তুলতে পারছি না।'

অভয় হেসে বলে, 'তোমার খালি ওই ভাবনা। আর কত হবে। ড্রাইভার কি দুধগেলা পুরুষ হবে।'

নিমিও হাসে। মন বলে, হ্যাঁ, দুধগেলা পুরুষই হবে। ঢল ঢল কান্তি, গোরাচাঁদ হবে অভয়। আর নিমি সবই ফেলে দেবে সেই গোরাচাঁদের পায়ে।

ভাবতে গিয়ে নিমির বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। তার শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার করে।

অভয় সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। বলে, 'কী হয়েছে নিমি?'

নিমি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে হাসে।

এমনি বিনিও আসে। সে যেন একটু রহস্যময়ী। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে খালি অভয়কে বলে, এটা দাও, সেটা দাও। তারপরে, 'আজকে বাজার থেকে এই এনো, সেই এনো।' খেতে গিয়ে, অভয়ের আপত্তি থাকলেও যা প্রাণ চাইবে, তাই দেবে। না খেলে মাথার দিব্যি দেবে আর নিঃশব্দে কেবলি কাছে বসে ও আড়ে আড়ে চেয়ে টিপে টিপে হাসবে। যেন মনের তলার গুরু কথা তার ঠোঁটের কোণে ঝিকিমিকি করে।

তা দেখে এই হাসিটার মতোই অভয়ের বুকটা ধিকিধিকি জ্বলে।

জ্বলুনিটা এসে লাগে রক্তস্রোতে। ডাকে, 'বিনি।'

বিনি তাকায়, তার অপলক হাসি চোখে বিচিত্র ইশারা। সুগঠিত ঘাড়ের কাছে মস্ত খোঁপা। চাপা গলায় বলে, 'বল।'

'কিছু বলছ?'

তেমনি তাকিয়ে বিনি বলে, 'কী আবার।' একটু থেমে আবার বলে, 'তুমি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।' সেটুকু কান পেতে শোনে বিনি। শোনে, বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ তোলে পাড়চাপা গুমরানি। তাকিয়ে দেখে অভয়ের বুকটা।

অভয় বলে, 'আমার কাজে মন বসে না। মনটা যে কোথায় থাকে।' যেন না জানার জন্যেই দুজনে চোখে চোখ তাকিয়ে হাসে।

আর টুনি যেন এক দজ্জাল কিশোরী বউ। তার ক্ষণে হাসি, ক্ষণে রাগ। তার হাসি অবাধ, আবার রাগও করবে। ছুটে ছুটে কাজ করবে। কাজের কি হল না হল তা দেখবে না। দিশেহারা কাজের মধ্যে সার হয় অভয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা। মনের মতটি না হলে ধমকাবে।

অভয় তার কাছটিতে বসে বলে, 'এই তবে রইলুম বসে, থাকল মিলিটারি

কায়খানা আর চাকরি।' টুনি অমনি খিলখিল করে হাসে। কখনো এলোচুলে, কখনো খোঁপা নেড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবে। দেখবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর থরথর কাঁপবে বাঁধভাঙা শরীর।

অভয়ও মেতে ওঠে তার সঙ্গে। হাসে, রাগ করে। হয়তো আলগোছে টুনির ঘাড়ের কাপড় মাথায় তুলে ঘোমটা করে দেয়।

টুনি অমনি যেন সত্যি তীব্র অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ বাঁকিয়ে চায়। চোখের কোণে বকুনি ও কান্নার ঝিলিমিলি খেলে।

অভয় বলে, 'কী হল টুনি ?'

কী হল তাই ভাববার চেষ্টা করে টুনি। কিছু টের পায় না, শুধু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে, অবশ হয়ে আসে সমস্ত শরীর ; নিজেকে দেখে, সে যেন অভয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ অসহ্য লজ্জায় বিচিত্র রূপে রূপবতী হয়ে ওঠে টুনি। বলে, 'কি জানি কি হয়, জানিনে ছাই।'

তারা কেউ জানে না তাদের কি হয়েছে। চারজনে ডুবে আছে আকণ্ঠ। নতুন গড়া এক ভরা সংসারের তারা চারজন মানুষ।

অভয় না থাকলে সত্যি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সময় যেতে চায় না। তিনজনের বুকে একই তাল। চোখে একই জিজ্ঞাসা। তিনজনেই সারাদিন কান পেতে শোনে পদশব্দ। এই সুযোগে তাদের চাপাপড়া প্রাণের অস্থিরতাটা যেন ফিরে আসতে চায়। টুনি হয়তো গুন্‌গুন্ করে ওঠে :

আর রইতে নারি হয়ে নারী,
তোমার বাঁশি শুনে গো।
আর চলতে নারি হয়ে নারী
এ কি বিষম দায় গো।

বিনি তাতে গলা দেয়, নিমি সব ভুলে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বেজে ওঠে সেই পদশব্দ। বাজে যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

অভয় তিনজনকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। একজনকে ভাবতে গেলে আর একজন আসে। কেউ কাউকে ছাড়া নয়। এর মমতা, ওর হাসি, তার অভিমান। তিনে মিলে যেন একটাই।

তবু একটা নয়। এ সংসারে বিচিত্র নিয়মের মতো তিন বোনের আলাদা সত্তা যেন তলে তলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তাদের প্রাণের আর একটা গোপন দরজা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। অভয়কে তারা তিনজনে তিন রকমে টানে।

এমনি সময় একদিন বেলা দশটায় অসময়ে গলিতে বেজে উঠল বুটের শব্দ। অসময়ে কেন। একে একে সব ফেলে ছুটে এল তিন বোন। দেখল শিকল দেওয়া বন্ধ দরজায়

হেলান দিয়ে অভয় যেন ভেঙে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে। কী হয়েছে, অসুখ? বাড়ির কোন দুঃসংবাদ?

অভয় তাকায় তিনজনের দিকে। ফিক ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে যায় বুক। বলতে গিয়ে কথা ফোটে না মুখে। চোখের দৃষ্টি নেমে আসে। ভাবে, থাক বলব না। সব যায় যাক, তবু পারব না ছেড়ে যেতে, পারব না এমনি করে ভাসিয়ে দিতে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাই বোনগুলির বুভুক্ষু শুকনো মুখ। ওদের যে আর কেউ নেই। সে বলে, যেন চেপে আসা গলায় কোনরকমে বলে, 'ট্রান্সফার, মানে বদলি করে দিলে পানাগড় ডিপোতে!'

বদলি! সামনে তিন মেয়ের মুখ নয়, তিনটি প্রাণহীন মৃত মুখ। শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ, চলৎশক্তিহীন। যেন বুঝেও বোঝেনি সমস্ত ব্যাপারটা।

হু হু করে হাওয়া এল গলিটার অন্ধ সুড়ঙ্গে। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া। কবে এসেছে বসন্ত কে জানে। বসন্ত এসেছিল সেই শরতেই মেঘলাভাঙা রোদে, হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের রুক্ষতায়।

অভয় বলল, 'যেতে হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। কালকেই জয়েন করতে হবে।'

যেতে হলে নয়, যেতে হবে। দুরন্ত হাওয়ায় সেই কথাটি যেন মর্মে মর্মে এসে বলে দিয়ে যায়।

নিমি, বিনি, টুনি—তিন বোন। ওদের চোখে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না থমকে রয়েছে চোখে। বুকের মধ্যে কী যেন ঠেলে আসছে।

অভয়ও আর তাকাতে পারে না। বুকটা মুচড়ে তারও গলাটা বন্ধ হয়ে আসে। কোনরকমে দরজাটা খুলে সে ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফিরে আসে সেই অস্থিরতা। অদৃশ্যে সে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে রুদ্ধ যৌবনের দ্বারে দ্বারে।

সব গোছগাছ হয়ে যায়। সেই সুটকেস আর বিছানা।

তিন বোন বুক চেপে দেখে উনুন, কড়া, খুন্তি, হাঁড়ি। সেগুলিও যেন তাদেরই মতো রুদ্ধ যন্ত্রণায় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের গড়া ঘর। যাকে ঘিরে এই খেলাঘর সে চলে যায়, এগুলি পড়ে থাকে তাদেরই মতো।

তারপর অভয় আবার দাঁড়ায় তিন বোনের মুখোমুখি। পুরুষের শক্ত বুক ফাটে, ঠোঁট বেঁকে ওঠে। খালি শোনা যায়:

'যাচ্ছি, যাচ্ছি তবে।'

এই তিনজনের বুকের মধ্যেও হাহাকার করে উঠল বিদায় দেওয়ার জন্যে। ঠোঁট কাঁপল, বন্ধু বিদায়ের হাসি হাসতে চাইল। পারল না। হাত বাড়িয়ে বুঝি ছুঁতে চাইল, পারল না।

হাওয়া এল। শূন্য ঘর। ছড়ানো সংসার। ফুল নেই, শুকনো কাঠির মত

শীর্ণ পাতাহীন কৃষ্ণকলির ঝাড়। কালকাসুন্দের বন। পোড়া পোড়া পাশুটে কচুরিপানা।

একদিন যেমন এসেছিল, আজ তেমনি পোশাকে, তেমনি ঠেকে ঠেকে, হাতে আর ঘাড়ে বোঝা, চলেছে অভয়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সবই ঝাপসা।

মুচকুন্দ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আবার তাকাল।

সেখানে এসেছে তিন বোন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে। কিন্তু চোখ অন্ধ হয়ে এসেছে, সামনে অন্ধকার।

অন্ধকার কানা গলিটাতে ঢুকে পড়ল অভয়। মোড়ের বাতিটা তাকিয়ে আছে এই দিকেই, এক চোখে।

তারপর হঠাৎ একটা চাপা তীব্র গুমরানি শুনে তিন বোন ফিরে দেখল দেয়ালের নোনা ইটে মুখ চেপে কাঁদছে বুড়ি মা। কেন, তা কেউ জানে না, বুঝবে না।

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট-অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারি হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে! বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্র স্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তর্‌তর্ করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেইসময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু-ধু করছে ইট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে, ইট পোড়াবার মরসুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলেনৌকারও তেমন ভিড় হয়নি এখনো। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বনঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতি-

হাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। গোঁফজোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম রোঁয়াটে ভাব যায়নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানেনি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। হা হা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে দুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটির' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই!

গাঁয়ের মানুষ ননকু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। দু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় ছিল দুটিতে গাঁয়ে। ননকু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে দুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্‌রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোন অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল দুটিতে ননকুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা! দুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে।

দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে দুটিতে। কাজ নেই। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। ননকুকে বলল, কেন কাজ নেই?

ননকু বলল, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বলল, তবে কি হবে?

কি হবে! ননকু বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে

চেঁচিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গীদ্ধরের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননকুর কান্নায়, রোহ, রোহ, তু তু তু, রহো সর্দার, ন রো। তুমি ভালো মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেছল? ননকু কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনোরকমে খাইয়েছিল কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজো এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহরের মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাঙড় বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে পড়া কুকুরের মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল আরো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল! ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভাঁটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময়ে এল সেই জানোয়ারগুলি পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এল কালো কুঁতকুঁতে-চোখো, ছুঁচলো-মুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল!

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। দুটি সামনের দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবৎ ধাঙড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পারে ?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকার বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরো খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের শাঁসের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হুঁ দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপর বলল সোনার মাকড়ি, কাজ করবি ?

কাজ। কাজ মানে খাওয়া ! ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল, পুরুষটি বলল, কি কাজ ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ্। ভরা দরিয়া, আরো বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে ! ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে ?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই পাশে পাশে। ওটিই নিয়ম। কিন্তু সোনার মাকড়ি সেদিকে ঢু-ঢু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তাকাল দরিয়ার জলে। তারপর শুয়োরগুলির দিকে। কালো কিম্ভুত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই রাজী হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নররক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কষুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো ?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু কেড়ুয়া তেল, দরিয়ার থেকে উঠে গায়ে মাথার জন্যে। একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা

ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজী হয়ে গেল দুটোতেই? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনকে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরল হয়ে গেল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ-র্-র্-র্-র্-আ…

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ…হুঃ! আ…হুঃ! যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চকচক করে উঠল কুতকুতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই গায়ে গায়ে। গায়ে গায়ে সবাই ঠিক জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ-র্-র্-র্-র্-আ-উ-র্-র্-র্-আ…

আ…হুঃ! আ…হুঃ!

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চকচকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ারগুলির মতো গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্ বাগ। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে খরবেগে তরতর করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, এক জায়গায় থুকথুকিয়ে উঠেছে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

ওরা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়-চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে

গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া।...

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে।

পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হাঁ, বহুৎ বড়!

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত? পুরা রূপয়ার বেশি না কম?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ! সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রূপয়া।

আচ্ছা। নতুন কথার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখ্‌লিফ পরোয়া করে না।

ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে গুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী! হাঁ, কিন্তু একটা গাভীন যে! গাভীন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনটা পাঁচটা দেয়, কোনটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো!

পাবে। নয়া গাভীন। এখনো হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকমফেরে। তাড়া দেওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ-ই—ই—হা...

মেয়েটা টান দিল, উ-র্-র্-র্—আ,—উ-র্-র্-র্-আ...

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা এ সবের মানে কি? গায়ে গায়ে ঘষার একটা খস্‌খস্‌ শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোনো খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আলতোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে উনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কল্‌কল্‌ করে। বাড়ছে। আরো বাড়বে।

কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কি হবে? কোথায় যেতে হবে?

পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহু আহু আহু, উতারো, উতারো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর। হোই্‌…হা হা…

উ-র্‌-র্‌-র্‌—আ…উ-র্‌-র্‌-র্‌-আ…

মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিল্‌হিল্‌ করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুঁতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পেছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই গাভীন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটেছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না!

যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা!

কিন্তু মেয়েটি হুতাশে পেছন তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায় হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে ছুটতে যাবে, পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট্‌ মত্‌।

কাদা মেখে প্রায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সঙ্গে। পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম সুর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, উররর-আ, আ-হুই! আ-হুই।

শুয়োরীটা অনেক দূর গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শুয়োরীটা দেখছে, খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিল্‌পিল্‌ করে ছুটে এল দলের মধ্যে। কিন্তু চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে

তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!

মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হঁ হঁ! কোনো ডর নাই। হঁ হঁ! আ-হুই! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী! যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্ করে কি সব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদের দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস? আসবি? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি। এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি রহস্য আছে সেখানে। কি ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরিশৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রেঁায়াটে গোঁফ আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ! দুটো মানুষ! হাই বাপ! জানোয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই। হেই মায়ী! দুদিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোনো দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মতো কল্‌কল্ ঝুম্‌ঝুম্ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলি সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে যেন ওরা। ঘোঁৎঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোয়ারগুলির গায়ে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিকটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ্, জলদি।

তখনো বুকজল। দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কিসব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। নত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে। মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না কোনোমতে। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা—ই! হা—ই! পেছন থেকে মেয়েটি হুমহুম্ শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবিনে।

শুয়োরগুলি তখনো ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। মানে, বোধ হয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই মরে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শঙ্কায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অ্যাঁ? মরতে হবে? চায় এরা!

ওপারে নিয়ে যেতে চায়!

পুরুষটি কিছুতেই ডিঙতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে আরো উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক্। জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিস্‌নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। তীব্র স্রোতে হাত-পাগুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে,সেইটাই ভয়ের! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হু হু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কি এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাবভঙ্গি ভালো নয়। মেঘ তাতে আরো জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনো সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা—। মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে! কে তোকে কি করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কি হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর-পুবে। যাবে না, কিছুতেই আর যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি!

পুরুষটি একমুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ঘুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভীনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভীন হওয়ার। এখনো মানুষ চিনতে শেখেনি, বিশ্বাস আসেনি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার! একদম জানোয়ার। হাই—হাই!

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে! লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, হ্যাঁ? হারামজাদী!

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরো বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাস্‌ফাঁস্‌ করছে জলের মধ্যে। গোঁ গোঁ করে কিসব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনো মাঝামাঝিও আসা যায়নি। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরা-গুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের পা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কল্‌কল্‌ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস? আয়, আরো আয়।

বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্‌ করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোন দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলই বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূরে সরে যাচ্ছে কেবলই। হাত আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই সকৃতি! আর পারছিনে। বিদায় দাও। বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদের বিয়েতে

ছুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।

আকাশ আরো নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় ব্যূম করে শব্দ হল।

অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।

আঁ আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড় কাতলা মাছের মতো। ছপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার! কিছু ডর নেই, চল্। যত জল্দি পারিস্ চল্।

যা দু-একটা জেলেনৌকা ছিল আশেপাশে, তারা সব পার ঘেঁষছে।

যত পশ্চিম, ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায়? শিউমন্দির? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনো অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠেছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওরা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষদুটোর উপর। ওদের সরে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বার বার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়েছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল। বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কি করে? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো?

মেয়েটা মেয়েমানুষ! ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানিনে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি?

এই যে!

না, ডোবেনি। পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে। বলল, কি, তখলিফ হচ্ছে?

তখলিফ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে

উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরো বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ার-গুলিও।

মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আসকে পিটের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বার বার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী [illegible]রিয়ায়—

চিক্‌চিক্ ড্যাম! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে [illegible]ড়ল।

পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস?

হাঁ। আছি।

আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, উনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে [illegible]ছে, না?

হ্যাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠেছে ওদের কথায়।

আবার: আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায়?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে [illegible] দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ! মন্দিরের কাছাকাছি [illegible] আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের [illegible] উনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তে সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি।

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা [illegible]টির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই।

উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ! হেই মায়ী।

আবার জোর ফিরে এল দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার।

সে ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভীন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায়।

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। অতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষপর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে দিল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভালো করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল ফসকে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটির মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেকদূর। দাঁড়াবার উপায়

নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরো জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ, চুপ, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কী হ—ল ?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘন ঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে, তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বার বার ডুবছে! আর শুয়োরগুলি ভেসে যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া! আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ায় দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে

গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হ্যাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারেনি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো! কাঁদিস্ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারও অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুন্‌গুন্ করতে লাগল।

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হুই রামো!

তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।

স্বীকারোক্তি

[১৯৪৯ সালে বে-আইনী ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত]

…তার পরে ওরা আমাকে এস বি সেল-এ এনে ঢোকালো। বাইশে ডিসেম্বরের বেলা দশটা হবে তখন। আমার কাছে ঘড়ি ছিল না। শীতের বেলা দেখে, আর লালবাজার থেকে লর্ড সিন্‌হা রোড পর্যন্ত রাস্তার চেহারা দেখে আমার মনে হল, তখন বেলা দশটাই হবে, যদিও একটা আচ্ছন্নতা আমাকে গ্রাস করেছিল। সারারাত্রি ঘুম হয়নি। লালবাজার হাজতের সেই ঘর, টিমটিমে অকম্পিত সেই আলো, চার দেওয়াল জুড়ে সেইসব বিচিত্র আঁকাজোকা হিজিবিজি লেখা, আর অর্ধোন্মাদ সেই বন্দী, যে আমার দিকে স্থির চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল, হেসে উঠছিল, বিড়বিড় করে বলছিল বা গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এমন করে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেন ওখানে কোন দেওয়াল নেই, একটা দরজা আছে, খোলা দরজা —যেখান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। তার পরে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে অর্থাৎ হাজতঘরের দিকে ফিরে বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে হাত তুলে তর্জনীটা শূন্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ভুরু কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বিড়বিড় করছিল। …ও যে কে তা আমি জানতাম না। পোশাক-আশাক মোটামুটি ভদ্রকমের হলেও ও রাজনৈতিক বন্দী কিনা আমি বুঝতে পারছিলাম না। চোর কিংবা ডাকাত বা পকেটমার সেরকম কাউকে আমার সঙ্গে একই হাজতঘরে পুরে দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ ওরা জানত, তাতে আমার মনোবল আরো নষ্ট হবে, আমি আরো বেশি গ্লানি বোধ করব, মুক্তির ইচ্ছে আমার প্রবল হয়ে উঠবে। আর তা উঠলেই ওরা আমার কাছে যা জানতে চাইছে, ওদের ধারণা, তা সহজ হয়ে উঠবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরশু ওরা তা-ই রেখেছিল। তিনটি ছোকরাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাদের দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওরা যেন হাজতে আসেনি, কোন চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে এসেছে। ওরা বকবক করছিল, হাসাহাসি করছিল, খিস্তি করছিল, আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করছিল, এবং সে-সময়ে অশ্রাব্য উক্তিই শুধু করছিল না, কোমরের পরিধান শিথিল করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিম্নাঙ্গ দেখাচ্ছিল যাতে ক্রোধ এবং অবজ্ঞা অত্যন্ত উগ্র হয়ে ফুটে উঠছিল। স্বভাবতই আমার খুব খারাপ লাগছিল, অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এটাও বুঝতে পারছিলাম, ওদের কোন দোষ নেই, ওরা ওদের স্বাভাবিক ব্যবহারই করছিল, এমনকি ওরা এও বুঝতে পারছিল আমি অত্যন্ত অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করছি,

যে-কারণে আমার দিকে তাকিয়ে ওরাও একটু সংকুচিত হচ্ছিল, আড়ষ্ট বোধ করছিল এবং আমাকেই সাক্ষী মানছিল, 'দেখুন না বড়দা…' ইত্যাদি। ওদের কথা থেকেই জানা যাচ্ছিল বন্দরের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বে-আইনী আমদানী করা মালপত্র পাচার করার সময় ওরা ধরা পড়েছে। ইতিপূর্বেও ওরা কয়েকবার ধরা পড়েছে, কয়েক মাস করে জেলও খেটেছে। কোনকিছুই নতুন নয়। তবু ধরা-পড়ার কারণগুলো আলোচনা করতে গিয়েই ওদের ঝগড়া হচ্ছিল। একটাই শুধু আশ্চর্য, আমাকে ওরা কিছুই জিগ্যেস করেনি, আমি কে, কী অপরাধে হাজতবাস করছি। প্রথম থেকেই ওরা আমাকে 'বাবু' বা 'বড়দা' এইরকম সম্বোধন করছিল। আমি কর্তৃপক্ষের কথা ভাবছিলাম, তারা কেন ছেলে তিনটেকে আমার ঘরেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয়নি পুলিশের ওটা কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, একটি সুচিন্তিত পরীক্ষা মাত্র। এটা যখনই বুঝতে পারলাম তখনই মনকে প্রস্তুত করে নিলাম এইভাবে যে আমি যেন কোনরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝখানে রয়েছি। ভীষণ ঝড় বা ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো কোন দুর্যোগের মধ্যে নয়, যেন দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়িবাঁধের ওপর কোন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারপাশে পাঁক কাদা নোংরা পশুর মৃতদেহ জোঁক আর কেঁচো পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আর আকাশ কালো, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। বৃষ্টির বা পাঁক কাদার বা জোঁক কেঁচোর কোন দোষ নেই, সবই স্বাভাবিক এবং যা-কিছুরই দায়, সবই আমার জীবনের কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত, যে গতি-প্রকৃতির দ্বারা আমি লোকালয়-বহির্ভূত ভেড়িবাঁধের ওপরে একটি বিচ্ছিন্ন একক গাছের নিচে উপস্থিত। অতএব—

অতএব ছেলে তিনটির সঙ্গে হাজতে আমার সারাদিন ও রাত্রি একরকমভাবে কেটে গিয়েছিল। তার জন্যে যে-সব কষ্ট, গ্লানি ও পীড়া আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল, সে-সব আমি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। ওদের খিস্তি-খেউড়, অশ্লীল গল্প, পরস্পরকে নিম্নাঙ্গ প্রদর্শন এবং রাত্রে আলোকিত হাজত-ঘরের মধ্যেই কম্বলের আড়াল রাখবার চেষ্টা করে ওদের সমকামী আচার আচরণ হাসি ইশারা গোঙানি এবং আর্তনাদ সবই একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের মতো ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আর যেহেতু মন অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগের মতোই অধিকাংশ সময় কোন-কিছু দর্শনে স্মৃতির অন্ধকার দেওয়ালে এক-একটা ঝলক দেখতে পায়, সেইরকম কোন কোন সমকামিতার ঘটনা আমার মনে পড়ছিল। যেমন আমাদের শহরের স্কুলের মাস্টার প্রিয়তোষ আর ছাত্র খোকন, কিংবা—যাক সে-কথা, অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে সচরাচর যা ঘটে থাকে, সেইসব ঘটনা ও ঘটনার চরিত্রদের কথা আমার মনে পড়ছিল। এবং একসময়ে অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে এসে যেমন হঠাৎ-আলোর সামনে পড়া যায়, তেমনিভাবে নীরাকে আমি আমার আলিঙ্গনে আবিষ্কার করেছিলাম—যে-আলিঙ্গন আমার স্ত্রীকে, সমাজকে, পার্টিকে এবং গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে অর্জন করতে হয়। আর নীরাকে মনে পড়ায়,

শেষরাত্রের দিকে যেটুকু বা আমার ঘুমের আশা ছিল সেটুকু তিরোহিত হয়েছিল। যদিও তখন ছেলে তিনটি গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়েছিল। দোতলার হাজতঘর থেকে লালবাজারকে স্তব্ধ মনে হচ্ছিল, তবু তখন আর-একটা বন্দী জীবনের নানান পীড়া, গ্লানি, অস্বস্তি, অশান্তি আমাকে কাতর করছিল। এবং আবার নতুন করে একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের কথা আমার মনে হচ্ছিল, যে-দুর্যোগ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে, আর আমার নিজেরই জীবনের কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির দরুণ নিরুপায় অবস্থায় দুর্যোগ পার হয়ে যেতে হয়।

রাজনৈতিক মতবাদ যেমন একটি সৎ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নীরাকে ভালোবাসাও তেমনি এবং পার্টিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির মতো মেনে নেওয়া একটা অসৎ দুর্বলতা, ভীরুতা, তেমনি এই সমাজের বৈবাহিক বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণগুলোকেও মেনে নেওয়ার মধ্যে পাপ লুকিয়ে আছে। তাই নীরার আর আমার মাঝখানেও শাসন, সন্দেহ, আইন, জেলখানা, পুলিশ-সুপার, ইন্সপেক্টর, ইনভেস্টিগেশন, স্বীকারোক্তি, জিজ্ঞাসাবাদ, ভয়-দেখানো, স্নায়ুকে খোঁচানো, সবই আছে। এবং সেখানেও নানান প্রক্রিয়ায় উত্যক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

অতএব সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় আমার অস্তিত্ব নিয়োজিত, তাই বহুবিধ কল্পনা আমার আশ্রয়।

তার পরে গতকাল সকালবেলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অত্যধিক পান খেয়ে খেয়ে ছুঁচলো মোটা ঠোঁট, দাঁত নোংরা হয়ে গিয়েছে, কালো মুখ, মোটা লেন্সের চশমা, এইরকম মাঝবয়সী একজন অফিসার কতগুলি মামুলি প্রশ্ন করেছিল—যার জবাব আমি বহুবার দিয়েছি। নাম, ধাম, পেশা, পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয়, পার্টিতে কত সালে এসেছি (পার্টিতে কোনদিন আসিইনি, এই আমার জবাব ছিল), কোন্ কোন্ নেতাকে আমি চিনি, তারা কে কোথায় আছে (আমি জানি না, এই আমার জবাব) ইত্যাদি। কিন্তু অফিসারটি নিতান্ত যেন কর্তব্য করেই যাচ্ছিল, এমনিভাবে প্রশ্ন করছিল, অন্যমনস্কভাবে ফাইল উলটেপালটে দেখছিল, আর এক-একটা প্রশ্ন করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কন্যাদায়গ্রস্ত।

ঘণ্টা-দুয়েক পরেই আমাকে সেন্ট্রির পাহারায় আবার লক-আপে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তখন সেই ছেলে তিনটে আর ছিল না। আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। আধ-ঘণ্টা বাদেই তালা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, সেই অদ্ভুত চরিত্রের বন্দীকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল—যাকে আমার উন্মাদ বলেই মনে হয়েছিল, যদিও উন্মাদ অপরাধীদের জন্যে আলাদা গারদ আছে। লোকটার সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি। কথা বলবার যোগ্য পাত্র সে ছিল না। এমনও হতে পারে, পাগলামিটাই লোকটার ভান, হয়তো স্পাই, কাছে থেকে আমাকে নিরীক্ষণ করা বা অনুধাবন করাই তার কাজ। শুধু যে সরকারী গোয়েন্দাই হতে পারে তা নয়, পার্টির স্পাই হওয়াও বিচিত্র নয়। হয়তো পার্টিই এই লোকটিকে পুলিশের

কাছে ধরা দিয়ে আমার সান্নিধ্যে আসার নির্দেশ দিয়েছে, আমার গতিবিধি, মানসিক অবস্থা, স্বীকারোক্তি করি কিনা এইসব জানতে। কারণ পার্টির পরিচালকেরা জানে তাদের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে আমার মতভেদ আছে। সরকারীই হোক আর পার্টিরই হোক স্পাইমাত্রকেই আমার যেন সরীসৃপ-জাতীয় জীব মনে হয়, আমি এদের কাছে কখনোই স্বচ্ছন্দ বোধ করি নে, কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে, ভয় ও ঘৃণা হয়। আবার এমনও হতে পারে একটা পাগলকে সারা দিনরাত্রির জন্যে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করেই আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই একই উদ্দেশ্যে, আমাকে উত্ত্যক্ত করে মানসিক ভারসাম্য হারাবার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

লোকটার ভাবভঙ্গি ব্যবহার, মাঝে মাঝে কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, ফিসফিস করা, বিড়বিড় করা, ধপাস করে আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়া এবং হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শের উদ্যোগ করা, হঠাৎ হেসে ওঠা সব মিলিয়ে বিশ্রী উত্ত্যক্ত করেছিল। আমি চোখ বুজতে পারিনি সারারাতে। নানান রকম ভেবেছিলাম। লোকটা যদি আমাকে কামড়েই দেয় বা খামচে দেয়। কত কী-ই করতে পারত। গতকাল সন্দেহ আর উৎকণ্ঠায় আমার রাত্রি কেটেছে। মনে মনে আমি একটা দুর্যোগের কল্পনা করেছিলাম।

আজ ওরা আমাকে এস বি সেল-এ নিয়ে এল। আজ বাইশে ডিসেম্বর। আসন্ন বড়দিনের উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে কলকাতায়, লালবাজার থেকে জীপে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল। যদিও কলকাতাকে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। এমনিতেই কলকাতাকে আমার নীরক্ত মনে হয়। তার ওপরে আমার মনের মধ্যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। আমার দু-পাশে সশস্ত্র প্রহরী। ড্রাইভারের পাশে একজন যুবক অফিসার, যে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি, ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি। সে লুব্ধ দু-চোখ ভরে চৌরঙ্গি এলাকাকে যেন গিলছে। আসন্ন বড়দিনের স্বপ্ন তার চোখে। আর, বিশেষ করে কলকাতার এই অংশটাকে আমার সব থেকে বেশি নীরক্ত ও প্রাণহীন বলে মনে হয়।

যদিও প্রশ্ন ও জবাব বিধিবহির্ভূত, তবু আমি জিগ্যেস করলাম, 'এখন কোথায় যাচ্ছি?'

প্রায় এক মিনিট বাদে, যখন জবাবের প্রত্যাশা প্রায় নিঃশেষ, তখন অফিসার মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'এস বি অফিস।'

স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস। জিগ্যেস করলাম, 'আবার আমি ফিরে যাব?'

জবাব: 'না, এস বি সেল-এ থাকতে হবে।'

লালবাজারেরটা লক-আপ। সেল শুনে জিগ্যেস করলাম, 'সেখানেও কি লালবাজারের মতোই?'

রাস্তায় একঝাঁক মেয়ের দিকে অফিসার তাকিয়ে ছিল। অন্য সময় হলে হয়তো আমিও মেয়েদের তাকিয়ে দেখতাম, খুশি হতাম। মেয়েদের ঝাঁকটা হাসতে হাসতে

কথা বলতে বলতে চলেছে। হয়তো বেড়াতে কিংবা বড়দিনের বাজার করতে চলেছে। কিন্তু ওদের নিয়ে আমার চিন্তা বিস্তৃত হল না। জবাবের প্রত্যাশায় অফিসারটির ঘাড়ের দিকেই আমার দৃষ্টি।

মেয়েদের দলটা পার হয়ে যাবার পর জবাব এল, 'না, সেখানে এক-একজনের এক-একটা ঘর।'

কথাটা শোনামাত্রই মনটা খুশি হয়ে উঠল। এক-একজনের এক-একটা ঘর। সেখানে আর কেউ থাকবে না। কয়েকদিন লালবাজার লক-আপে নানান ধরনের অচেনা লোকদের সঙ্গে থেকে, সবসময় বাতি জ্বালানো, প্রস্রাবের দুর্গন্ধ আর দেওয়ালের অশ্লীল লেখা, 'ও ছুঁড়ি, তোর দাঁড়কাকে গাল খাবলে খাবে' (সম্ভবত এটা কোন গানের কলি), অনেক নাম, তারিখ, প্রধানত যৌন-বিষয়ক আনন্দের ব্যাখ্যা, অনেক গানের কলিও তাই এবং আনাড়ী হাতের একই বিষয়ের ছবি, দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, দেয়ালের অনেক লেখা এবং ছবিই পেন্সিলে বোলানো। অথচ পেন্সিল কোন কয়েদীর কাছেই থাকা উচিত নয়। হাজতে থাকার সময় লজ্জা নিবারণের জামাকাপড় ছাড়া বন্দীর কাছে আর কিছুই থাকবার নিয়ম নেই। ধূমপান নিষিদ্ধ। লক-আপের বাইরে গিয়ে খেতে হয়। ভিতরে কিছুই থাকবে না। এমনকি নিজের ঘড়ি আংটি টাকা-পয়সা সবই জমা দিয়ে দিতে হয়। একটুকরো কাগজ থাকাও নিষেধ। বন্দী যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে বা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা না করতে পারে, সেজন্যেই নাকি এত বিধিনিষেধ। এরকমই আমি শুনেছিলাম।

আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল, সেই একলা ঘরটায় আমি ধূমপান করতে পারব কিনা, খবরের কাগজ দেখতে পাব কিনা,—নিদেন কোন বই, ছাপার অক্ষরে যে-কোন জিনিস, যা পড়তে পারা যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদের শাস্তি এবার শেষ হবে কিনা।

কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই গাড়িটা লর্ড সিন্‌হা রোডের একটা বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়ল। একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই আমাকে নামতে বলা হল। নামতেই প্রকাণ্ড পুরনো ধরনের বাড়িটার ভিতরে আমাকে অফিসারটি নিয়ে গেল। দিনের বেলাও সব ঘরেই আলো জ্বলছে। দেখলেই বোঝা যায়, দেয়াল খুব মোটা। উঁচু ছাদ আর বড় বড় ঘর। বাড়ির ভিতরটা বেশ কর্মমুখর। য়ুনিফর্ম আর সাদা পোশাক পরা অনেক লোক চলাফেরা করছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলছে বা বসে বসে কাজ করছে। কারুর হাতে ফাইল, কেউ খালি হাতে। কোথাও তেমন সাজানো-গোছানো কিছু নেই। নিতান্তই যেন কাজ চলা গোছের টেবিল চেয়ার বেঞ্চ কোন কোন ঘরে রয়েছে। কোন কোন ঘর ফাঁকা। অবিশ্যি কোন কোন ঘরের দরজায় দামী পরদা, ভিতরে উজ্জ্বল আলোর ঝলকও দেখতে পেলাম। সম্ভবত বড় অফিসারদের ঘর সেগুলো।

একটা বাড়ি পেরিয়ে আবার একটা বাঁধানো উঠোন এবং সেখানেও কয়েকটা

গাছ। গাছে পাখিরা জটলা করছে। আমার ভালো লাগল। লালবাজারের সেই দোতলার হাজতঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে আমার মনটা খুশি হয়ে উঠল। সেখানে ঘরের ভিতর থেকে বারান্দার দিকে ঘিঞ্জি জালে ঘেরা ফাঁক দিয়ে একটা উঁচু বাড়ির মাথায় দু-তিন ফুট আকাশ দেখতে পেতাম মাত্র। ঘরের অন্যান্য বন্দীদের জন্যে সেই ছোট্ট জালের হিজিবিজি-আঁকা আকাশ দেখবার অবকাশও কম হত।

এখানে উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ানো। এখানে ওখানে পাখির বিষ্ঠা। আমি এ-সবই দু-চোখ ভরে দেখলাম। চোখ তুলে গাছের দিকে তাকালাম। শুধু কাক শালিক নয়, কয়েকটা পায়রাও রয়েছে। যদিও উঠোনের ওপারেই পুব দিকে আর একটা তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তবু নীল আকাশ অনেকখানিই দেখা যায়। আর আকাশটার দিকে চোখ রাখতে আমার অবস্থা যেন ব্রীড়াময়ী সলজ্জ প্রেমিকার মতো হয়ে উঠল। হয়তো আমার চোখে ঠাণ্ডা লেগেছে বা যে-কোন কারণেই হোক, এত ঔজ্জ্বল্য আমার চোখে সইছে না, তাই চোখের পাতা বুজে যাচ্ছে। অথচ প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করছে। এস বি সেল কি এই তিনতলা বাড়িতেই ? আমি কি এখানেই থাকব ?

'এই দিকে।'

তিনতলা বাড়ির একটা দরজার কাছ থেকে অফিসারটি আমাকে ডাকল। বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকলাম। এ-বাড়িটাও পুরনো। হয়তো শতাধিক বছর বয়স হবে। ভিতরটা কনকন করছে ঠাণ্ডায়। বাড়িটার বুড়ো বয়সের গন্ধ পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। মেঝের ঠাণ্ডা যেন আমার জুতোর সোল ফুঁড়ে স্পর্শ করছে। গায়ের চাদরটা আমি আর-একটু ভালো করে জড়ালাম। প্রায় আধো-অন্ধকার এক-একটা ঘর দিয়ে অফিসারকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম।

এখানেও সশস্ত্র ও নিরস্ত্র, য়ুনিফর্ম ও সাদা পোশাক পরা কর্মচারীরা চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। আগের বাড়িটার মতো ভিড় এখানে নেই। আর একমাত্র বৈশিষ্ট্য, এখানে কোন কোন ঘরের দরজা বন্ধ, এবং বন্ধ দরজার সামনে একজন করে বন্দুকধারী প্রহরী। আগের বাড়িটাতে আমাকে কেউই তাকিয়ে দেখেনি। এখানে অনেকেই আমাকে তাকিয়ে দেখল। আমার মনে হল, এই তাকিয়ে দেখার মধ্যে একটা শিকারীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রয়েছে। আমাকে দেখার পর প্রত্যেকেই যুবক অফিসারটির সঙ্গে চোখাচোখি করছে। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে তাদের যে কী নিঃশব্দ কথার আদান-প্রদান হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না। একটা-কিছু কথা আদান-প্রদান হচ্ছে, সেটা অনুমান করা যায়।

এ-বাড়ির আবহাওয়া একটু যেন অন্যরকম। ঠিক নিশ্চুপ নয়, অথচ একটা স্তব্ধতা যেন বিরাজ করছে। এক-একজনের মুখ কেমন একটা ক্রুর উত্তেজনায় ঝলকাচ্ছে। কেন কে জানে। যেতে যেতে আমার সামনেই হঠাৎ একটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে। সান্ত্রী দরজাটা

টেনে দেবার আগেই চকিতে আমার চোখে পড়ল, ঘরের মাঝখানের টেবিলে একজন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দু-হাত ছড়িয়ে, আর একটা কালো কম্বল টেবিলের ওপর থেকে মেঝেয় লুটোচ্ছে। আমি দরজাটা পার হয়ে যেতেই অন্য দিক থেকে আর একটি লোককে তাড়াতাড়ি আসতে দেখলাম। তার চোখে চশমা, গায়ে ওভারকোট, কোটের পকেট দুটো যেন অনেক মালপত্রে মোটা হয়ে আছে। আর হাতে স্টেথিস্কোপ। মনে হল, লোকটা ডাক্তার। দেখলাম, সে ওই ঘরটাতেই গিয়ে ঢুকল।

আমার গতি সম্ভবত শ্লথ হয়ে এসেছিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। আমার কাঁধে একটা ঠেলা লাগতেই দেখলাম, অফিসারটি আমাকে আঙুল দেখিয়ে পথনির্দেশ করছে। ভ্রুকুটি বিরক্তি তার মুখে।

আমি তাকে অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে টেবিলের ওপর সেই মূর্তিটা ভাসছে। আর ডাক্তারের দ্রুত আগমন ভুলতে পারছি না। কোন অসুখবিসুখের ব্যাপার নাকি? না কি স্বীকারোক্তির জন্যে··· ? দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া সেই লোকটির চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলাম। প্রকাণ্ড চেহারা, উসকোখুসকো চুল, হাতা গোটানো, লোমশ-বুকখোলা শার্ট, আর হাতে ঝোলানো কোট। লোকটা কি স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে ওকে মেরেছে? যাকে এক মুহূর্তের জন্য খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে? বেত দিয়ে মেরেছে, না কি কম্বল চাপা দিয়ে ভারি রুল দিয়ে পিটিয়েছে? কারণ একটা কালো কম্বলও টেবিল থেকে মেঝেতে লুটোতে দেখলাম। আর কম্বল জড়িয়ে মারার পদ্ধতি কলকাতা পুলিশের আছে। শুনেছি তাতে দেহে কোন দাগ হয় না। অথচ প্রহার ও পীড়নের সুবিধে হয়।

বন্দীর আঘাত কি খুব বেশি হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিল?

'দাঁড়ান।'

আমাকেই বলা হল। ওপরে উঠেই বাঁ দিকে টেবিলের সামনে চেয়ারে একজন ফর্সা মোটা মাঝবয়সী লোক বসে ছিল। আমাকে যে নিয়ে এল সেই অফিসারটি নিচু হয়ে নিচু গলায় কী যেন বলল মোটা মাঝবয়সীকে। মোটা মাঝবয়সী একবার আমার দিকে তাকিয়ে তার হাতের পেন্সিল দিয়ে এক দিকে নির্দেশ করল। অফিসারটি আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

অনুসরণ করলাম। সামনেই ডান দিকে পর পর কয়েকটি দরজা। একটা ভেজানো দরজা ঠেলে আমাকে ভিতরে যেতে নির্দেশ করে সে বলল, 'আপনি একটু বসুন।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এটা কি সেল?'

'না।' বলেই সে চলে গেল।

একজন সান্ত্রী এসে দাঁড়াল এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। এটা সেল নয়। একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, এই মাত্র আসবাব। ঘরের মেঝে পুরনো, দেয়ালও তাই। ঘরের মধ্যে যেন দলা দলা শীত জমে ছিল। ঢোকা মাত্রই তারা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠল, এবং হঠাৎ শিরদাঁড়া শিউরিয়ে ছলাৎ করে যেন এক-ঝলক রক্ত উঠে এল আমার মাথায়। স্বীকারোক্তি! আবার স্বীকারোক্তি!

এটা জিজ্ঞাসাবাদের ঘর। অবিকল সেই নিচের ঘরটার মতোই, যে-ঘরে সেই বন্দী পড়ে আছে। আমার শীতের কাঁপুনিটা বোধহয় এই কারণেই, ওই একটি মুহূর্তের দৃশ্যের জন্যেই। আমাকেও হয়তো স্বীকারোক্তির জন্যে…

একটাই মাত্র জানালা আছে ঘরটিতে। দেয়ালের অনেক উঁচুতে আমার মাথা ছাড়িয়ে। শুধু আকাশই দেখা যায়। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। দাঁড়াতে পারছি না, ভীষণ শীত করছে, কাঁপুনিটা বুকের কাছে উঠে এসেছে। হাতে পায়ে তেমন যেন বল নেই। পা তুলে টেবিলটা চেপে ধরে, শক্ত হয়ে, গুটিসুটি হয়ে বসলাম।

তার পরে প্রথমেই আমার মনে পড়ল, আমার চুলের মুঠি আমার বাবার হাতে, ভীষণ লাগছে। গাল দুটো জ্বালা করছে থাপ্পড়ের ঘায়ে। বাবার খালি গা, পেশল শক্ত শরীর ও ক্রুদ্ধ মুখটা মনে হচ্ছে বাঘের থেকে ভয়ংকর, সিংহের থেকে হিংস্র। গলায় হিংস্র জিজ্ঞাসা : 'বল্, ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছিলি? নৌকো বাইতে? মাছ ধরতে? বল্ বল্ বল্। তা নইলে খুন করব আজ তোকে।'

তার পরেই মনে পড়ল, ঢাকা শহরের সেই প্রায়ান্ধকার গলিটার কথা, যেখানে মাত্র একটি কেরোসিনের লাইটপোস্ট ছিল, এবং তিনজন বন্ধু আমাকে ঘিরে ছিল। পার্টির বন্ধু। আজকের এই পার্টি নয়, অন্য পার্টি, সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টি। তিন-জনেরই চোখমুখ ভীষণ নিষ্ঠুর আর হিংস্র দেখাচ্ছিল। সকলেই আমরা সমবয়সী, ষোলো সতেরো আঠারোর মধ্যেই সকলের বয়স। বন্ধু তিনজনের জিজ্ঞাস্য, আমি রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের বাড়ি বেড়াতেই যাই কি না, কেন যাই এবং বিরাজ-মোহনের নাতনী অলকাকে আমি সমিতির কথা বলেছি কি না।

'আমরা জবাব চাই।' ওরা তিনজনেই রুদ্ধশ্বাস ক্রুদ্ধ গলায় জিগ্যেস করল।

বিরাজমোহনকে আমি কোনদিনই দেখিনি, কিন্তু তাঁদের বাড়িতে যাই। এই যাওয়াটা নিষিদ্ধ, কারণ বিরাজমোহন পার্টির বিচারে বিশ্বাসঘাতক, শত্রু। আমি তাঁর কাছে যাই না, তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে যাই, কারণ ভালো লাগে, তারা সকলেই খুব ভালো। বিরাজমোহনের নাতি-নাতনী বলে তাদের কোন দোষ নেই, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়। আর অলকার সঙ্গে আমার প্রেম (অন্তত সেই বয়সে, সেটাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। অলকার বয়স তখন বারো, দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, আমরা হাতে হাত ধরতাম, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা'র নায়ক-

নায়িকার মতো চুমো খাবার চেষ্টা করতাম, ইত্যাদি), তাকে আমার জীবনের সব গোপনীয়তাই প্রকাশ করে দিই। বিশ্বাস করি বলেই বলেছি। পার্টির বন্ধুরা ঠিক প্রশ্নই করেছিল, তারা ঠিক সন্দেহই করেছিল। কিন্তু ওরা আমার এবং অলকাদের ওপর অবিচার করছে, অন্যায় করছে, তাই আমি অস্বীকার করলাম, 'এ-বিষয়ে কিছুই জানি না।'

প্রথমে নরেশ তুম করে একটা ঘুষি মারল আমার চোয়ালে। বলল, 'এখনো সত্যি কথা বল্।'

'জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই মারতে আরম্ভ করল। বলতে লাগল, 'ট্রেইটার! স্পাই। ওকে খুন করে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে হবে।'

আমার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এমন সময়ে কারা যেন গলিতে ঢুকল। লোকজনের সাড়া পেয়ে বন্ধুরা অন্ধকারে দৌড়ে কে কোথায় চলে গেল। আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে একদিকে চলতে লাগলাম। লোকজনের কাছে বাইরে আমি কিছু জানাতে চাই না। যদিও ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ রেখেছিল, আমি কোথায় যাই। আমি বুড়িগঙ্গার ধারেই গেলাম। কারণ জল দিয়ে মুখ-চোখ ধোবার দরকার ছিল।

এর পরেই আমার মনে পড়ল, আমার স্ত্রী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার বুকের কাছে জামাটা সে খামচে ধরে আছে। হিংস্র রাগে ওর চোখ, ওর মুখ জ্বলছে। আমি সিঁড়ির কাছে, অদূরেই বাড়ির ঝি ঘর মুছছে ন্যাতা বুলিয়ে, যদিও তার হাত ঠিক কাজ করতে পারছে না, নত মুখ, নত চোখের দৃষ্টি, এদিকে এবং আমার মা ঘরের ভিতর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। স্বীকারোক্তির জন্য ও আমার জামায় হ্যাঁচকা টান মেরে ফুঁসে উঠল, 'বল, কাল তুমি নীরার সঙ্গে দেখা করেছিলে কিনা।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওর চেহারাটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমাকে একটা ধাক্কা মেরে বলল, 'বল, ওকে তুমি ভালোবাসো? কেন ভালোবাসো? বল বল বল।'

ওর কষ্ট, কষ্টের জন্যে হিংসা, হিংসা থেকে রাগ, রাগ থেকে ঘৃণা এ সবই আমি বুঝতে পারছি, এবং নীরাকে আমি ভালোবাসি, নীরার সঙ্গে দেখাও করে থাকি। কিন্তু কেন, এর জবাব, ছেলেবেলায় ইস্কুল পালানোর মতোই, অলকাদের সঙ্গে মেশার মতোই, এবং আজকের এই বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেবার মতোই অপ্রতিরোধ্য ও কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমি চুপ করেই রইলাম, জামাটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম।

ও একটা অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, আর দু-হাত দিয়ে আমার জামাটা ছিঁড়ে ফালা করে দিল।

এবার আমার মনে পড়ল, পার্টির লোকাল অ্যাকশন কমিটির তলব। মাত্র মাস-

ছয়েক আগের কথা, অ্যাকশন কমিটি আমাকে ডেকে পাঠাল। অ্যাকশন কমিটি মানে, পার্টির আর্মস অ্যামুনিশন যাদের তত্ত্বাবধানে, যারা শত্রুকে চিহ্নিত করে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় আর কর্মীদের অপরাধের বিচার করে।

সেই এক জনবিরল লোকালয়, পুরনো বাড়ির দোতলার প্রায়ান্ধকার ঘর। পাথরের মূর্তির মতো নিরেট শক্ত মুখ নিয়ে পাঁচজন বসে আছে। অ্যাকশন কমিটি। ক্যারিয়র আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। আমি অ্যাকশন কমিটিকে পার্টির নিয়মতান্ত্রিক অভিবাদন করলাম। কিন্তু কেউ প্রত্যভিবাদন জানাল না। আমাকে শুধু তাদের মুখোমুখি বসতে ইঙ্গিত করা হল।

মিহির, অ্যাকশন কমিটির নেতার এই ছদ্ম নাম, যার স্মার্টনেস, সাহস, চেহারা, বাক্‌ভঙ্গির খুবই নাম আছে পার্টির মধ্যে। বোনাপার্ট বলে সবাই যাকে আদর করে, কারণ তার চেহারার সঙ্গে নাকি নেপোলিয়ানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, এবং জিমন্যাসিয়ামের ক্রীড়ায় বেশ পটু ও স্বভাবতই তার শার্ট-খোলা বুকের ও চলা-বসার ভঙ্গি দৃষ্টি-মুগ্ধকর, যার চোখ তীক্ষ্ণ ঈগলের মতো, আর একদম হাসে না, যেটা নিয়ে সবাই বিস্মিত প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ, কারণ মিহিরকে কেউ হাসতে পর্যন্ত দেখেনি। আমার ধারণা, মিহির আত্মসচেতন, অনেকটাই ভঙ্গিসর্বস্ব অ্যাডভেঞ্চারার। সে-ই আমাকে জিগ্যেস করল, 'উম্‌-ম্‌ম্‌···হ্যাঁ, কমরেড! অ্যাকশন কমিটি আপনার কাছে জানতে চাইছে, ধ্রুবকে আপনি কোন শেলটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কিনা। তার আগে জানতে চাই, পি সি এগারো-শো বাই বারো আট উনপঞ্চাশ নম্বরের সার্কুলার আপনাদের সেল-এ পৌঁছেছিল কিনা, এবং আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা।'

মিহিরের চোখ থেকে যেন একটি ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপের ঝিলিক আমাকে হানল, এবং বাকি সকলেরই তাই।

মিহির যা-যা জিগ্যেস করল, সবই সত্যি। গোপন সার্কুলারে ঘোষণা করা হয়েছিল: 'ধ্রুবকে কতকগুলি বিশেষ কারণে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পার্টির বিশেষ স্বার্থে কারণগুলি এখন ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সভ্যদের সবাইকে জানানো যাচ্ছে, ধ্রুবর সঙ্গে যেন কেউ কোনরকম সম্পর্ক না রাখেন, এমনকি বাক্যালাপ না করেন, করলে পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে তাঁকেও শাস্তি পেতে হবে, ইত্যাদি।' আমি সে-সার্কুলার পাঠ করেছিলাম, কিন্তু ধ্রুবকে আশ্রয়ও সত্যি দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসী সৎ পার্টিজান, চিন্তাশীল, বিবেকবান ধ্রুবর সঙ্গে জেলার একজন নেতা ও অ্যাকশন কমিটির মিহিরের ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে তাকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছিল। তাকে স্পাই আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল, এবং সেটা কার্যকরীও করা হয়েছে। অথচ ধ্রুব একজন আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী, পুলিশ তার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছে। এ-অবস্থায় তাকে পার্টি থেকে বের করে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে

সে বেরিয়ে পড়ুক। অর্থাৎ পুলিশের হাতে চলে যাক। পার্টি থেকে বহিষ্কার মানেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডের আশ্রয় তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলেই পুলিশ তাকে ধরতে পারবে, এবং ধরবেই, যেহেতু ধ্রুব একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার আগে যে প্রকৃতই একজন জননেতা ছিল, তাকে পুলিশ নানানভাবে পীড়ন করবে কথা আদায় করবার জন্যে। এক দিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার, অন্য দিকে পুলিশের পীড়ন, দুইয়ে মিলে স্বভাবতই মানসিক শক্তিতে ভাঙন ধরতে পারে, স্বীকারোক্তিও করে ফেলতে পারে।

এ-অবস্থায় ধ্রুব আমার কাছে এসেছিল। পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ডের আশ্রয় ছেড়েই সে আমার শরণাপন্ন হয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল, এবং বলেছিল, 'আমি আত্মহত্যা করতে পারি, তবু পুলিশের কাছে ধরা দিতে পারব না। মিহির আর যতীন (জেলা কমিটির নেতা) প্ল্যান করে আমার এই সর্বনাশটা করছে, তারা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছে। অথচ বিশ্বাস কর, কোনরকম নেতৃত্বের মোহ আমার নেই, আমি শুধু কোন কোন ক্ষেত্রে ওদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছিলাম। ওরা সেটা সহ্য করতে পারছে না বলেই আমাকে এভাবে বের করে দিচ্ছে।'

সৎ ধ্রুবকে আমি দেখলাম, সে অসহায়। আমি তাকে বিশ্বাস করি। মিহিরের অতীতকে আমি জানি না, তাকে ওপর থেকে আমাদের এলাকায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বাইরে থেকে এসেছে। আমি ধ্রুবকে চিনি, বুঝি, বিশ্বাস করি এবং তাকে এভাবে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মুখে এক-টুকরো মাংসের মতো আমি ছুঁড়ে দিতে পারি না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু আমার উপায় নেই, অ্যাকশন কমিটির কাছে আমাকে অস্বীকার করতেই হবে। স্বীকার করলে আমার ওপর নির্দেশ অমান্যের শাস্তি নেমে আসবে তো বটেই, ধ্রুবকেও বাঁচানো যাবে না। এখন এই অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা বিবেকহীন দাস মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললাম, 'সেই সার্কুলার আমি পড়েছি। ধ্রুবকে আমি আশ্রয় দিইনি।'

অ্যাকশন কমিটির নিরেট মুখগুলো পরস্পরের দিকে একবার চোখাচোখি করল। মিহির তার বাক্যবাণ প্রয়োগ করল। হেসে ঘাড় কুঁচকে বলল, 'আপনার তো একজন খাঁটি কমরেড পার্টির কাছে মিথ্যে কথা বলবে এটা আশা করা যায় না।'

মিহির জানত তার এই ভঙ্গিটা অপরের পক্ষে খুবই ক্রোধের উদ্রেক করে। আমি শান্তভাবেই বললাম, 'আমি মিথ্যে বলিনি।'

'যদি প্রমাণ হাজির করা যায়?'

'তাহলে তো কোন কথাই নেই।' আমি জবাব দিলাম।

অ্যাকশন কমিটির পাথুরে মুখগুলো তীক্ষ্ণ ধারে ঝলকাতে লাগল, চোখগুলো হীরের মতো জ্বলতে লাগল। ঘৃণায় হিংস্র দেখাল। সব থেকে কমবয়স্ক যে, যার

টেক্ নাম পি পি, সে শাসিয়ে উঠল, 'প্রমাণ হলে মনে রাখবেন, আপনাকেও ধ্রুবর মতোই পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

'জানি।' আমি দৃঢ়তা প্রকাশ করলাম।

বিকাশ (ছদ্মনাম) নিষ্ঠুর মুখে, কঠিন গলায় বলল, 'শুধু বের করেই দেওয়া হবে না, তার চেয়েও কঠিন শাস্তি—'

বাকিটা তার চোখের আগুনে ও দাঁতে দাঁত ঘষাতেই বোঝা গেল। ওরা অ্যাকশন কমিটির লোক, হয়তো ওদের প্রত্যেকের কাছেই রিভলভার রয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলে আমাকে—

'গত শুক্রবার—' মিহিরের দৃঢ় গম্ভীর ও নাটুকে গলা বেজে উঠল, 'গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে-এগারোটা নাগাদ ধ্রুব আপনার কাছে যায়নি?'

কথাটা মিথ্যে নয় এবং খবরটা ওরা কমরেড রেবার (আমার স্ত্রী, পার্টির সভ্যা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, স্ত্রীলোক মাত্রেই যা হয়ে থাকে ভালোবাসা ও ধর্মের বিষয়ে যুক্তি-তর্কহীন, যদি ধর্ম মানে, এবং বর্তমানে পার্টি, আমার মতে ধর্মীয় দল ও আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যুক্তি তর্ক বোধ বুদ্ধিহীন অলৌকিক বিশ্বাসে আত্মদানে উন্মুখ, আমার স্ত্রী একজন সেইরকম বিশ্বস্ত কমরেড, এবং বিশ্বস্ততার মূলেও ভালোবাসায় যেহেতু আহত, সে ফণিনীতুল্য) কাছ থেকে শুনেছে।

আমি তবু বললাম, 'না।'

'তাহলে কমরেড রেবা মিথ্যে বলেছেন?' মিহির বলল বেশ বিদ্রূপের ঢেউ দিয়ে, একটু অ্যাসিড-হাসির জ্বালা ছিটিয়ে। যেন এর পরে আর আমার স্বীকারোক্তি না করে উপায় নেই। আমি অবশ্য রেবাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন সে এ-খবর পার্টিকে না দেয়। কিন্তু দিয়েছে।

বললাম, 'যদি তিনি বলে থাকেন তবে মিথ্যেই বলেছেন।'

মিহির গর্জন করে উঠল, 'কমরেড, সাবধান, আপনি আর-একজনকে মিথ্যেবাদী করছেন।'

'আমি মিথ্যে বলিনি।'

'শাট্ আপ লায়ার।' পি পি ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল, নিজের উরুতেই একটা ঘুষি মারল।

আর তার মাঝখান থেকে আহত বাঘের মতো গর্জিত গোঙানি ভেসে উঠল মিহিরের গলায়, 'আপনি সেই রাত্রেই একটা চিঠি লিখে, টাকা দিয়ে ওকে কোথাও পাঠিয়ে দেননি?'

'না।'

'এই ঘৃণ্য মিথ্যে বলার পরিণাম আপনি জানেন?'

'আমি মিথ্যে বলিনি।'

মিহির অসহায় আক্রোশে কী করবে ভেবে পেল না। তার সবল পেশল হাত, মস্ত বড় থাবা অন্ধশক্তিতে কয়েক মুহূর্ত মোচড়াল। তার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে

বলল, 'ডিসল্ভ্ দিস্ মিটিং, একে আজ চলে যেতে দিন। আমাদের সিদ্ধান্ত একে পরে জানানো হবে।'

পি পি বা বিকাশের চলে আসতে দেবার ইচ্ছে ছিল না। তবু সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমি বললাম, 'যেতে পারি?'

মিহির বলল, 'নতুন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত।'

আমি চলে এলাম। তখনো আমার ছেলেবেলার কথাই মনে পড়েছিল, কৈশোরের যৌবনের ইস্কুল পালানো, অলকাদের সঙ্গে মেশা, নীরাকে ভালোবাসা. ধ্রুবকে আশ্রয় দেওয়া এবং—

দরজাটা খুলে গেল। স্বীকারোক্তি। কালো গগল্স্ পরা রাশভারি লোকটি পিছন ফিরে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বগলে একটা ফাইল। এবার জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু সেই শিরদাঁড়া-শিউরনো শীতটা এখন আমার আর নেই! ঘাড় গর্দানে স্থুল পেশল লোমশ লোকটি এক টানে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। ফাইলটা টেবিলে রাখল। মোটা স্বর শোনা গেল, 'এখানে এসে আপনার বডি সার্চ হয়েছে?'

'না।'

'দাঁড়ান।'

দাঁড়ালাম। লোকটা আমার শূন্য পকেটগুলো, কোমর, পেট, চাদর ঝেড়ে দেখে নিল।

'বসুন।'

বসলাম। গগল্স্টা খুলল সে। চোখের পাতায় লোম নেই, কোলগুলো রক্তাভ, অনেকটা কাঁচা ঘায়ের মতো। চেয়ারে বসে ফাইলের পাতা উলটে যেতে লাগল, আর মোটা স্বরে হুম্ হুম্ করতে লাগল। তার পরে আচমকা জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবেন, না বলবেন না?'

'কোন্ বিষয়ে?' আমি বললাম।

লোকটা শব্দ করল, 'হুম্!'

মোটা ঠোঁট দুটো চেপে বসল ওর। তার পরে সেই রক্তাভ চোখ দুটি তুলে নিষ্পলক তাকাল আমার দিকে। লোকটার মুখটা যেন ফুলে উঠছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ধলেশ্বরীতে ঝড় উঠব-উঠব করছে, আকাশ কালো হয়ে উঠছে, বায়ুকোণে চিকুরহানা বাজের দূর গর্জন। ছোট নৌকো, আমি আর মা যাত্রী, গন্তব্য মামাবাড়ি, একমুখ দাড়িওয়ালা মাঝি পবন। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে বুকের কাছে। চোখে আতঙ্ক। ডাক দিল, 'পবন।'

পবন তখন হাঁক দিচ্ছিল, 'রও হে, আর দশ ঠেলা।'

সে ঝড়কে বলছিল, আর দশবার হাল ঠেললেই তীরে পৌঁছুবে। নৌকোটা অসম্ভব দুলছিল। বাতাসে নয়, পবনের হালের চাড়ে।

'গুরু গুরু গুরু!' মা বলছিল।

'কোন্ বিষয়ে, অ্যাঁ?' লোকটা গোঙানো স্বরে উচ্চারণ করল। ঘেয়ো রক্তাভ চোখগুলো অপলক।

একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে এল ধলেশ্বরীর তীর থেকে, আর গাছগুলো নুয়ে পড়ল। ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর আর্তনাদ ওটা।

'আর একটুখানি, আই দ্যাওয়া!' পবন চিৎকার করল আবার।

লোকটা ভ্যা-ভ্যা করে হেসে ফেলল।

পবন ঝপাং করে লাফ দিল জলে। চিৎকার করল, 'ডরাইয়েন না মা, বুক জলে।' নৌকোর কাছি পবনের হাতে!

লোকটা বলল, 'আমরা যেমন জিগ্যেস করি, আপনারা সবাই সেরকমই জবাব দেন। সত্যি বলছি, আমি টায়ার্ড, টায়ার্ড। কোন মানে হয় না, রোজ রোজ সেই একই কথা। জানা কথাই তো বাপু, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না। নিন, সিগারেট খান।...কোন জীবনেই সুখ নেই মশাই। বিপ্লব করেই বা কী সোনার রাজত্ব তৈরি করবেন আপনারা! ইংরেজ আমলে আমরাও অনেক কিছু ভেবেছিলাম। বসুন, আসছি।' কোটটা তুলে নিয়ে ফাইলটা হাতে করে লোকটা চলে গেল। দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

একটা দুর্যোগ গেল। হয়তো আর-একটা দুর্যোগ আসবে, তার পরে আর-একটা, তার পরে...। জীবনব্যাপী দুর্যোগ। তাকে রোধ করা যায় না। যে-বিশ্বে বাস, সেই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দুর্যোগের নানান কার্যকারণ ইন্ধন, এবং আমি কেন দুর্যোগের মাঝখানে, এর একমাত্র কারণ, আমি যে-কারণে ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলাম, আরও কৈশোরে চোদ্দ বছর বয়স হবে তখন, বিধবা বীণাদির গোপন চিঠি অমরদাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেই বিষণ্ণ যুবতী বীণাদি পাড়ার ক্লাবের নেতা লাইব্রেরিস্রষ্টা অমরদাকে ভালোবাসতেন, এবং দু-জনের দেখা-সাক্ষাৎ বারণ হয়ে গিয়েছিল, বীণাদির অভিভাবকেরা বীণাদিকে বেরুতে দিতেন না, পাড়ার সব বয়স্ক মানুষেরাই যেন এই দু-জনের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, একটা ফ্রন্ট তৈরি করেছিল, পাহারা দেওয়া, গোয়েন্দাগিরি করা, নোংরা ও কুৎসিত কথা বলা, আর স্বভাবতই আমাদের অভিভাবকেরাও ক্লাবে যেতে নিষেধ করেছিল, অমরদার সংস্রব বিষবৎ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেটা অন্যায় মনে করেছিলাম, এবং ওই বয়সে হৃদয়ের সকল আবেগ ও সমর্থন অমরদা ও বীণাদির পক্ষে ছিল। আমি বীণাদির চিঠি অমরদাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং অমরদার চিঠি বীণাদিকে, আর সেই পৌঁছে দিতে গিয়েই ধরা পড়েছিলাম, যদিচ বামাল নয়, তার পরেই আমি রক্তাক্ত, দাদার একটি ঘুষিতেই কষের দাঁত নড়ে গিয়েছিল, বাবার ছড়ির দাগ আমার শরীরটাকে চিতাবাঘ করে তুলেছিল, আর মায়ের ক্রুদ্ধ প্রশ্ন, 'এখনো বল্, অমরের চিঠি

বীণাকে…?'

'না।'

'উঃ ভগবান, এই ছেলেটাকে কেন আঁতুড়েই মুখে নুন পুরে দিইনি।' দুঃসহ রাগে ও ঘৃণায় মা চিৎকার করে উঠেছিল।

আর আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'হে ভগবান, বীণাদি আর অমরদা যেন ধরা না পড়ে।' এবং তখনো সেই একই দুর্যোগ…

রজাটা আবার খুলে গেল। অন্য একজন ঢুকল। সেই ফাইল হাতে। ধুতি পরা, টের ওপরে কোট। চেয়ারে এসে বসল। পকেট থেকে কতগুলো কাগজ বের রে দেখল। একবার আমাকে তাকিয়ে দেখে বলল, 'আমি যা পড়ে যাচ্ছি, সেগুলো নাগে শুনে যান, কোথাও না মিললে আমাকে বলবেন। …সালে পার্টিতে য়েন, সময়ে লোকাল কমিটিতে উত্তীর্ণ, সন্দেশখালির কৃষক সম্মেলনে যোগদান, টিয়াবুরুজে …তারিখে উত্তেজক বক্তৃতাদান, গান ফ্যাক্টরিতে গুপ্ত সমিতি ড়ে তোলা, রেলওয়ে ছাব্বিশ নম্বর গেটের ওপারে পার্টির আর্মস সরিয়ে নিয়ে ওয়া…'

লোকটা একটা কথাও মিথ্যে বলছিল না, তারিখ বা সময়, একটাও ভুল বলছিল। যেন আমারই কোন সহকর্মী, সর্বক্ষণের সঙ্গী, কতগুলো গোপন ও প্রকাশ্য ঘটনা ল চলেছে। বলে চলেছে, 'অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল। তারিখে, এবং …তারিখে, ও …তারিখে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তারিখে গণপৎ সিং-এর কাছ থেকে এক ব্যাগ ক্র্যাকার নিয়ে সাত নম্বর সেলকে য়েছেন (আশ্চর্য! আশ্চর্য! লোকটা হয়তো এর পরে বলবে রেবার সঙ্গে আমার ব ঝগড়া হয়েছে, নীরার সঙ্গে আমি কোথায় কখন দেখা করেছিলাম), প্রাদেশিক মটির আরতি দত্তকে নিয়ে …তারিখে রাত্রে ফিটনে করে পার্কসার্কাস থেকে লগঞ্জ স্টেশন (অসম্ভব! এই বিষম সত্যি শুনে নিজেকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে ছে), এবং সেখান থেকে…ইত্যাদি।'

লোকটা সত্যি ঘটনা বলে যেতে লাগল, আর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ তুলে মাকে দেখতে লাগল। আমি সেই যে ভাবলেশহীন মুখে তার দিকে তাকিয়ে াম, কথাগুলো শুনতে শুনতে আর আমার কোন ভাবের সঞ্চার হল না। য়কে যথাসম্ভব রোধ করে আমি ধরেই নিলাম, আমার মুখের সামনে একটা না ধরা হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে, দেখুন আপনার ঠোঁটের ওপর ডান দিকে একটা ়, বাঁ কানের পাশে ছোট একটি কাটা দাগ, নাকটা…চোখ দুটো…ইত্যাদি। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, না, না না। ওটা আমি নয়, ওটা আমার র ছায়া নয়। না না না…

'তাহলে সবই মিলছে, সবই সত্যি?'

'কিসের?'

'এই আমি যা যা বললাম? আপনি যখন কিছুই বললেন না, তখন সবই মিলে গেছে নিশ্চয়।'

আমি বললাম, 'এসব আমি কিছুই জানি না।'

'লায়ার!' একটা আচমকা গর্জনের সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত পড়ল। মনে হল, গত শতকের পুরনো ঠাণ্ডা ঘরটা কেঁপে উঠল। একটা জলন্ত মুখ, ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্ত। চোয়ালের হাড় কঠিন।

আমি অনেকটা অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। একটাই মাত্র মন্ত্র জপ করতে লাগলাম, না না না, না না না, না না না। এবং লর্ড সিন্‌হা রোডের এই ঘরে আমি ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেলাম।

ভীষণ স্তব্ধ মনে হল কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই লোকটির নিচু স্বর শোনা গেল। নিচু কিন্তু অনেক বেশি হিংস্র। জলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল সে, 'বাট আই উইল নট স্পেয়ার ইউ। আই উইল রীড এগেন, হিয়ার অ্যাটেন্টিভ লি অ্যাণ্ড দেন আনসার।'

লোকটা আবার সেই কাগজ পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এবার আমি আর শুনছিলাম না। ওর পড়ার চেয়ে দ্রুত এলোমেলো বহু ঘটনা ও গলার স্বর আমাকে ঘিরে ধরল। অ্যাকশন কমিটি; মিহির: 'এই দেখুন কমরেড রেবার চিঠি, তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। ধ্রুব কী ভাবে, আপনার কাছে কখন এল, কী বলল, আপনি কী বললেন, কী করলেন। আপনি এখনো স্বীকার করুন।'...রেবা: 'এই যে সেই চিরকুট, নাম না থাকলেও নীরার হাতের লেখা আমি চিনি। মিথ্যুক। এখনো বল, তাহলে তুমি ওর সঙ্গে বাসুলি বিলের ধারে দেখা করেছিলে?' ছেলেবেলা: বাবা: 'সত্যি কথা বল্ ইস্কুল পালিয়ে নৌকা বাইতে গেছিলি?' কৈশোর, সমিতির বন্ধুরা: 'বল্ অলকাকে কি তুই সমিতির কথা বলেছিস?' '...অ্যাণ্ড দেন আনসার।'

'আনসার, আই স্পে আনসার।' আবার একটা ঘর-কাঁপানো ক্রুদ্ধ গর্জন এবং টেবিলের ওপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।

আমি আমার সামনে দেখলাম, একটা রক্তাভ অঙ্গার মুখ, চিতার ক্রুদ্ধ চোখ। এবং আমি দেখলাম, ঘর কাঁপছে। ভেজা বিছানা থেকে আমি ঘুমন্ত লাফ দিয়ে উঠলাম। দশ বছরের আমি, জলে ভেসে যাওয়া মেঝেয়, অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বাবার চিৎকার শুনলাম, 'ঘরের বাইরে চল ফেলু (আমার মায়ের নাম), ছেলেদের নিয়ে ঘরের বাইরে চল, পশ্চিমের চাল উড়ে গেছে।'...আমার বুকের মধ্যে ভীষণ কাঁপছিল। ঝড়ের গর্জন আর তার দাপটে টিনের চাল যেন ভয়ে ককিয়ে কাঁদছিল। বিদ্যুৎঝলকে চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মায়ের আঁচল ধরে আমি খোলা দরজা দিয়ে নতুন পাকা ঘরের দিকে চললাম। মস্ত বড় উঠোনটা বাতাসে বৃষ্টিতে বিজলী-হানাহানিতে তোলপাড় হচ্ছিল। মায়ের একটা হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল। সেইদিকে চোখ রেখে আমার সামনে আমি অঙ্গার-মুখ আর চিতা-চোখ ভেসে উঠতে

দেখলাম। তার গর্জনের জবাবে, আমি ভিজতে ভিজতে নতুন পাকা ঘরের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'জানি না। আমি এসবের কিছুই জানি না।'

আমার মুখে থুতু ছিটকে লাগল, আর কানের কাছে গর্জন শোনা গেল, 'কী করে জানতে হয়, আমি শিখিয়ে দেব। আই উইল টীচ ইউ, ইউ লায়ার, কাওয়ার্ড। একটা সত্যি কথা যে বলতে পারে না, সে করবে বিপ্লব! কাপুরুষ দখল করবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা! থু থু...'

সম্ভবত লোকটা পান খায়, আর সুগন্ধি জর্দা, কারণ ছিটকানো থুতুতেই তা অনুমেয়। আমার গা-টা ঘুলিয়ে উঠল। তবু হাত-পা শক্ত করে, ঝড়ের দাপটের মধ্য দিয়ে কাঁচা উঠোনের কাদা মাড়িয়ে, মায়ের হাতের স্পর্শে, নতুন পাকা ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার সামনের চেয়ারটা শূন্য। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভিতরটাও শূন্য বোধ হল। অবসাদের নিঝুমতায় যেন ডুবে গেলাম। কিন্তু শীতবোধ আর একটুও ছিল না। এবং হঠাৎ আমার হাসি পেতে লাগল গর্জিত গালাগালগুলোর কথা মনে করে, লায়ার, কাওয়ার্ড! তবু লোকটা আশ্চর্যরকমভাবেই, সন্দেহজনক বিস্ময়করভাবেই আমার পার্টি-জীবনের গোপন খবর-গুলো জেনেছে যা দিয়ে ভিতরের সত্যটাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল। ভিতরের সত্য যা আপেক্ষিক অথচ ধ্রুব, যা কোন নিয়মাধীন নয় অথচ একটা সুকঠিন নিয়মের প্রেমে আবদ্ধ, যা অথৈ, ছোঁয়া যায় না।

কতক্ষণ একলা বসেছিলাম জানি না। আমার ভিতরে ভিতরে একটা প্রতীক্ষা ছিল সেই লোকটা আবার আসবে।

দরজাটা খুলে গেল। আবার—। না, একজন য়ুনিফর্ম-পরা লোক। আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

উঠে আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম। যে-পথে এসেছিলাম সেই পথেই সেই সিঁড়ি দিয়েই আবার চললাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্য দিকে গেল লোকটা। পুরনো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আবার একটা সুন্দর সাজানো বাগানে এসে পড়লাম। রঙিন ফুল সবুজ ঘাস খোলা আকাশ শীতের রোদ সব মিলিয়ে আমার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি টনটনিয়ে উঠল। জল এসে পড়ল।

বাঁ দিকের উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে আমি লোকটিকে অনুসরণ করছিলাম। সব দিকেই পাঁচিল, পাঁচিলের ওপরে কাঁটাতারের ফেন্সিং, তাতে লতা জড়ানো। সবুজ ঘন লতায় কাঁটাতার ঢাকা। সত্যি, শিল্পীদের দোষ নেই, যারা কাঁটাতারকে বইয়ের মলাটে ফুলের মতো আঁকে। ওতে বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত থাকলে লতাগুলো বোধহয় মরে যেত।...কিন্তু রোদটা কী নিবিড় সুখের মতো গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতরে ঢুকছে। চাদরটা আলগা করে দিলাম, বুকে যদি একটু রোদ লাগে। আর এই সবুজ, এই ফুল, হোক পাঁচিলে ঘেরা (পাঁচিল কোথায় নেই? একমাত্র সেই অথৈ সত্য ছাড়া, যে আমার অস্তিত্ব, যার নিষেধের কোন সীমা নেই, অথচ সীমাহীন

স্বাধীন), তবু তাদের চরিত্র বদলায়নি। তারা যা, তাই আছে।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও দাঁড়ালাম। বাগানটা শেষ, পাঁচিলটা কাছেই। দেখলাম, বাঁ দিকের পাঁচিলের পাশ দিয়ে দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠে একটা গলি চলে গিয়েছে। বাইরে থেকে সহসা কিছুই বোঝা যায় না। সরু গলি, অন্ধকার, কিন্তু মাথা-ঢাকা ছাদে আলো জ্বলছে। দুটো ধাপের ওপরেই গলির মুখে লোহার গরাদের দরজা। দরজায় একজন বন্দুকধারী সান্ত্রী। আমার সঙ্গের লোকটির নির্দেশে সান্ত্রী লোহার গরাদ খুলে দিল। লোকটি আমাকে ভিতরে অনুসরণ করতে বলল। আমি ঢুকে অনুসরণ করলাম। এইমাত্র দিন অন্তর্হিত, আমি যেন রাত্রির বুকে প্রবেশ করলাম।

বাঁ দিকে দেয়াল, মাথাটা ছাদ-আঁটা, ডান দিকে লোহার গরাদ দেওয়া পর-পর কয়েকটা খাঁচার মতো ঘর। একেবারে শেষ ঘরটার কাছে গিয়ে আমার সঙ্গের লোকটি দাঁড়াল। সান্ত্রী আমাকে ডিঙিয়ে খাঁচার গরাদের তালা খুলল।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি আমার দিকে একবার তাকাল আর গলিটার শেষ দেয়ালের গায়ে জলভরা চৌবাচ্চা দেখিয়ে বলল, 'এখানে চান করে নিতে হবে। সেলের মধ্যে খাবার দিয়ে যাবে। একটা সিগারেট যদি ইচ্ছে হয়—'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল সে। সেলে ঢোকবার আগেই ধূমপান করে নিতে হবে। বুঝলাম, এগুলো এস বি সেল। সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে, আমি পিছন ফিরে গলির বাগানের দিকে তাকালাম। এখনো সবুজ, এখনো সিগারেটের নিবিড় নেশা। ভেবেছিলাম, লালবাজারের লক-আপ থেকে এস বি সেল ভালো হবে। ভালো হবে! কোথায় গেল সেই পাগলটা, সেই উদ্ধত ছেলেগুলো। ওরা এখানে আসবে না।

মনে হল, মুহূর্তেই সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সেলের গরাদ খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকলাম। সান্ত্রী তালা বন্ধ করে দিল। তার পর দু-জনেই চলে গেল। নৈঃশব্দ্য নেমে এল, গভীর নৈঃশব্দ্য।

সামনে দেওয়াল, পিছনে ডাইনে বাঁয়ে দেওয়াল। মাথার ওপরে একটি অকম্পিত স্থির আলো। লোহার খাট, একটা তোশক আর কম্বল। খাটের বাইরে ফুট-তিনেক ঠাণ্ডা মেঝে। চওড়ায় ফুট-তিনেক, লম্বায় আট কি দশ।

আমি খাটের ওপর বসলাম। কোন শব্দ হল না। ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম কাত হয়ে। কোন শব্দ হল না। হলদে আলোয় তাকিয়ে থাকতে পারছি নে। চোখ বুজলাম। নৈঃশব্দ্য, গভীর গাঢ় নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকার।

এ সবই আমার চেনা, আমার জানা, এই দুয়ারবন্ধ বন্দিত্ব, এই একাকিত্ব, এই নৈঃশব্দ্য, এই অন্ধকার। একমাত্র তফাত, এটা এস বি সেল। এসব ঘোচাবার জন্যেই কি একদা ইস্কুল পালাইনি? ছেলেবেলায় এই বন্দিত্ব এই একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যেই কি দুঃসাহসী অবোধ মন নিয়ে ছোট ডিঙিতে করে বর্ষার দুরন্ত নদীর বুকে ভেসে

যাইনি? তার পরে সমিতিতে অলকাদের সঙ্গে মিশতে যাইনি? তার পরে রেবাকে বিয়ে করিনি? তার পরে বিপ্লবী পার্টিতে আসিনি? তার পরে নীরার কাছে ছুটে যাইনি? সারাজীবন ধরে এই বোধই কি রূপান্তরের পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না?

আরো কি ছুটিয়ে নিয়ে যাবে না? এই বোধই কি সমষ্টির সঙ্গে জীবনকে ভাগ করে ভোগ করার বাসনাকে বাধ্য করেনি? যারা কোথাও ঠেকে গিয়েছে তাদের বোধ একটা কোথাও নিঃশেষে মুছেছে। আর মিথ্যুকেরা উত্তরণের কথা বলে, কারণ একাকিত্ব কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না, বন্দিত্ব কখনো নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

এই এস বি সেলের থেকে সেই একাকিত্ব কি আরো ভীষণ নয়? আরো ভয়ংকর নিষ্ঠুর মর্মান্তিক নয়? এবং আরো সুন্দর ও মধুর? জ্ঞান মুক্তি ও মৈত্রীর নতুন নতুন চাবিকাঠির সন্ধান যে দিয়েছে। এই তো আমার জপ, আমার আহ্নিকের আচমন।

লোহার গরাদ ঝনঝনিয়ে উঠল। আমি তাকালাম। সান্ত্রী। সে আমাকে নাইতে বলল। তালা খুলে দিল। স্নান করার দরকার ছিল কিন্তু কোন সরঞ্জামই ছিল না। অথচ নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখন শুকিয়ে ড্যালা পাকিয়ে রয়েছে। স্নান না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া গলির বাইরে সবুজ লন আর ফুলের বাগান দেখতে পাব স্নান করতে গেলে। তাই অগত্যা নগ্ন হয়ে চৌবাচ্চার কাছে গেলাম। জল তোলবার কোন পাত্র ছিল না। সান্ত্রী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আর খইনি বানাতে লাগল। আমি সেইদিকেই মুখ করে আঁজলা আঁজলা জল তুলে গায়ে মাথায় ঢালতে লাগলাম। নইলে বাইরেটা, দিনটা দেখা যেত না। দৈহিক প্রশান্তি আমার দেহে সংগীত করতে লাগল যেন।

আবার গরাদ বন্ধ। গা শুকোবার আগেই জামাকাপড় পরে নিলাম। তার পরে একটা লোক এসে গরাদের নিচের কয়েক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে খাবার দিয়ে গেল। মাছ ভাত দই। বোধহয় কাছেই কোন হোটেলের সঙ্গে অফিসের ব্যবস্থা আছে। এখানে যে-ক'জন বন্দী থাকতে পারে তাদের জন্যে নিশ্চয়ই কোন রান্নাঘরের ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল এই গাঢ় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কী-একটা শব্দের প্রতীক্ষা যেন আমার ভিতরে মাথা কুটছে। কী সেটা? গরাদের তালা খোলার শব্দ? আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাকতে আসবে, তাই?

না। কেউ আর এদিকে অনেকক্ষণ এল না। আমি উঠে পায়চারি করতে যেতেই থমকে গেলাম। বাজছে, সেই শব্দটা বাজছে! যার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি সেই ঝিঁঝি ডাকছে। মানুষ যাই বলুক নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে বিশ্ব-নিস্তরঙ্গতার একটা সম্পর্ক সে খোঁজে।

পরদিন আমাকে সেই বাড়িতে দোতলার সেই ঘরটায় ডেকে নিয়ে গেল। সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত দফায় দফায় চারজন জিজ্ঞাসাবাদ করল। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দু-জন।

তার পরের দিন একই নিয়মে আটজন।

তারও পরের দিন, সারাদিন কেউ আমাকে ডাকতে এল না। অবাক হলাম, ছুটিও অনুভব করলাম। সন্ধ্যা সাতটাতেই রাত্রের খাবার দিয়ে দেয়। আমি তারই প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু গরাদের তালা খুলতে দেখে অবাক হলাম। কারণ খাবার তলা দিয়েই দেয়। তালা খোলার পর দেখলাম একজন য়ুনিফর্ম-পরা অফিসার, কোমরবন্ধে রিভলভার। বাইরে থেকে তর্জনী নেড়ে আমাকে মোটা গলায় ডাকল, 'আসুন।'

আমি চাদরটা জড়িয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। গলির বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার নেমেছে। বাগানে কোন আলো নেই। সবুজ লন বা ফুল বা কেয়ারি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। সেই পুরনো দোতলা বাড়িটাকে অন্ধকারই মনে হল। রোজকার দেখা বাড়িটা এখন যেন স্তব্ধ দৈত্যপুরীর মতো মনে হল।

দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটায় স্তিমিত আলো দেখতে পেলাম। অফিসারকে অনুসরণ করে আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। সিঁড়িতেও তেমনি স্তিমিত আলো, নিজের ছায়াতেই অন্ধকার লাগে। ওপরের আলোও সেইরকম। এবং সেই একই ঘরের মধ্যে আমাকে ঢুকতে বলা হল। রাত্রে আমি কখনো এই ঘরে ঢুকিনি। দেখলাম এই ঘরের আলো একটু জোরালো। আমাকে বসতে বলা হল। বসলাম। অফিসার দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসাবাদ! নতুন পদ্ধতি। এই কথা আমার মনে হল। কিন্তু আমার শীত করছে না একটুও। আমি প্রস্তুত হবার জন্যে বসলাম।

দরজা খুলে গেল। দেখেই চিনতে পারলাম সেই লোক। একটা কম্বল তার হাতে আর কম্বলের মধ্যে একটা-কিছু, মোটা ডাণ্ডা হতে পারে, সবসুদ্ধই সে টেবিলের ওপর রাখল। ডান হাতে সেই ফাইল, রিপোর্টস। এ সেই লোক যাকে আমি প্রথম দিন একটা ঘর থেকে রেগে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, যে-ঘরের মধ্যে একজনকে হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

পরমুহূর্তেই লোকটা আমার চোখে হারিয়ে গেল। অনেক দৃশ্য ও স্বর আমার দৃষ্টি ও শ্রবণকে ঘিরে ধরল। এবং অ্যাকশন কমিটির শেষ আহ্বানের দৃশ্য ও ঘটনা আমাকে টেনে নিয়ে গেল। ওরা কখনো এক জায়গায় বারে বারে দেখা করে না। সেই অন্য জায়গা: কমিটির সকলের চোখেই দেখলাম নিষ্ঠুর ক্রুর বিদ্রূপের হাসি।

মিহিরের হাসিটা প্রকৃতই নায়কোচিত। চেহারাটিও। আমি যদি ওকে না চিনতাম তবে সেদিনের মূর্তি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতাম। একাধারে বিজয়ী যোদ্ধা ও দার্শনিকের মতো মনে হচ্ছিল ওকে। অথচ করুণা ও দয়া দেখাবার অঙ্গীকারও

রয়েছে যেন চোখের হাসিতে।

ওর হাতে একটা চিঠি ছিল। বলল, 'আজ আমি শুধু এই চিঠিটাই পড়ব, তার পরে আপনার যা বলবার থাকে বলবেন।'

আমার মনে হল চিঠিটা ধ্রুব লিখেছে, সে স্বীকারোক্তি করেছে আমার সাহায্যের কথা। দেখলাম সকলের চোখগুলোই বিদ্যুৎঝলকে আমাকে যেন তড়িতাহত করতে চাইছে। কিন্তু যদি ধ্রুব লিখেই থাকে—

মিহির বলল, 'পড়ছি।' বলে সে পড়তে আরম্ভ করল :

মাননীয়েষু—

মিহিরবাবু, একটু ভেবে আপনাকে সব সত্যিকথা জানাতে পারব কিনা বলেছিলাম। যদিও আপনাকে আমি আগে কখনো দেখিনি, শুনেছি মাত্র আপনার কথা। আপনাদের পার্টি সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা ছিল না। একমাত্র অনলের (আমার নাম) মুখেই যা শুনেছি। সে একজন বিশেষ কর্মী তাও জানি। আপনার সঙ্গে রেবাদিকে (আমার স্ত্রী) দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম, রেবাদি বোধহয় আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছেন।

যাই হোক আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি সত্যি অভিভূত হয়েছি। পার্টির প্রতি, তার বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাকে আপনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি অনল ভুল করেছে। সে আমাকে ভালোবাসে, তাই কখনো মিথ্যে কথা বলে না। ধ্রুবর মতো লোককে ক্ষমা করা যায় না। পার্টির, বিপ্লবের এবং অনলের মঙ্গলের জন্যই আপনাকে আমি তাই জানাচ্ছি অনল সত্যি ধ্রুবকে আশ্রয় দিয়েছে। আমাকে অনল নিজেই সেকথা বলেছে। আমার সঙ্গে তার সব কথাই হয়। আমি সঠিক স্মরণ করতে পারছি না কার আশ্রয়ে ধ্রুবকে ও পাঠিয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদে কোন বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছে এই পর্যন্ত মনে আছে। অনল ধ্রুবকে অনেকগুলো টাকাও দিয়েছে। এবং একদিন পার্টির এই সন্ত্রাসবাদী নীতির পরিবর্তন হবে অনল এই বিশ্বাসেই ধ্রুবকে আবার ফিরিয়ে আনবে বলেছে।

আপনার কথায় আমার সম্যক উপলব্ধি হয়েছে অনলকে আমার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি—

নীরা

নীরা, নীরা লিখেছে। চিঠিটা আমার হাতে নেবার দরকার ছিল না। ওই কাগজ এবং হাতের লেখা আমার রক্তের সঙ্গে পরিচিত।

চিঠিটা পড়ার পর অ্যাকশন কমিটি নিষ্পলক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। মিহির একটু হেসে বলল, 'বলুন।'

আমি বললাম, 'আমি এসবের কিছুই জানি না।'

বোধহয় বজ্রপাত হলেও ওরা এত চমকাত না। মিহির বলে উঠল, 'আপনি নীরাকেও অস্বীকার করছেন? সে আপনার—'

আমি চুপ করে রইলাম। আর আমার প্রেমে আতুরে হয়ে ওঠা সেই মুখখানি মনে পড়ল।

মিহির গর্জে উঠল, 'আপনি নীরাকে এসব বলেননি ?'

'না।'

'তাহলে নীরাও মিথ্যে বলছে ?'

'তাই দেখছি।'

মিহিরের 'লায়ার' চিৎকারটা আমার কানে বেজে ওঠবার আগেই টেবিলের ওপর কম্বলটা নড়ে উঠল, ভিতরের ডাণ্ডাসহ সেটা একটা মোটা থাবায় উঠল এবং মোটা গোঙানো স্বরের কী-একটা কথার সঙ্গে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কী শুনতে পেলাম বুঝলাম না, খালি বললাম, 'আমি জানি না।'

তারপর…

আবার জল বাড়তে লাগল। বেত্‌নি নদীতে জল আবার বাড়তে লাগল। কালো হল। ফুলতে লাগল। কিন্তু শব্দ নেই। ঢেউগুলি ফণার মতো বড় হতে লাগল। উঁচু হতে লাগল। কিন্তু কোন শব্দ নেই। চুপি চুপি আবার সে এল সমুদ্র থেকে, নদীর তলে তলে। চোরা 'ঝুটো'র মতো এল সমুদ্রের জল নিয়ে। আর ফুলতে লাগল। উঁচু হতে হতে বাঁধ ছাড়িয়ে গেল। ছাড়াতে ছাড়াতে আকাশের সমান উঁচু হল। আকাশে ফটফটে তারা ছিল। ঢেকে গেল, লেপটে গেল। আর জলের তলা থেকে সেই জলস্তম্ভের ঝুটো এবার প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু কোন শব্দ নেই।

বদ্দি সরতে লাগল। এই! এই আবার আসছে। বদ্দি গা ঘষটে ঘষটে বড় নখ দিয়ে মাটি খামচে সরতে লাগল। এই! অপ্‌ঘেতেটা আবার আসছে। আবার সোহাগ করে বলত, 'অ সোনা, তোর নাম রেখেছি বদরীনারায়োন।' বদ্দি সরতে লাগল। কুঁকড়ে বেঁকে ছোট হয়ে একটা দেয়াল খুঁজতে লাগল। একটা কোণ। আর গায়ের মধ্যে চটচট করতে লাগল ওরই বিষ্ঠা আর মূত্র।

কিন্তু আকাশ-সমান সেই কালো জল সাপের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল। আর জলস্তম্ভের ঘূর্ণিপাকে পড়ে মাছগুলি ছিটকে যাচ্ছে। রাক্ষুসে কামটগুলি ওলটপালট খাচ্ছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। আর এগিয়ে আসতে লাগল। বাঁধ ডিঙিয়ে নেমে একেবারে বদ্দির সামনে এসে দাঁড়াল। জল দু-ভাগ হয়ে গেল। আর জলস্তম্ভটা আবার সেই মূর্তি ধরল।

সেই কুলোর মতো বড় বড় কান। সাদা মুলোর মতো দাঁত। পাঁশুটে ধোঁয়া-ভরা প্রকাণ্ড মুখ আর ঝুলে-পড়া চোখ। ঝুলে-পড়া চোখ দুটো চোয়ালের ওপর নেমে এসেছে, আর সেখানেই অঙ্গারের মতো তারা দুটো জ্বলছে, নড়ছে। সে ফিসফিস করে ডাকল, বদ্দি।

বদ্দি চিৎকার করে উঠল, আমি যাব না।

সে বলল তেমনি, চেঁচাস না বদ্দি। তোর সময় হয়ে গেছে।

বদ্দি মুখ ঢেকে বলল, না, আমি তোর সঙ্গে যাব না। তুই দানো!

আমি তোর বাপ নেতাই।

এখন তুই দানো। তুই অপঘাতে মরেছিস, তুই ঝুটোতে গা ঢেকে এইছিস, তুই দানো।

হায়, আমি দানো, কিন্তুন্‌ তোর বাপ। তোকে নিতে এইছি।

বদ্দি দু-হাত দিয়ে বুক ঢেকে চিৎকার করে উঠল, আমি যাব না।

যাবি। তোর সময় হয়েছে।

আমি যাব না।

আমি একলা আছি বদি। আমার আর কেউ নেই।

আই শালা, তুই দানো। আমি যাব না।

গাল দিস না বদি।

হেই শোরের বাচ্চা, তোকে গুনীনে খাক।

ও-নামটা করিস না বদি।

আ-ই গু-নী—ন হে··· !

জল সরতে লাগল। মূর্তিটা জলের ঘূর্ণিস্তরে ঢুকতে লাগল। বদির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ নিশ্বাস পড়তে লাগল জোরে জোরে। সে আরো জোরে জোরে চিৎকার করে উঠল, আ-ই গুনী-ন, বাউল—হে !···

জল সরতে লাগল আর নিচু হতে লাগল আর ঝুটোর জলস্তম্ভে দানোটা আস্তে আস্তে ঢুকতে লাগল। বদি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, আই দানোরো শমনো হে গুনীন— ! আই ছাখসে, আই তেরো বছরের বদিকে শালা নে যেতে এয়েছে।

জল বাঁধের ওপর সরে গেল। নিচু হতে লাগল আর আকাশটা দেখা গেল। তারা দেখা গেল। কিন্তু চুপিচুপি স্বর ভেসে এল আবার, কিন্তুন্ তোকে যেতে হবে বদি।

আই মা বনবিবি গ—, আই ছাখসে, আমার বাপ বিষ্ঠাখেগো দানোটা আমাকে নে যেতে চায় গ···। হে খোকাঠাকুর গ, আই ছাখসে, আমি জোয়ান হই নাই, মাছ মারতে যাই নাই, আয় ঢ্যামনার বাচ্চা দানোটা আমাকে নে যেতে চায় গ—।

জল সরে গেল বাঁধের ওপারে, নদীর ওপরে। আর নিচু হয়ে গেল, নদীর সঙ্গে মিশে গেল। ঝুটো তলিয়ে গেল। ভাঁটা-পড়া বেত্‌নি ছলছল করতে লাগল। যেন এতক্ষণ কে মন্ত্র দিয়ে বেত্‌নিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আবার গেমো-বন দুলতে লাগল বাঁধের ওপরে। তারাগুলি হাসতে লাগল মিটিমিটি। পশ্চিমের অনেক দূরের আকাশে ঝাপসা একফালি চাঁদ টিমটিম করতে লাগল।

আর বদি এখনো হাঁপাচ্ছে। কাঁপছে থরথর করে। চোখ মেলে আছে ও। ও দেখতে পাচ্ছে এখন বাঁশের আড়াগুলি। অন্ধকারেই দেখতে পাচ্ছে, বাঁশের আড়ার ওপরে গোলপাতার চালা। মনে পড়ছে, এটা ধানের গুদাম-ঘর। ধানের শূন্য গুদাম-ঘর। এটা গঞ্জ।

আবার যেন কে এল নিচু হয়ে। এসে ওর নিম্নাঙ্গগুলি চাটতে লাগল। অ! কুকুরটা এসেছে। নোংরা চাটছে। গরম জিভ দিয়ে চাটছে। ভালো লাগছে বদির। যেন বাছুরকে গাই চাটছে। কিন্তু ও আর চোখ বুজবে না। চোখ বুজলেই সে আসে। সেই দানোটা। টের না পেলেই, ঘুমিয়ে পড়লেই টপ করে তুলে নিয়ে যাবে। আর একবার তুললেই শেষ। ছুঁলেই গেল। ওকে জেগে থাকতে হবে। খারাপ খারাপ গালাগাল দিতে হবে। গুনীন বাউলের নাম নিতে হবে। খোকাঠাকুর

বনবিবিকে ডাকতে হবে। আর তখনই পালাবে।

আর বাপ যখন অপঘাতে মরে দানো হয়, তখন সে কাউকে খাতির করে না। ছেলেকেও না। কিন্তু বদি এখনো কত ছোট। এখনো জোয়ান হয়নি। মাছ মারতে যায়নি। আর এখনি তাকে নিয়ে যেতে চায়।

কান্না ঠেলে উঠল। তার সঙ্গেই আবার সেই তেতো জলে ভরে উঠল মুখটা। আর মুখের মধ্যে কিলবিল করে উঠল সেই জিনিস। কিরমি, কিরমি। থু থু করে উঠল বদি। যেন বানমাছের মতো লাফাতে লাফাতে মুখ থেকে ছিটকে গেল গলার কাছে। তার পরে মাটিতে।

আবার কিসের শব্দ?

বাতাস। বৈশাখের বাতাস। সমুদ্র থেকে আসছে। আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। গোলপাতার ছাউনিতে শনশন শব্দ তুলছে। আর খোলা দরজা দিয়ে খালি গুদাম-ঘরে এসে ঢুকছে। গায়ে বেশ করে বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইছে। কিন্তু বদি আর ঘুমোবে না।

আবার কিসের শব্দ?

অ! পুবের চালাগুলিতে কালীদিদিরা হাসছে। খাঁদুদিদি আর টেপীমাসীরা হাসছে। এখন গঞ্জ মরা। ধান মন্দা। পাট নেই। গঞ্জ এখন গা মুড়ে শ্মশানের মতো মহাশ্মশান। তবু বুঝি কেউ এসেছে। বাজার মন্দা হলেও যে-মহাজনদের অনেক টাকা থাকে, সেইরকম কেউ। আদিবাসীদের কাছ থেকে পচুই এনেছে, তাড়ি এনেছে। তাই খেয়ে হাসছে। আর ওই তো, হারমনিয়া বাজছে। বোধহয় খাঁদুদিদি গান করছে, মাতা খাও, যেয়ো না। আর কালীদিদিরা পচুই খেলে কী-রকম খেপে যায়। গায়ে জামা-কাপড় রাখে না। খালি হাসে। এখন সেইরকম হাসছে।

তবে কি রাত বেশি হয়নি!

কিন্তু চোখের পাতা বুজে আসছে কেন? শালা আমাকে মন্ত্র দিচ্ছে। আই গুনীন হে—! কিন্তু বাঁশের আড়াগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। আর মুখের মধ্যে আবার কিলবিল করছে। কিন্তু ফেলতে পারছে না। কেবলি যেন তলিয়ে যাচ্ছে। টানছে নাকি কেউ? কে? কে? আই খোকাঠাকুর হে—।

এই সব ঠিক হয়ে গেছে। এই তো সব দেখা যাচ্ছে। এখন দিনের বেলা। সকালবেলা। এই তো নদী। বেতনি নদী, কেমন কলকলাচ্ছে, ছলছলাচ্ছে। আর চলেছে ভাঁটার টানে। আকাশটা ফর্সা। কোথাও মেঘ নেই। বাতাসে গেমো-বন দুলছে, নুইছে। আর বদি বসে আছে বাঁধের ওপরে। ও দেখছে, জল নতুন। নদী দক্ষিণে ছুটেছে।

ওর নাকে গন্ধ লাগছে। সেই গন্ধ। পাকা ওড়চাকা ফল আর গেমো ফলের। ওর নাকে গন্ধ লাগছে পাকা কেওড়া ফলের। আর চোখ দুটো কামটের মতো তীক্ষ্ণ এবং অপলক হয়ে উঠছে। মুঠি পাকিয়ে যাচ্ছে। জলে যেন কী দেখতে পাচ্ছে ও। আর বিড়বিড় করছে, এসেছে! এসে পড়েছে। আরো আসছে। এইবার। এই

সময়! ওই তো সেই চোখ। লাল হীরার মতো চোখ, আর রুপোর মতো শরীর।

আর বদির কানে বাজছে সেই শব্দগুলি, এই সেই খোকাঠাকুরের আশীর্বাদ। দূর সমুদ্র, অনেক দূর আর সেই পাতাল থেকে ওরা এসেছে খোকাঠাকুরের হুকুমে। লড়ে নিতে হবে।

বদি উঠে দাঁড়াল। ও উলঙ্গ, কিন্তু ঘা-পাঁচড়াগুলি নেই। শরীরটা তাজা লাগছে। বমি আসছে না, মুখে কিছু কিলবিলিয়ে উঠছে না। বদি তাকাল চারদিকে। সাবধানী সতর্ক চোখে চারদিকে দেখল। না, কেউ নেই।

কেউ নেই আশেপাশে। আর বাঁধের নিচেই গেমো-বনের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে নৌকাটা। তীরের মতো নৌকা, ছই নেই। পাটাতনের ওপর জড়ো করা রয়েছে জোড়া-লাগানো বিন্ জাল। বৈঠা রয়েছে গলুয়ের কাছে।

কেউ নেই আশেপাশে। আর ওরা আসছে। লাল লাল হীরার মতো চোখ আর রুপোর মতো শরীর, বিশাল এবং গম্ভীর। নির্ভয় আর শান্ত। পুচ্ছ দোলাচ্ছে জলে। লড়বার জন্যে ডাকছে।

বদি ঝাঁপিয়ে পড়ল গেমো-বনে। নৌকা খুলল তাড়াতাড়ি। বৈঠা তুলে চাড দিয়ে ভেসে গেল নদীর জলে। ভেসে গেল দক্ষিণে, ভাঁটার টানে। জোরে জোরে বৈঠা টানতে লাগল। তীরের মতো ছুটল দক্ষিণে।

গন্ধ লাগছে নাকে। ওরা আসছে।—'দূর সমুদ্র থেকে খোকাঠাকুর ওদের পাঠিয়েছে। গন্ধে ওদের পাগল করে ছুটিয়ে দিয়েছে। বলেছে, যা, খেগে যা। লড়ে খেগে যা।'

ওরা আসছে। এখন ভাঁটা, সমুদ্রে যাচ্ছে। যাচ্ছে গন্ধ বয়ে নিয়ে। আর ওরা আসছে। উজান ঠেলে, নিঃশব্দে, দল বেঁধে, গায়ে গা দিয়ে আসছে। আর বদি যাচ্ছে, মুখোমুখি হতে।—'জীবনের সঙ্গে, আর মনের সঙ্গে এইরকম আমাদের সামনাসামনি দাঁড়াতে হয় বাবা বদি।'…

জোরে, আরো জোরে। কোথায় মুখোমুখি হবে? শাল্‌কির চরে? না। বৈচকের বনে? না। তবে? আরো নিচে, আরো। সাঁইমারা চরে। ওই দূরে, সাঁইমারা চরে। জোরে, আরো জোরে হে বদি। নৌকাওয়ালারা যদি পিছন তাড়া করে, যদি ধরে ফেলে, তবে আর হবে না। পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

এই সাঁইমারার চর। চর নয়, জঙ্গল। গোলপাতার বন আর গেমো, ওড়চাকা, কেওড়ার জঙ্গল। পাকা পাকা ফলে গাছ ভরতি। তলায় বিছানো। অন্ধকার, সাঁইমারার জঙ্গল গন্ধে আমোদিত। এইখানে, এই সেই জায়গা। জলের ধারেই অর্জুনের গোড়ায় নৌকা বাঁধল বদি। লাফিয়ে ডাঙায় নামল। পলিমাটির পিছল। পা হড়কে যায়।

চরে জল নেই। ভাঁটায় নেমে গেছে। জোয়ার আসবার আগেই লড়বার জায়গা গণ্ডি দিতে হবে। ওরা আসছে। যাত্রা করেছে দূর সমুদ্রের অন্ধকার পাতাল থেকে।

এখন উজান ঠেলছে। তার পরে জোয়ারে গা এলিয়ে দেবে।

অনেকগুলি বিন্‌জাল একসঙ্গে জোড়া। জুড়ে জুড়ে লম্বা করা হয়েছে। প্রায় দু-মন বোঝা টেনে টেনে নামাল বদি। পাটাতন তুলল। খোলের মধ্যে জোয়ান মানুষের বুক-সমান বাঁশ। তাড়াতাড়ি নামাল বদি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। দেখল সাঁইমারার অন্ধকার জঙ্গলাবৃত চরকে। তারপর গেমো ওড়চাকা আর কেওড়ার ঘন-সন্নিবিষ্ট অংশকে ঘিরে পায়ে হেঁটে, গোল্ করে একটা পাক খেয়ে এল। মাটিতে তাকিয়ে দেখল। পায়ের ছাপ পড়েছে পলিমাটিতে। এবার শাবল।

শাবল দিয়ে গর্ত করে বাঁশ পুঁতল। কয়েক হাত দূরে। একটা করে বাঁশ গোল করে ঘিরে পুঁতল। তারপর হঠাৎ চমকে ঘিরে তাকাল। জলে শব্দ নেই। সব স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভাঁটা শেষ হয়ে আসছে। সময় নেই, সময় নেই আর। তাড়াতাড়ি।

বিন্ জাল বাঁশের গায়ে গায়ে পেতে ফেলল। পেতে ঘিরল চারদিক গোল করে। দু-হাত দিয়ে নরম পলিমাটি নিয়ে জাল চাপা দিতে লাগল। সবটা জাল পলিমাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ওরা আসছে। গায়ে একবার একটু ইশারায় জালের সুতো ঠেকলেই সজাগ হয়ে যাবে। 'এসো না! আর এসো না! আমরা টের পেয়েছি, ওরা হেরে গেল। এসো না কেউ!' সংবাদ চলে যাবে দূর পাতালে।

মাটি-ঢাকা শেষ হবার আগেই প্রবল গর্জন কানে এল বদির। মাথা তুলে দেখল, বাসুকির মতো ফেনা মুখে নিয়ে আকাশের বুক ঘেঁষে বান আসছে। আর সময় নেই। কোনরকমে শেষ সীমা পর্যন্ত মাটি ঢেকে, ছুটে এসে নৌকায় উঠল বদি। দু-হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে অর্জুনের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা মোটা দড়ি আঁকড়ে ধরে রইল।

আর সেই মুহূর্তেই সহস্র ফণা এসে প্রচণ্ড গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। মনে হল, অর্জুনের মগডালে ঠেলে তুলল নৌকাসুদ্ধ। আবার আছড়ে নামাল। আবার তুলল, আবার নামাল। আবার, আবার···। তারপর একসময়ে স্থির হল। উলঙ্গ শরীরটা নিয়ে ও শুয়ে পড়েছিল। বান চলে যাবার পর, আরো খানিকক্ষণ ও চুপ করে পড়ে রইল। যখন নৌকাটা শান্ত হল, বদি আস্তে আস্তে মুখ তুলল।

ডুবে গেছে। সাঁইমারার চর ডুবে গেছে। আরো ডুবছে। জোয়ার এসেছে। আরো ডুবছে। আর বদির মুখে একটা হাসি ফুটছে। ও উঠে দাঁড়াল। উলঙ্গ, কালো, শনমুড়ি চুল আর দুধের এবং নতুনে মেশানো দাঁতের হাসি। কিন্তু অপলক চোখে তীক্ষ্ণ শিকারীর দৃষ্টি। জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। চুপিচুপি বলল, আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, লাল লাল হীরার মতো চোখ। আর রুপোর মতো শরীর। সুচতুর, উৎকর্ণ, মন্থরগতি আর গম্ভীর। —'সেও বাঁচবার জন্য আসে। আমিও বাঁচবার জন্যে আসি।'

হঠাৎ জল একবার চলকে উঠল। লোভ দেখাচ্ছে, পরীক্ষা করছে। কেউ আছ? শত্রু কেউ আছ? বদি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। এই ওদের লড়াই। এই লোভ দেখানো আর এই স্তব্ধতা, উৎকর্ণ মন্থরগতি, সুচতুর নড়াচড়া। 'কিন্তন্ আমি

মাছমারার ছেলে। তোর সঙ্গে আমার এই হারজিতের খেলা।'…কথাগুলি সব মনে পড়তে লাগল বদির। ও স্থির হয়ে রইল। আর তীক্ষ্ণ চোখে দেখল বাঁশের খুঁটিগুলি। আর বেশি দেরি নেই খুঁটিগুলি ডুবতে। তার আগেই কাজ শেষ করতে হবে।

নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে জলে নামল বদি। ওর নাভি পর্যন্ত ডুবে গেছে। আর তরতর করে জল বাড়ছে। একটু শব্দ না করে, আস্তে আস্তে খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু হল। নিচু হয়ে একেবারে নিঃশব্দে জাল টেনে তুলে খুঁটির ডগায় বাঁধল। আবার আর-একটা খুঁটির কাছে গিয়ে তুলল, জাল বাঁধল ডগায়। নিঃসাড়ে সমস্ত খুঁটির ঘেরাওটা ঘুরে ঘুরে জাল তুলে তুলে গণ্ডি বাঁধতে লাগল খুঁটির সঙ্গে।

যত সময় যেতে লাগল, ততই জল বাড়তে লাগল। আর ওর গলা অবধি ডুবে গেল। তখন ডুব দিয়ে দিয়ে জাল তুলে বাঁধল খুঁটির ডগায়। কিন্তু সাবধান, শব্দ যেন না হয়। ওরা হারছে। ওরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে পাকা গেমো ফল। ওড়চাকা আর কেওড়া ফল। ওই ফলের গন্ধে পাগল করে ওদের ছুটিয়ে দিয়েছে খোকাঠাকুর। বলে দিয়েছে, 'সাবধান ! সেই তোমার শত্রুপুরী। সেইখানে তোমার বাঁচা-মরার লড়াই।'

আর বদির মনে পড়ছে সেই কথাগুলি, 'সংসারের এই বিধি, লড়েই বাঁচতে হয় বাবা। আমাদের লড়েই মরতে হয়।'

গণ্ডির শেষ সীমা অবধি যখন জাল বাঁধা হয়ে গেল, তখন বদির ডুবজল। স্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরে। কিন্তু শব্দ করার উপায় নেই। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে কাছের একটা গাছ ধরল ও। নৌকায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। জল না চলকিয়ে আস্তে আস্তে গাছে উঠে পড়ল।

সময় যেতে লাগল। জল বাড়তে লাগল। বেলা মাঝামাঝি উঠল। জল বাড়তে লাগল। ওরা হারছে। বেলা ঢল খেল। জল নামছে। আসে যত জোরে, নামে তার থেকে জোরে। জল নামছে। আর ওদের লোভ বেড়ে গেছে। ওরা গন্ধে পাগল হয়ে গেছে। পেটে ওদের অভর ক্ষুধা।—'মানুষকে ক্ষুধা দিয়েছেন উনি, আর তার জ্বালায় লড়তে বলেছেন। মানুষকে ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে দিয়েছেন উনি। তাদের লড়ে বাঁচাতে বলেছেন, বুইলি কিনা বাবা।'…

কথাগুলি মনে পড়ছে। আর ক্ষুধা সত্যি অভর। ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে কী, জানে না বদি। ও দেখল, জল নামছে। খুঁটি জেগে উঠছে, জাল দেখা দিচ্ছে। বদি নেমে এল গাছ থেকে। এখনো সাবধান ! নিশ্চুপে এল নৌকায়। পাটাতন সরিয়ে বার করল মুগুর। শাল কাঠের ভারী আর মোটা মুগুর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অনেকখানি জল চলকে উঠে একটা রুপোলী গা লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তেই অদৃশ্য হল আবার। বদি চিৎকার করে উঠল, 'আই পাঙাস্ ! আই পাঙাস্ ! আমি আছি।'

মুগুরটা সে তুলে ধরল। জল নামছে তরতর করে। আর বাঁশের খুঁটিগুলি ফুলে উঠছে। ওরা ঘাই মারছে জলে। আবার একটা লাফ দিয়ে উঠল জলে। বিরাট

পাঙাস্ ! আঁশ নেই, পালিশ-করা রুপোর মতো শরীর ! বদি লাফিয়ে জলে পড়ল। জল তার হাঁটুতে।

গণ্ডির মধ্যে মাছগুলি লাফাচ্ছে। পাঙাস্, ছোট বড় রুপোলী পাঙাস্। দূর সমুদ্রের আশীর্বাদ। লাফিয়ে জাল টপকে ভিতরে ঢুকল বদি। আর বিস্ময়ে থমকে রইল ! এত বড় বড়। হে বাবা খোকাঠাকুর। আমার থেকে বড় পাঙাস্ !

দু-হাতে মুগুর তুলে মাছগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বদি। মাছগুলি লাফাতে লাগল। যেন গাছে উঠতে চাইছে। আর পড়ন্ত বেলার রোদে যেন রুপোলী উড়ন্ত মাছ মনে হচ্ছে। ঝলকে উঠছে। মুগুর দিয়ে আপ্রাণ পিটতে লাগল বদি। চিৎকার করতে লাগল, 'লড়ে যা, লড়ে যা।'

জল লাল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কেউ শান্ত হচ্ছে না। এক, দুই, তিন, চার …প্রায় দশ-বারোটা হবে। আর সবগুলিই বড়। আ রে বাবা ! ওটা কত বড়। শালা আমাকে দেখছে। আমার থেকে বড়। বাবার থেকেও বড়।

বৃহৎ পাঙাস্‌টার অর্ধেক শরীর তখনো জলে ডুবে আছে। বদি মুগুর তুলল। মাছটা লাফ দিল। এক লাফে বদির মাথা ছাড়িয়ে উঠল। আর পড়ল একেবারে ঘাড়ের উপরে।—'এই শালা, ছাড় !'

বদি সরতে চাইল। কিন্তু মাছটা ওকে নিয়ে মাটিতে পড়ল। ও নিজেকে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু কেমন যেন জুড়ে রইল পাঙাস্‌টার গায়ে। আর মনে হল কাঁধের কাছে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। বদি দু-হাত দিয়ে প্রকাণ্ড পাঙাসের পিছল শরীরটাকে জড়িয়ে ধরল, আর ছাড়াতে চাইল। পারছে না। জল আরো নেমেছে। বদি দেখল, রক্ত পড়ছে। কাদায় আর জলে রক্ত-মাখামাখি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে হাতাহাতি লড়বার বুদ্ধি নাই মাছের। পাঙাস্‌টাও ছটফট করছে। ওলটপালট খাচ্ছে। আর বিশাল মাছটার সঙ্গে বদিও ওলটপালট খাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হল, বদির বুকের মধ্যে কিছু বিঁধেছে গিয়ে আমূল।

বদি মাছটার মাথায় মুখ ঠেকিয়ে উঁকি দিল নিচের দিকে। দেখল, পাঙাসের কানের কাছের তীক্ষ্ণ কাঁটাটা তার কণ্ঠার পাশে নরম জায়গার মধ্যে ঢুকে গেছে। রক্তের স্রোত দেখা মাত্র আতঙ্কে কেঁপে উঠল বদি। চিৎকার করে উঠল, 'আই শালা, তুই আমাকে মারছিস্ !'

সারা গণ্ডিটা জুড়ে তখন অন্যান্য মাছগুলি দাপাদাপি করছে। যেন একটা তাণ্ডব চলেছে পলির পাঁকে। বদি আবার চিৎকার করে উঠল, 'আই খোকাঠাকুর ! তুমি আমাকে দানো করলে হে।'…ও শেষবারের জন্য মুক্তির চেষ্টা করল। পারল না। আর সেই কথাগুলি ওর মনে পড়তে লাগল : 'আমরা দু-জনেই লড়ি। আমরা দু-জনেই মরি। আগে আর পরে, বুইলে বাবা।'

গঞ্জে সকাল হল। এখন গঞ্জ মরা। ধান মজা। পাট নেই। নেহাত ঘরের বেড়াগুলি, চালগুলি পাহারা দেবার জন্যে গদিতে গদিতে এক-আধজন করে থাকতে হয়। তাই

কিছু লোক আছে। তারাই আবিষ্কার করল, বদি মরে পড়ে আছে গুদাম-ঘরের মধ্যে। খবর দেওয়া হল মালোপাড়ায়। মালোরা এল। দেখল, মাথাটা ঘাড়ে গুঁজে মরে পড়ে আছে নিতাই মালোর ছেলেটা। মরতই, আজ আর কাল। সবাই অপেক্ষা করছিল কেবল।

নাকে কাপড় চেপে ঘাড়গোঁজা শক্ত দুর্গন্ধময় শরীর সবাই বার করে এনে বাঁধের ওপর শোয়াল।...কত্তটুকুনি আর শরীরটা।

কত বয়স হয়েছিল ছেলেটার? একজন জিগ্যেস করল।

আর-একজন বলল, কে জানে। নিতাইও মরল, সঙ্গে সঙ্গে বউটাও মরল। ছেলেটা তো মেগে মেগে খাচ্ছিল। ক'দিন দেখছিলাম খালি শুয়ে পড়ে থাকে।

সকলেই চুপচাপ। একজন বাঁশ আনতে গেছে। একটা বাঁশেই ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে। ওই দূরের বাঁকের মুখে জালিয়ে দিলেই হবে।

একজন বলল, ওর বাবা নিতাই গিয়ে মরল সেই সাঁইমারার জঙ্গলে।

হ্যাঁ। কালীনগরওয়ালাদের জাল নৌকো চুরি করে নে' গেছল। নিজের তো কিছু ছিল না। কতদিন বেকার বসে ছিল। পেটের টানে অত বড় জোয়ানটা...

আর মরল কী ভাবে বল। ইস্! অত বড় পাঙাস্ মাছ কোনদিন দেখি নাই। কিন্তুন্, কণ্ঠায় গিঁথল কী করে, বল দিনি।

মাছমারার মাথার ঠিক না থাকলে অই হয়। সামলাতে পারে নাই, আর দ্যাখ ভ্যাগ্যি, পড় তো পড় একেবারে ঘাড়ে! মরণ-ধরা মাছটা নিচ্চয় পেল্লায় একটা লাফ দিয়েছিল। কপাল! কত মন ওজন ছিল যেন?

দেড় মনের ওপরে। এই গঞ্জেই তো বিকোলে এনে নিতাইয়ের মহাজন পঁচানন দাস।

হ্যাঁ, অনেক নাকি পাওয়ানা হয়েছিল নিতাইয়ের কাছে।

তবু নাকি মহাজনের পাওয়ানা মেটে নাই।

সকলে চুপ করল। তার পরে বাঁশটা নিয়ে একজন এল।

পাপ-পুণ্য

'একটা কি দুঃখ, কিছু বুঁইতে পারলাম না।'

এ-কথা, সেই এক কথা। যে-কথা, যে-কথাখানি কেতু নিজে বলে না। গদাই এইরূপ ভাবে। যেন কেতু বলে না। সেই এক কথা, এই গাড়ির চাকা যেমনটা এক পাক ঘোরে, আর পথ-চলতি-পায়ের তলায় কাঁটা বেঁধার মতো ককানি ওঠে, উহু! উহু! তেমনটা কেতুর ফোকোপড়া মুখ দিয়ে ফুটে বার হয়। কিন্তু, গদাই ভাবে, যেন কেতু বলে না। যেমন কি না, চাকায় তেল না পড়লে চাকা গোঙায়, সেইমতো কেতুর মনে বাতি নাই। মনে বাতি নাই কি যে দেখিয়ে দেয়, 'ওহে দেখ, এই কারণে বিন্দু গলায় দড়ি দিয়েছে।' কেতুর 'মাহানিশা'র অন্ধকার থেকে তাই বারে বারে গোঙানি ওঠে, সেই এক কথা। যেন এই কেতু বলে না, যে-কেতু এখন গাড়ির উপরে গদাইয়ের পিছনে বসে আছে। যে-কেতু পরশু রাত্রে ভৈরবের কোণের পুকুরধারে তালবনে বিন্দুর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল, যোবা মরদটি অঢেল লাল চন্দন-গোলা মদ খেয়েছিল, পুরো একখানি বোতল বিন্দুর জন্যে রেখে দিয়েছিল, কোঁচড়-ভরতি মুড়ি, কাঁচা পেঁয়াজ, অই কী ধন গো, তাতে কয়েক ফোঁটা সরষের তেল ইস্তক ছিল, লঙ্কার তো কথা নাই। যে-কেতু বিন্দুতে মনপ্রাণ, কত না জানি ছায়া দেখেছিল সেই রাত্রে, ভৈরবের কোণের পুকুরপাড়ে, অই বুঝি বিন্দু আসে গ, এই ভেবে ভেবে গোটা রাতখানি প্রায় ভোর হয়েছিল। কেন কি না, মেয়েটি তো হালছাড়া, স্বামীর ঘর সয় নাই কপালে, ডাগর বটে, তায় কেতু বউখেকো, মন রক্ত তাবৎ খাঁ খাঁ করে, মনের ঘরখানি ফাঁকা, তাই রাতভোর পাগল হয়ে বসে ছিল। তারপর ভোররাত্রে গদাইয়ের হাঁক শুনতে পেয়েছিল, 'অই, মেয়েটা আমার গলায় দড়ি দিয়েছে গ।'

অয়, হাঁ, মেয়েটা গদাইয়ের। তার হাঁক শুনে কেতু চন্দন-গোলা মদের বোতলের কথা ভুলে গিয়েছিল। আলগা কোঁচড়ের মুড়ি তাবৎ ঘাসের উপর পড়েছিল। আর সেই থেকে এক কথা 'বিন্দু গলায় দড়ি দিলে, কিছু বুঁইতে পারলাম না।' যে-কথা ওর মাহানিশার অন্ধকার থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু আলো পায় নাই। তাই কেবল পাক খেয়ে মরছে।

গদাইয়ের এক জবাব, 'অই।'

'বাবা হে।' কেতু ডাক দিয়ে বলে।

গদাই বলে, 'না, বাপ বলিস না আমাকে। আমি কারুর বাপ লয়।'

কিন্তু সে-কথায় কেতুর কান নাই। কেননা, কেতু যেন নিজে কথা বলে না। এই গাড়ির চাকা যেমন ঘোরে, তেমনি আবার গোঙানি ওঠে, 'রাতভর, ভৈরবের কোণের পাড়ে—'

কথা শিস হয় না কেতুর। স্বর নাই গলায়। কথা ফোটে, কথা ডুবে যায়। কেতু ধুলা-মাখা মুখে, ধুলা-মাখা ভুরু দুটি কুঁচকে দূরে তাকিয়ে থাকে।

গদাইয়ের মনে হয়, সেও নিজে কথা বলে না। তার মনেও বাতি নাই। চাকা যেমনটা পাকে পাকে গোঙায় তেমনি শব্দ করে, 'অই।'

গাড়ি বলদের মর্জিতে চলে। ফাল্গুন মাসের রাস্তা শুকনো। কিন্তু বর্ষার ধকল সব কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। এখনো খানা খন্দ উঁচা নিচা বিস্তর। চৈত্রে আরো সমান হবে। বৈশাখে আরো। তখন পায়ের পাতা-ডোবা ধুলা হবে। এখন মানুষ আর পশুর পায়ে পায়ে, গাড়ির চাকায় চাকায় সমান হতে চলেছে, ধুলা জমতে লেগেছে। তার পরে আবার—আবার বৃষ্টি, চাকা যেমনটা ঘোরে আর গোঙায়। গদাই ভাবে, অই, এ সকলই কি অন্ধকার ডাকে। বাতি নাই।

ফাল্গুন শেষ হয়ে এল, তাপ এখন বেজায়। এখনো ঘোর দুপুর আসে নাই, তাপে রোদ কাঁপতে লেগেছে। রোদ ছাড়া ছায়া নাই। যত দূরে চোখ যায়, মাঠের কোন বেশভূষা নাই, বৈরাগীর একরঙা আলখাল্লা তার গায়ে। ধুলা আর ধুলা। কেবলমাত্র মাঠের এপারে-ওপারে ছাড়া ছাড়া, দূরে দূরান্তে গ্রামগুলো গাছের ছায়ায় ডুব দিয়ে আছে। কোন সাড়াশব্দ নাই। গদাইয়ের শরীরে তাপ বিঁধে না, শরীরে সেই চেতন নাই। কেতুরও না। কেননা, তার শরীরও অচেতন। রোদ-ঝলসানো মাঠের ঝিঁঝি ডাকার একটানায় হঠাৎ হঠাৎ মাছির ঝাঁক ভানভেনিয়ে ওঠে, যখন উঁচা-নিচায় গাড়ি দুলে ওঠে। মাছি বলদের কাঁধের ঘায়ে, বেশি মাছি গাড়ির ওপর—যেখানে বিন্দুকে চাটাইয়ে বেঁধে শোয়ানো রয়েছে। পরশু রাত্রের মড়া, শেষরাত্রের মড়া। তবু তাপে মাটি ফাটছে, মড়া তো গলবেই বটে। পচন ধরেছে কাল বেলাবেলি থেকেই। কিন্তু অপঘাতে মরা, পুলিশ সদরে টানাপোড়েন না করে ছাড়ল না। গাঁ থেকে সাত মাইল দূরে, বর্ধমানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের চৌকিদার কোমরের ফেত্তা কষে বলেছিল, 'তা বললে কি চলে, গলায় দড়ি বলে কথা।' লোকেরা বলেছিল, পুলিসের ডাক্তার বিন্দুর মড়া কাটাকুটি করবে, সব দেখবে। অই, বিন্দু গ, তোর শরীলের ভিতর কী দেখবার আছে। মানুষের শরীরে কী দেখবার আছে। শরীরের মন আছে। কিন্তু মন কি কেউ দেখতে পায়। তার কি শিরা-উপশিরা আছে, হাড়মজ্জা রক্ত আছে। বিন্দুর শরীরে কী দেখবার আছে। আইন মন মানে না, সে কাটাকুটি করে দেখতে চায়। আপন মন মেরেছে না মানুষ মেরেছে। বিষ দিয়ে মেরেছে না গলা টিপে মেরেছে।

তবে ডাক্তারের চোখ, পুলিসের ডাক্তারের চোখ, ফাঁকিতে পড়ে নাই। বিন্দুর শরীর নিয়ে কাটাকুটি করে নাই। কেবল গদাইকে ডেকে জিগ্যেস করেছে, 'মেয়েটির বিয়া দিয়েছিলে হে?'

'আজ্ঞে।'

এখন যেমন, তখনো তেমনি ছিল, মুখের চামড়া অনড়। অই হে, গদাইয়ের মুখের চামড়ায় কী হল, পক্ষাঘাতের মতন তার নড়াচড়া নাই। ডাক্তারবাবু আর

দারোগাবাবু তার মুখের দিকে খোকনের মতন তাকিয়েছিল। আহা, শিশুর মতন। তাদের চোখ-মুখ কি সুন্দর গ! গদাইয়ের মুখে ভাব ছিল না, চোখে পলক ছিল না, কালো তারা দুটি থির। বাবুদের কী শোক-লাগা মুখ।

দারোগাবাবু বলেছিল, 'তা ওহে গদাই বায়েন, মেয়েটির মনে কোন তাপ ছিল? কেউ দাগা দিয়েছিল নাকি? অমন আলটপকা আত্মঘাতী হল কেন?'

'আজ্ঞে, বলতে পারি না, আবাগী—'

অই, ওহো গদাই, মন কেউ দেখতে পায় না। সকলই অন্ধকার। বাবুদের চোখ মুখ কী সুন্দর।

'যাও, লিয়ে যাও মেয়েকে, পোড়াবার ব্যবস্থা কর গা।' বলে বাবুরা একখানি কাগজ দিয়েছিল।

সদরেও সঙ্গে গিয়েছিল কেতু। ও যে বুঝতে পারে নাই বিন্দু কেন গলায় দড়ি দিয়েছে। অথচ, নিজের চোখকে তো গদাই ফাঁকি দিতে পারে না, সে যে দেখেছে, সোয়ামীর ঘর সইল না বিন্দুর। কাঁচা ঢলের খাত চাই। বউখেকো কেতুর সঙ্গে মেয়ের চোখে চোখে কথা, কথায় কথায় ইশারা। সাঁঝবেলার বাতাসে মদের গন্ধ টের পাইয়ে দিত, ঘরের কানাচে অন্ধকারে কেতুর নিশ্বাস পড়ছে। ঘর সমাজ আছে, দুটা কথা বলতে হত গদাইকে, চোটপাট করে হাঁকোড় পাড়তে হত। কেতু বলত, 'এ তোমার আঁইবুড়া মেয়ে লয় হে, পাওয়ানা তোমার কিছু নাই। সাঙা করে ঘরে লিয়ে যাব, এই এক কথা।'

তা বললে কি হয়, কেতুর মন নাই কি। গদাইয়ের পায়ের কাছে আধখানা ভরতি বোতল বসিয়ে দিত। 'অই বাপ, বাপ বলি হে, এস খাই। দু-মুঠা মুড়ি দিতে বল, ঘর করতে যদি আদা থাকে, দুখানা কুচি দিতে বল।'

সাত বিঘা জমি কেতুর, বায়েনের ঘরে। এ-কথা প্রত্যয় হয় না, কিন্তু ভৈরব জানে, সাত বিঘা জমি কেতুর, ওর বয়সে ঢাক কাঁধে করে নাই। পরের বলদ ধার করে না, নিজের জোড়া বলদ, এই যে চলেছে গাড়ি টেনে নিয়ে। এই বলদ, এই গাড়ি, সকলই কেতুর। বাপ বলত কেতু, এই এক কথা, বাপ বলত কেতু। বউখেকো যোবা, ঘরে অন্ন আছেন, গদাই কি মানুষের মন নয়। সে বলত, মেয়ে নারকেলের মাজা মালা এনে দিত, বাপের হুকুম শোনবার সময় কোথায় তার। মুড়ি এনে দিত, অই গ আমার আদুরি হারামজাদী, বাপের মাথায় দেবার জন্যে তোর একটু সরষের তেল হাতে উঠত না, মুড়িতে তেলের বাস ছাড়ত। আদার কুঁচি ছুঁড়ি কোথায় পেত কে জানে। কেতুর দিকে চেয়ে বলত, 'আদা দেখে খেয়ো গ বাবা।' মদ মুড়ি গদাই খেত, কেতু বিন্দু আপনার তালে। তাদের কথার পিঠে কথা, হাসির পিঠে হাসি। কী বলবে গদাই। মাহাচান্দার ছেলে জামাইটার কথা মনে পড়ত। এ কাঁচা ঢলের স্রোতে মাটি আ-ফাটা থাকবে, তেমনটা সে নয়। অই হারামজাদী আমার, গদাইয়ের মা তুই, কেতু তোর কাছে সাঙা চায়। কেতুর ঘরে অন্ন, বলদ, গাড়ি। খুশির কথা

মুখ ফুটে বেরুত না, চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়ত। কেননা, বিন্দুর মায়ের কথা মনে পড়ে যেত। দশ বছর গত, মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে পারে নাই। কেতুর অন্নের ঘরে যাবার রঙ্গ দেখতে পায় নাই। বিন্দুর মায়ের শোকে মদের ভারে গদাইয়ের যখন ভর হত, ওদিকে তখন কেতু-বিন্দুর কথার পিঠে হাসি, হাসির পিঠে ঝগড়া ইস্তক। মানুষের মন অই, কী অন্ধকার। তখন তেঁতুলতলার রাঁড়ি বেওয়া পটার মুখখানি গদাইয়েরও মনে পড়ত। তবে কি না, সে-কথা এখন থাক।

এখন, তাই কেতু না এসে পারে নাই। সদরে গিয়েছিল গদাইয়ের সঙ্গে, বিন্দুর মড়া কাঁধে নিয়ে। আবার কাল রাতে রাতেই মড়া খালাস পেয়ে ফিরে এসেছে কাঁধে নিয়ে। গ্রামের আর কেউ যায় নাই। একে তো অপঘাতের মরণ, তায় পুলিসের টানা-পোড়েন। চাটাইয়ে বেঁধে এক বাঁশে ঝুলিয়ে দু-জনে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে, এসেছে। এখন চলেছে মহাশ্মশানে। গাড়ির ওপরে চাটাই জড়ানো, এক বাঁশে বাঁধা, যেমন ছিল, তেমনি শুইয়ে নিয়ে চলেছে। ভর দিন, ভর রাত্রির যাত্রা। কাল দুপুর-তক পৌছুনো যাবে। গ্রামের কেউ শ্মশানযাত্রীও হয় নাই, কেতু ছাড়া। ওদের ঘরে, শরীরে অপদেবতার নজর লাগবে, তাই কেউ যাত্রী হয় নাই। দু-জনে চলেছে। সকাল থেকে পাঁচ ক্রোশ পথ আসা গিয়েছে, সূর্য মাথার ওপরে। আরো বারো ক্রোশ, তার পর মহাশ্মশান।

কেতু জিগ্যেস করেছিল, 'ক্যানে, কাঁদরের ধারে পুড়োবো না?'

গদাইয়ের মুখের চামড়া নড়ে নাই। বলেছিল, 'না, মাহাশ্মশানে যাব, লইলে মুক্তি নাই।'

কেতু গদাইয়ের কথাগুলোই বিড়বিড় করেছিল, 'মাহাশ্মশানে যাব, লইলে মুক্তি নাই।' তার পরে বলেছিল, 'কিন্তু কিছু বুঁইতে পারলাম না।'

গদাই যাত্রার আগে আপন ভিটের দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর চামুণ্ডার পূজারী মুখুজ্জা ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভিটেবাঁধা টিপসই দিয়ে চার কুড়ি টাকা নিয়েছিল। কেতু সেই একবার, একেবারের জন্য নিজে কথা বলেছিল, 'অই ওহে, বাপ না বলতে দাও, ভিটে ক্যানে যমের ঘরে দিচ্ছ। আমার কি টাকা নাই?'

গদাইয়ের বুকের ভিতরটা ধস্ নামার মতন দুলে উঠেছিল, কিন্তু মুখের চামড়া, চোখের তারা কাঁপে নাই। বলেছিল, 'না, মাহাশ্মশানে যাব কেতু, এখন তোর টাকা লোব না।'

তবু কেতু বলেছিল, 'ক্যানে, বিন্দুর গতি করতে আমার টাকা লিবে না?'

গদাই তেমনি করেই, যেন কিছুই চোখে পড়ে না, অথচ চোখ খোলা, স্থির চোখে তাকিয়ে স্বরহীন গলায় বলেছিল, 'না, এ-যাত্রায় কারুর টাকা লোব না।'

কেতু আর-কিছু বলে নাই। সে দরকারী জিনিসপত্র সব গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। বিন্দুর মড়া গাড়িতে তুলে দু-জনে যাত্রা করেছিল। বায়েন-পাড়ার পুরুষেরা দূর থেকে দেখেছিল, মেয়ে-বউরা ঘরের আড়াল থেকে। গদাই দেখেছিল

চাটাইয়ের বাইরে বিন্দুর মুখখানি বেরিয়ে রয়েছে। কালো তেলতেলে মুখখানি তখন আর তেলতেলে না। ফুলে উঠেছিল, রংটা যেন রোদে পোড়া মাটির মতন দেখাচ্ছিল। ডাগর চোখ দুটি খোলা। রোদ লাগবে, কড়া রোদ, গদাই হাত বাড়িয়ে কাপড় টেনে মুখখানি ঢেকে দিয়েছিল। চুলগুলো এলিয়ে পড়েছিল বাইরে, তখনো তেলের চকচকানি ছিল, অই কি পোড়া নাক গ গদাইয়ের, মসলা-মেশানো তেলের গন্ধও খানিক পেয়েছিল। চুলগুলো ঝুঁটি করে মাথার পিছনে ঘাড়ের কাছে গুঁজে দিয়েছিল। তবু, সিঁদুর মাখানো সিঁথেটি, এখনো দেখা যায় মাথার খুলিখানি যে বেরিয়ে আছে। চাঁদিটি চকচক করে। ফাল্গুনের শেষ, এখন চোতখরা বলা যায়। বিন্দুর এখন চাঁদি ফাটবে না। কেননা, চাঁদিতে কি না সাড় নাই। তবু, অই আমার ঢলানী মা, সিঁথের সিঁদুর দেখে মনে হয়, জীবন্ত সধবার মাথা তোর।

গদাই যখন বিন্দুর মড়ার দিকে তাকায়, কেতুও তখন তাকায়। গদাইয়ের ইচ্ছা করে, একটা বড় নিশ্বাস ফেলবে, বুকখানি খালি করে হুসহুস করে নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু বড় করে নিশ্বাস পড়ে না। বুকের ঘরে যেন বাতাস নাই। বুকের ঘরে কেবল 'মাহানিশা'র অন্ধকার।

'ওহে, বাপ।' কেতু ডাকে।

গদাই মুখ ফিরিয়ে দূরে তাকায়, বলে, 'বাপ বলিস না কেতু, আমি কারুর বাপ লয়।'

কেতু সে-কথা কানে তোলে না, আপন মনে বলে, 'ভৈরবের কোণের পাড়ে রাতভর দু-জনে থাকব, এই কথা ছিল।'

'অই।'

'দু-জনায় শুব, অয়, তুমি রাগ করতে পার এই কথা ছিল।'

'অই।' কিন্তু এখন আর রাগ হয় না এ-কথা শুনে। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে এই এক কথা কতবার বলল কেতু। যে-কথা কেতু এখন আর নিজে বলে না।

'কিন্তু কি হল, আমি বুঁইতে পারলাম না।'

গদাই আর কোন শব্দ করে না। যেন শব্দ করার মতো একটু বাতাস নাই বুকে। কেতু চুপ করে না, আবার ডাকে, 'ওহে বাপ।'

'বাপ বলিস না কেতু, সন্‌সারে কে কার বাপ।'

'বিন্দুর সঙ্গে কথা ছিল, তোমরা সবাই কিষ্টোদাসের মেয়ের বিয়েতে পাড়ায় মাতবে। আর বিন্দু ভৈরবের কোণের পাড়ে যাবে।'

কিন্তু গদাইয়ের কানে আর সে-কথা যায় না। তার মনে বাতাস নাই, বাতি নাই, কেবল একটা কথা বাজতে থাকে, 'সন্‌সারে কে কার বাপ।'

'তোমার পেটে দব্য পড়লে তুমি পচীর ঘরে যাবে, এই ভেবেছিলাম…।' কেতু বলে।

গদাইয়ের কানে যায় না। তার মনের মধ্যে বাজতে থাকে, 'সন্‌সারে কে কার বাপ, কে কার মা, কে পুত্র, কে কন্যা, এ সবই মাহানিশার অন্ধকারের মতন লাগে…'

'বিন্দু এল না, আমার রাত কাবার হয়ে গেল।'...

'সন্‌সারে একটা বাতি দেখি না হে...।' গদাইয়ের মনের মধ্যে, মনের অন্ধকারের মধ্যে এই কথা বিলাপের মতন বাজতে থাকে। তার মুখের অনড় চামড়ায় একবার, এক লহমা, একটা অন্ধের আর্তি ফুটে ওঠে যেন। কিন্তু সে-লহমা ধরা দেয় না।

দু-জনকে প্রায় উলঙ্গই মনে হয়। ছোট ছোট ময়লা কাপড় দুটি দু-জনের কোমরে গোঁজা, কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করেছে মাত্র। কেতুর সকল লজ্জা-ভরসা ভৈরবের কোণের পাড়ে পড়ে রয়েছে। গদাই ভাবে, সংসারের কোন লজ্জা নাই। সংসারের কি কোনকালে লজ্জা ছিল, ওহে গদাই, একবার সত্যি করে বল। তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকতেও তুমি কোথায় আপনাকে গতি করলে। দেবতারা লজ্জাকে কোথায় নিয়ে বসে রইল, মরা মেয়েকে তুলে দিল তোমার হাতে। তুমি মহাশ্মশানে চললে। সকল কিছু সকল নয়, সংসারে শ্মশান সকল হল।...লজ্জা নাই, যেন দুটি উলঙ্গ, কালো পুরুষ। গায়ের চামড়া দেখে তাদের ষোবা বুড়া চেনা যায় না। জগতের দাগ কমবেশি আছে, আগে-পরের দাগ। যে আগে আসে তার গায়ে দাগ বেশি, পরে যে আসে তার দাগ কম। রোদে পোড়া, ধূলায় নাওয়া এই জগতে জীবের বয়স কিছু না। মানুষের বয়স মানুষকে চেনায় না।

বলদ দুটি নিজেদের মর্জিমতন দাঁড়িয়ে পড়ে। রোদ যার চক্রে, সে মাথার উপরে জলছে। ঝুঁটিতে ঘা-ওয়ালা পশু দুটো, গায়ে গা জড়ানো গুটিকয় বটের ছায়ার তলায় আপনি দাঁড়ায়। দুজনেই ছড়ছড়িয়ে মোতে। বিশ্রাম দরকার। রওনা হওয়া ইস্তক দাঁড়ায় নাই। জায়গাটাও সুবিধার, কেননা গ্রামের বাইরে। গ্রামের ভিতর দিয়ে মড়া নিয়ে গেলে, তায় বাসি মড়া, লোকেরা রাগ করত। দাঁড়ানো তো পরের কথা। এখানে, বটের গোড়ায়, মানসিকের মাটির ঘোড়ার স্তূপ, শীতলার থান বটে। অন্য গোড়ায় সিঁদুর মাখানো পাথর, মেলাই ঢিল জড়ো হয়েছে। ষষ্ঠী-ঠাকরুণের বাস।

গাড়ির নিচে খড়ের আঁটি বাঁধা, বিন্দুর শরীরের তলায়। কেতু দু-আঁটি নিয়ে বলদ দুটিকে খেতে দেয়। গদাই দূরান্তে মুখ ফিরিয়ে দেখে। সামনে মঙ্গলকোট। রাস্তা বীরভূম দিয়ে উত্তরে গিয়েছে। কাটোয়া শহর হয়ে যেতে ইচ্ছা করে না, লোকে দশ কথা বলবে, নাকে কাপড় চাপা দেবে, গালি পাড়বে। তার চেয়ে থুপসরা, ব্যাংচাতরা, জলঙ্গী, বনগ্রাম, চারকলগ্রাম, পাকুড়হাঁসের পাশ দিয়ে গঙ্গাটিকুরির উপর দিয়ে যাওয়া ভালো। কেতুগ্রাম হয়ে পাচন্দির উপর দিয়ে রেললাইন পার হলেই হবে। এখন তো পথের ভাবনা নাই, মাঠ খাঁ-খাঁ করে। রাত ভোর হয়ে যাবে গঙ্গাটিকুরি তক যেতে। তার পরে—তার পরে মহাশ্মশান আর দূরে নয়।

গদাই বিন্দুর মড়ার দিকে তাকায়। অই, হ্যাঁ বাতাসে পচা গন্ধ ওঠে, মাছিগুলো চাটাইয়ের গা থেকে নড়তে চায় না। কোথায় যেন ছিল তখন গদাই, মনে করতে পারে না, পচীর ঘরে নয়, কোন ঘরে নয়। টালমাতাল হয়ে বাইরে, বাদাড়ে না

মাঠে, কোথায় ঘুরে মরছিল। কিষ্টোদাসের বাড়িতে তখন নেত্য শুরু হয়েছিল। বর কনে বাপ মা চন্দন-গোলা মদের ঘোরে সকলেই চড়ে উঠেছিল। কেবল খাদন তার সানাই বাঁশিখানি বাজাচ্ছিল: 'মা আমার আনন্দময়ী…।' বিয়ের মজা, কোথায় বাজাবে "মাথা খাও, যেও না, আলুভাতে ভাত খেয়ে যাও' তা নয়, মাতাল খাদন মায়ের গান ধরেছিল সানাইতে। এখন সুরটা গদাইয়ের ভিতরে যেন বাজছে, 'মা আমা-আ-আ-র আনন্দ-অ-অ-অ-ময়ী—' ধিন তাক্ এখানটায় আপনি তাল এসে যায়। কিন্তু ঢাকের পিঠে এ-বোল ফোটে না। যেমন কিনা বাঁ হাতে কাটি ধরে, ডান হাত খালি নিয়ে, ঢাকের পিঠে পরিষ্কার বোল তোলা যায়, 'ও নিতাই যাচ্ছ কোথা, ও নিতাই বস হেথা।' তখন ঘরে ফিরে গিয়েছিল গদাই। গলায় শব্দ ছিল না, তখনো বুকে বাতাস ছিল না। মনে করেছিল, ঘরের দরজা হয় বাইরে থেকে বন্ধ, নয় ভিতর থেকে বন্ধ থাকবে, কেন কি না, হয় বিন্দু ঘরে ফিরেছে, নয় বিন্দু বাইরে রয়েছে। কিন্তু হাত দিয়ে দরজা পায় নাই গদাই, কারণ দরজা খোলা ছিল, ভিতরে ঘোর অন্ধকার। বিন্দুকে সে ডাকে নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকে দু-পা গিয়ে বিন্দুর হাঁটু তার মাথায় ঠেকেছিল। 'ওমা তুই চালের বাতায় দড়ি পরালি কেমন করে?' অত উঁচুতে বিন্দু কেমন করে দড়ি পরিয়েছিল, এ-কথাটা গদাই বুঝতে পারে নাই। হাঁটু মাথায় ঠেকতেই হাত দিয়ে বিন্দুর পা ছুঁয়েছিল, পা ঝুলছিল, ঠাণ্ডা পা। অই আঃ, সাঁঝবেলায় আলতা পরেছিল পায়ে, কেন কি না, কিষ্টোদাসের মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিল মেয়ে।

'না কিছু বুইতে পারলাম না।'

গদাই জবাব দেয় না, কারণ এ-সময়ে গাছের ডালে ঝাপটা খেয়ে শব্দ হয়, আর গাড়ি থেকে একটু দূরে, একটা কালো ছায়া নেমে আসে। ছায়াটা তার পরে মূর্তি ধরে, দু-পাশে পাখা মেলে, চাটাইয়ে জড়ানো বিন্দুর দিকে পলকছাড়া গোল চোখে তাকায়। গৃধিনী! গলায় গলকম্বলের মতো লাল চামড়া ঝোলে, কাঁপে, চোখা শক্ত ঠোঁটের আর সাপের মতন চোখের পাশে লাল রং। গদাই কেতুর দিকে চায়, কেতু গদাইয়ের দিকে। চোখ ফিরিয়ে দু-জনেই গাছের দিকে চোখ তুলে দেখে। কে জানে, আরো আছে কি না। ঝাড়ালো গাছের মাথায় কিছুই দেখা যায় না। মড়ার গন্ধ পাবার আগে মাছি গিয়ে শকুনকে খবর দেয়। বলা কি যায়, কখন পিছু নিয়েছে বা আকাশ দিয়ে উড়ে আগেই এসে বসে আছে।

আবার শব্দ হয় উঁচার ঝাড়ে, কালো মরদা নেমে এসে দাঁড়ায়। নজর বিন্দুর দিকে। শকুনটার পাখা গুটানো, গৃধিনীর ছড়ানো পাখা ঘেঁষে দাঁড়ায়। গদাই বিন্দুর মড়া-মোড়া চাটাইয়ে হাত রাখে। মহাশ্মশানের ভোগ, অই, তোরা চোখ ফিরিয়ে রাখ। কেতু গাড়ির তলায় খড়ের আঁটিতে গোঁজা বাঁশের লাঠি টেনে বার করে। অই, কেতুর বিন্দু না বটে। তবে, এই যে, আঃ বুকের অন্ধকার বড় তোলপাড় করে কেন গদাইয়ের।

বিন্দুর সিঁদুর-মাথা চাঁদিতে হাত বুলায় সে। মুখখানি একবার দেখতে ইচ্ছা

করে। পরশু বিকালে না কত ধমক-ধামক করলি বাপকে, 'দেখ, আগে থাকতে বলি, মেলাই গিলে কুটে লাচন কোঁদন লাগিও না। রাত দুকুরে আমি তুলে লিয়ে আসতে পারব না।' তখন আঁট করে খোঁপা বেঁধে বিন্দু ফুল গুঁজেছিল। গলায় রূপার হার, পিতলের নাকছাবিটা বুঝি ছাই দিয়ে মেজে নিয়েছিল, বড় যে ঝিকমিক করছিল, পায়ে আলতা। গদাই কি ঘাস খায়, হারামজাদী, তোর কেন অমন সাজের ঘটা, বাপের চোখে কি ফাঁকি যায়।

গদাই বলেছিল, 'মারব মুখে দু ঘা, রাক্‌কুসি, দেখব কে লাচন কোঁদন করে। তখন বাপকে ডাকলে ফেলে দিয়ে আসব কাঁদরে।' অই, ওহে গদাই, মুখের কথা কেন সত্যি হল না, মেয়েকে কেন কাঁদরে ভাসিয়ে এলে না। তাহলে আজ এই মহাশ্মশানে যাত্রা করতে হত না, কেন কি না, গদাই যদি রাগ করে নিজের হাতে মেয়েকে ডুবিয়ে মারত, সেটি ছিল পুণ্য, হ্যাঁ, সেই ছিল পুণ্য। আর এই, এই যে গলায় দড়ি, এই সকলই অন্ধকার। জল নাই হে গদাই তোমার চোখে, তোমার ভিতরের অন্ধকারে এক ফোঁটা জল ইস্তক নাই, 'মাহানিশায়' পথ হাতড়ে হাতড়ে গলায়-দড়ি-দেওয়া মেয়ের হাঁটুতে তোমার মাথা ঠেকে যায়। অই, আহা, মাহাচান্দার জামাইটাকে যবে ছেড়ে এল বিন্দু, গদাই না বলেছিল, 'ওলো মা-খাগী, ভাতার-ত্যাগী, গলায় দড়ি দি গা যা।' ওহে, আঃ, তখন যদি বিন্দু গলায় দড়ি দিত, তবে গদাই ভাবত, সেই পুণ্য।

কিন্তু সকলই অন্ধকার। তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল, তবু বাতি কোথায় ছিল, গদাই দেখতে পায় নাই।

'অই মা গ!' আবার চাটাইয়ে হাত দেয় গদাই। রস গড়ায়, চাটাই ভিজে উঠেছে।

'আই, হট্টা হট্টা! ওহ বাপ!'

'বাপ বলিস না কেতু। কেন কি না, গদাধর বায়েন কারুর বাপ লয়।'

কেতু সে-কথায় কান না দিয়ে বলে, 'গাড়ি চলুক, চল হেঁটে মারি, শকুনগুলোর গতিক ভালো না।'

আবার সেই সময় দু-বার গাছের ঝাড়ে শব্দ হয়, দুটো শকুন নেমে আসে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করা দেখে পাখাওয়ালা রাক্ষসগুলো পাখা গুটায় না। মুখের ভোগ চলে যায় দেখে সাপের মতন চোখে আগুন জ্বলে। হাট থেকে ফেরা দুপহরের মানুষের মতন চেঁচায় একটা, যার ঘরেতে ভাত নাই, তার পরে পিছে পিছে পায়ে পায়ে আসে কয়েক পা।

যোবা মরদটির প্রাণে এখনো কী সাধ, লাঠি উঁচায়, ঢ্যালা নিয়ে ছুঁড়ে মারে। ওরা ডরায় না, মাথা নিচু করে, ঘাড় কাত করে ঢ্যালা সামলায়। রাস্তা বাঁক নেবার পর ওরা হারিয়ে যায়, আর দেখা যায় না। এতক্ষণে বোঝা যায় বলদ দুটো জোরে ছুটছিল, গায়ের চামড়া মাছি তাড়াবার মতন বারে বারে কেঁপে উঠছিল, কেন কি না, শকুনকে ওরা ডরায়, জীবন্তে ডরায়। তার পরে কেতু গাড়ির তলায় খড়ের

আঁটির পাশ থেকে কাপড়ের পুঁটলি বার করে। চিড়া মুড়ি গুড় সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বলে, 'দুটো মুখে দেবে না?'

অই, আঃ, কী কাল খাওয়া শিখেছিল গদাই, মানুষের সকলই শূন্য, কখনো ভরে না। তার সকলই অন্ধকার, কখনো ঘোচে না। সকলই শূন্য, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতা। না, মহাশ্মশানযাত্রায় আর ক্ষুধা নাই গদাইয়ের। মুখের দুই কষে তার সাদা ফেকো, তবু উপবাস তাকে কষ্ট দেয় না আর।

'না কেতু, তুই খা।'

'অই কি করি বল, পেট মানে না।'

আঃ, মানুষের কবে কি মেনেছে হে। মানুষের আহ্লাদ, সে সব মানিয়েছে, কেন কি না, মহানিশার অন্ধকারে তার চোখ সয়ে গিয়েছে। সে মনে করেছে, সকল-কিছুই তার নজরে ধরা।

আচমকা বাতাসের ঝাপটা সাঁ করে মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, গায়ের উপর দিয়ে ছায়া উড়ে যায়। শকুন মাথার উপর দিয়ে উড়ে আসে, বড় করে পাক খায়। কেতু তাড়াতাড়ি মড়ার পাশে খাবারের পুঁটলি রেখে হাঁকোড় দেয়, 'হেই শালা, তোকে খাই।'

লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে। গদাই দেখে, এক দুই তিন চার পাচ—পাঁচ, না, উই আর একটা, ছয়। পর পর ছয় শকুনে মাথার উপর ওড়ে, ছায়া ফেলে যায় গায়ে। গায়ে, গাড়িতে, বিন্দুর উপরে। কেউ সঙ্গে সঙ্গে যায়, কেউ আগে উড়ে গিয়ে গাছে বসে। এদের বাতি নাই, অন্ধকারও নাই। মড়া, মড়া, মড়া, মড়া দাও হে, জগৎ জুড়ে সকলই মড়ায় ভরিয়ে দাও। মানুষ থাকুক না, তেত্রিশ কোটি দেবতা তার, অই তার কি অহংকার গো, সে খালি মড়া চায় না, ভোগ চায় না, সে সবই মানিয়ে নিয়েছে, তার বড় আহ্লাদ। অই, চোখ-সয়ে-যাওয়া কী পাপ হে। গদাই শকুনে প্রত্যয় যায়।

ছয় শকুনে পিছন ছাড়ে না। কেতুর খাওয়া হয় না। তার হাতে লাঠি উঁচানো, ঢ্যালা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে। ছয় শকুন পালায় না, হার মানে না, বিন্দুকে তারা ছাড়তে চায় না। তাই ছয় শকুন, এখন বিন্দু মড়া, এখন তোমাদের ঠোঁটের ধার আর কাটার জ্বালা দিতে পারবে না। ছয় শকুনকে কেতু মারতে যায়, অই, আর, তবু পেটে বড় ক্ষুধা ওর। না, ছয় শকুনে কিছু পাবে না, এ শরীর এখন মহাশ্মশানের ভোগ।

'আমি যাই বিন্দুর কাছে।' এই কথা গদাইয়ের ভিতরে কে বলে ওঠে। 'আমি যাই বিন্দুর কাছে।' মনের অন্ধকার থেকে অজানা কে কথা বলে যেন। গদাই গাড়িতে ওঠে, তারপর বিন্দুর মড়ার পাশে চিত হয়ে শোয়। রোদ তার চোখে পড়ে, পায়ের বুড়ো আঙুল বরাবর সে দূরে চোখ রাখে। না, গন্ধ নাই, অশুচিতা নাই। কিন্তু বড় করে একটা নিশ্বাস কেন পড়ে না, আঃ, ওহে, সকল জল শুকিয়ে গিয়েছে।

'ওহে বাপ।'

'বাপ বলিস না কেতু।'

'ছয় শকুনে তোমাকে মড়া দেখবে গ।'

গদাই সে-কথা শুনতে পায় না। অই মা, অন্ধকার সকল জল কি এমনি শুষে নেয়।

সাঁঝবেলায় নতুনহাট পেরিয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের ধারে বলদগুলো আবার দাঁড়ায়। সাঁঝবেলার মধ্যে পাকুড়হাঁস ইস্তক যদি যাওয়া যেত, বিশ্রাম করে, তারপর সোজা পুবে কেতুগ্রাম মাঝরাত্রি বরাবর, শেষ রাত্রে গঙ্গাটিকুরি। তা হবে না মনে হয়, গঙ্গাটিকুরি রোদ দেখাবে।

এখন শকুনেরা হার মেনে কোথায় থেমে গিয়েছে, আর দেখা যায় না। কেতু বলদ দুটোকে জোয়াল-ছাড়া করে দেয়, ওরা গোবর চোনা ছাড়তে ছাড়তে আশে-পাশে ঘাসে মুখ দেয়। কেতু আবার মুড়ি-চিড়া নিয়ে বসে। তার আগে গাড়ির তলায় গলা-বেঁধে-ঝোলানো মেটে কলসী দেখে নেয়, জল কত আছে। আছে, রাত কাবার হয়ে যাবে, মঙ্গলকোট থেকে জল ভরে আনা হয়েছে। এখন গাড়িটার ঘাড় নোয়ানো, বিন্দুর মাথা নিচের দিকে। মাথায় রক্ত উঠবে, ভয় নাই। গদাই তাকিয়ে দেখে, বিন্দুর চাঁদির কাছে একটা দরানি বেয়ে পড়ছে। কে জানে, কান থেকে না নাক থেকে দরানি গড়িয়ে পড়ে। মাছিগুলো এখনো যায় নাই, রাত্রেও কামড়ে পড়ে থাকবে।

কেতুর মুখ ভরতি মুড়ি। সে যে খায়, সে-কথা যেন মনে নাই, চোখ বিন্দুর দিকে। মোটা অস্পষ্ট মুড়ি-মুখে-নেওয়া গলাতেই বলে, 'কিন্তু এই দুঃখু কি, কিছু বুঝতে পারলাম না।' ওর মন সেই ভৈরবের কোণের পাড়ে।

এই সময়ে গাঁয়ে-ফেরা দু-চার গৃহস্থের সঙ্গে ওদের দেখা হয়। তাদের চোখ আগে মড়ার দিকে, তার পরে জ্যান্তদের উপর। একটা অশুভ ভয়ে ভালো-মন্দ কিছু জিগ্যেস করে না। দূরে গিয়ে পিছু ফিরে তাকায়, আর চলে যায়।

তার পরে মাঠ থেকে অন্ধকার উঠে আসে, সেই দূরে আকাশ-ঠেকানো দাগের কাছ থেকে, আর উপরেও উঠতে থাকে, যে-কারণে কি না, বিন্দুর গলায় দড়ির পরেও, শ্মশানযাত্রার পরেও আবার আকাশে তারা ফোটে। যেমন পরশু রাত্রে ফুটেছিল, কাল ফুটেছিল, আর মানুষেরা সংসারে তেলের বাতি জ্বালায়, কেন কি না, সেই তার বড় মজা, অমাবস্যার রাত্রে হ্যাজাক জ্বালিয়ে সে যাত্রাপালা করে, পাড়ার খাদন রানী সাজে, চামুণ্ডার পূজারী মুখুজ্জা রাজা সাজে, গদাই বায়েন তখন ঢং করে ঘণ্টা বাজাত, লোকেরা সাজঘরের দিকে ফিরে তাকায়। সাজঘরের আঁতুড় থেকে, আসরের মাঝখানে তার জীবন-বৃত্তান্ত, মাথায় উপরে হ্যাজাক, দিনের মতন আলো। এই কথা, মানুষের হাতে তেলের বাতি, বাতির ছায়ায় তার নজর নাই। গদাই ভাবে, অসার বাতি, অই বিন্দু, সকলই বড় অন্ধকার। এই দেখ, কেতু বাতি জ্বালায়। কেতু কিছুই ফেলে আসে নাই।

বাতি জ্বলে, বলদের ঘাড়ে জোয়াল চাপে, তার পরে, 'আর কী-ই-বা বলি, কিছু বু'ইতে পারলাম না। হট্‌ হট্টা !'...

গাড়ি চলবার আগেই কেতু জোয়ালের সামনে আগ বাড়িয়ে বাঁশ বেঁধে তাতে বাতি ঝুলিয়ে দেয় ! সে সামনে বসে, পিছনে গদাই। গদাই বিন্দুর মড়া ছুঁয়ে থাকে। তেত্রিশ কোটি দেবতা কুললো না, তার ফাঁকে আবার অপদেবতা হে, মন জানো, গদাইয়ের তাতে প্রত্যয় নাই। কিন্তু এখন যে সেই ঝুঁটি-বাঁধা পায়ে-মল-ঝমঝমানো বায়েনের উঠানে তার ন্যাংটা খুকিটার মূর্তি ভাসে গ। মা বাপ নারকেলের মালায় চুকচুক চুমুক দেয়, বেটি ঘুরে ঘুরে নাচে, বাপের ঢাকের বোল বলে, 'নাই কুরকুর দাদাভাই, হাতায় মাথায় গজা খাই। ঢ্যামনা চলে দুই মুখে, ঢোঁড়া দেখে ব্যাঙ হাঁকে।' তারপর বাপের হাত ক্যানে মায়ের গায়ে, ধপাস করে মাঝখানে ঝাঁপ, 'মাকে খালি আদর, আমাকে নাই, গদাই বায়েন দূরছাই।' তখন বিন্দুর মায়ের মুখে রোষ, 'আ মুখপুড়ি, মুখে নাতি, ভর সাঁজে দূরছাই করিস।' ভর সাঁজে ঘরের মানুষকে অমন বলতে নাই। অই, এই সকলই অন্ধকারের মজা, আহা, অবুঝ বায়েন সোহাগী পরিবার, অবোধ শিশু মা গ। আমি দেখতে পেলাম না, ঘরের বাতায় যখন দড়ি পরালি, তখন তোর চোখে কেমন ধকধকানি আগুন। অই বিন্দু, তখন তোর মনের ভিতরে বাতি জ্বলছিল কি না, আমি জিগ্যেস করি। অ মা, মনে বাতি জ্বললে মানুষের কেমন হয় ,আমি জানতে পেলাম না। আমার সকলই অন্ধকার।

'হো ই শালা !' কেতু গলা ফাটিয়ে, যেন ভয় পেয়েছে, ততটা জোরে হাঁক দেয়, আর হাতে লাঠি তোলে।

হ্যাঁ, গদাই আগেই দেখতে পেয়েছে, অন্ধকার ছায়া-ছায়া মূর্তি, চকচক চোখ জ্বলে। গন্ধে পিছন ছাড়তে পারে না, শিয়ালরা সঙ্গ নেয়। কিন্তু এ মহাশ্মশানের ভোগ, তোরা দূরে থাক গ। এ বিন্দুর মড়া, মনেতে যার বাতি জ্বলেছিল। তবে এই কথা, যার ভোগের হোক, আহার চায়, জীবসকল সরতে চায় না। শিয়ালের ক্ষুধায় প্রত্যয় যায়, তার তেত্রিশ কোটি দেবতা নাই, তার উপাস নাই, 'মন তুমি কর দেবের অন্বেষণ, দেবে ভজে দেখ সকল জীবন' এইরূপে মজায় মজে না সে। ওহে মানুষ, তোমার হাতে কী ধন আছে, তোমার এত কেন অহংকার। তেলের বাতিতে তুমি শিয়াল দেখতে পাও, তাই কি হে !

কেতু বলে, 'শালাদের বড় নোলা।'

গদাইয়ের গলায় সুর নাই। তবু গানের মতন করেই, জাতের গান বলে উঠল, কেন কি না, তাদের জাতে মরণে আনন্দ করা বিধি। কিন্তু তা হয় না, ছেড়ে গেলে দুঃখ হয়, তবু জাত গড়নদারের বিধি এমন, কেননা : 'ওহে, আজ কী সুখের দিন দেখ, পুণ্যমান আপন ঘরে যায়। জন্মিয়ে পাপ শত দুঃখ দেহে মনে নিরবধি রয়॥'

কেতুর চোখে যেন খোয়ারির ভাব, একটা ভয় অবুঝ মতন চোখে গদাইয়ের

দিকে তাকায়। রক্তে ঝলক নাই, সমান চেতনও নাই, এমন ভাব কেতু বুঝি ভাবে, গদাই পাগল হয়েছে, তাই গান করে। না অই গ, কী বলবে গদাই, তার যেন বুকের নাড়ি ছিঁড়ে পড়ছে, কেন কি না, মনে হয়, তার বুকে একটা বাতির আভাস। তার মনে যেন বাতি জলবে, অই মা বিন্দু, বাতি আমি সইতে পারব ক্যানে?

এই সময়ে, দূরে, মাঠের অন্ধকারে, সেই ডাকিনীর হাসি বেজে ওঠে, খিলখিল খিলখিল খিলখিল। উত্তর দিক থেকে পশ্চিমে যায়, পশ্চিম থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পুবে, যেন এই মহাশ্মশানযাত্রাকে পাক দিয়ে দিয়ে বাজে।

'হে বাপ।' তবু বাপ বলে কেতু, সংসারের এক রব। ভয় পায় ঘোবা, গদাইয়ের গা ঘেঁষে আসে।

গদাই বলে, 'ভয় পাস না, ওরা শিয়াল।'

'জানি, ভয় পাই না। শালারা কী খারাপ ডাকে, হুককো হুয়া দে না ক্যানে?'

ভয় পায় না কেতু। এই কথা বলে, হুককা হুয়া শুনতে চায়।

গদাই বলে, 'কাম।'

'কাম?'

'অই, কাম। শরীলে কাম হলে এমন ডাকায়।'

'দেখ দিকিনি, ডাক বদলে যায় গা।'

মানুষের কি যায় না, গদাই ভাবে।

কেতু আবার বলে, 'অবিশ্যি, এক কথা, ওদের লজ্জা নাই।'

মানুষের আছে, মানুষের সংসারে লজ্জা আছে, অই আঃ, মানুষের সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার লজ্জার ভূষণ কেমন দেখ হে তার গায়ে। মানুষের কামে লজ্জা আছে, মানুষে বলে। ওহে কাম, তুমি সাক্ষী, তুমি মানুষকে চেন। তার কি সওয়াল জবাব দেখ, হাকিমের এজলাসের বাইরে, তাকে দেখে আর চেনা যায় না বলে সে তোমাকে দমন করে। অই, সে দু দিন অন্ন ত্যাগ করে বলে, ক্ষুধাকে দমন করি হে। আঃ মানুষের কত অহংকার গ। অ মা বিন্দু, আমার বুকে একটু হাওয়া নাই, আমি যে একটা বড় করে নিশ্বাস ফেলতে পারি না। আমার চোখের ভিতরে কি একটু জলের পাত্র নাই। তবে এক কথা, আমার কেন ভয় লাগে, কেন কি না, পাছে আমার মনে বাতি জলে। মানুষের সে কেমন দশা, আমি জানি না। আমার সকলই অন্ধকার।

কেতু আর গা ছোঁয়া থেকে সরে না। গাড়ি বলদের মর্জিমতন চলে, তবে মর্জি ওদের ভালো। শ্মশানযাত্রায় কোন বিঘ্ন নাই। দূরে, দূরান্তে, থেকে থেকে সেই খিলখিল হাসি বাজতে থাকে। কখনো, কাছেপিঠেও বেজে ওঠে। যেন দশ দিকে বেজে ওঠে, ঊর্ধ্বে অধঃও বাকি নাই। তবু, ভোজের গন্ধে কাতর, পেটে যাদের ক্ষুধা, তাদের ছায়া বাতির আলোয় আচমকা দেখা দেয়। অন্ধকারে চোখ জলে চকচক করে। ক্ষুধা অবুঝ, সে কিছু মানতে চায় না। আহারের পিছন ছাড়তে

পারে না।' একদল পিছিয়ে যায়, আর-একদল আসে। রাত্রি ক্ষয়ের দিকে যায়। গাড়ি এখন সোজা পুবে চলে, ওদিকে গঙ্গা, যার পাড়ে মহাশ্মশান বিরাজ করে। মহাশ্মশান, কেন কি না, তার আগুন কখনো নিভে না। তার ভোগ কোনদিনের তরে বাদ যায় না।

আঃ, বিন্দু চললি মা, অন্নের ঘরে তোর যাত্রা ছিল, আমার সুদের আশা মিটিয়ে গেলি না, নাতির মুখ দেখা হল না। অই, মা গ আঃ, আমার বুকে বড় ধোঁয়া, আগুন কে উসকায়। আমার সকলই অন্ধকার।

'ও হে বাপ।'

ঘর করতে এক ডাক, কেতু ভুলতে পারে না। গদাই বায়েনের সকলই অন্ধকার। বাতি নাই, তাই বাপ মা পুত্র কন্যা, সকলই অসার।

'কোথা দিয়ে কী হল, বুঁইতে পারলাম না গ। ভৈরবের কোণেব পাড়ে আসবে বলেছিল।'

ভুলতে পারে না কেতু, কেন কি না, ভৈরবের কোণের পাড়ে উপাসী আত্মা পড়ে রয়েছে। মানুষের কি অহংকার, তার শোক উপাস ভাঙবার মুখ চেয়ে। সে সাঙা কি বিয়া, গদাই জানে না, কেতু আবার ভৈরবের কোণের পাড়ে যাবে।

॥

এখন রাত্রির ক্ষয় আকাশে, দেখ তার গাঢ় বর্ণ কেমন ফ্যাকাসে ধরে যায়, যেন মরে, আর দিনের রক্ত কেমন ফিনিক দেয়। জন্মের লগ্নে লাল, পরে প্রকৃত বরণ, এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই। দিনমানের দেহ বড় হলে, সে রৌদ্রমান।

গদাই সেই গত সন্ধ্যা থেকে বিন্দুর পাশে, কাছছাড়া হয় নাই। বলদ দুটোর মর্জি ভালো, অনেক পথ তারা ভেঙেছে, যে-কারণে সকালে আর কেতু তাদের দাঁড় করিয়ে খেতে দেয় নাই। মাটিতে বালি চিকচিক দেখা দিয়েছে, গঙ্গা দূরে নয়, মহাশ্মশান কাছে। কেতু কথা বলে, অথচ তার চোখ কুঁচফলের মতন লাল, আর পাতা ভারি, কেননা, যোবাটির ঘুম আসে। এখন তার কথার ভাষ্যি নাই, আড়-মাতলার মতন বকে। কিন্তু গদাইয়ের কোন সাড়া নাই। গদাইয়ের নিজের মনে হয়, তার চেতন নাই। তার কী এক দশা হয়েছে, মনে হয়, তার চোখের স্থির তারা দুখানি এখন কিছু দেখছে, আর ভর হয়েছে। এখন তার ধুলামাখা ফাটা ঠোঁট দুখানি কেবল নড়ে ওঠে। বলে, 'এই দেখ হে, আমার বুঝি বাতির দশা।' কেন কি না, এখন মন আর চিন্তা করে না। এখন যেন তার লক্ষভেদের নিশানা। বুকের ঘরে হাওয়া আছে কি নাই, চোখের পাত্রে জল আছে কি নাই, এইসব ভাবনা কোথায় হারায়, গদাই বুঝতে পারে না।

মহাশ্মশান দেখা দেয়, চরজাগা গঙ্গা, ওপারে মুর্শিদাবাদ। শ্মশানের বাইরে গাড়ি দাঁড়ায়। মাছিরা আবার বিন্দুকে ঘিরে ধরেছে। অই, হাভাতেরা, আর কতক্ষণ। কেতু বলদ দুটোকে জোয়াল-ছাড়া করে। তাড়াতাড়ি খেতে দেয়। গদাই একবার বিন্দুকে ছেড়ে বলদ দুটোর গায়ে হাত বুলায়। শ্মশানবাসীরা আসে পায়ে পায়ে,

খোঁজখবর নেয়, কে মরে, কে বয়ে নিয়ে আসে, মরে বা কেন। কেন কি না, তুমি আপন হাতের রক্ত লুকিয়ে কাউকে পুড়িয়ে যাও কি না, সে খবর কে রাখে। তবে কি না, সদরের বাবুরা একখানি কাগজ গদাইকে দিয়ে দিয়েছে, যদি পোড়াবার দিক হয়, তবে কাগজখানি দেখাত হবে। গদাই তাই কোমরের কষি থেকে কাগজখানি বের করে। কেতু তাদের সকল ঘটনা ব্যক্ত করে। সে যে ভৈরবের কোণের পাড়ে বসে ছিল, সে-কথাখানিও বলে, আর, 'কী বলব, কিছু বুঁইতে পারলাম না' এ-কথা এখন আরো বেশি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলে। শ্মশানের ঘরবাসী, ঘরনী, ডোম ডোমিনী, আঃ কী দেখ, হুস্ হুস্ নিশ্বাস ছাড়ে, চুকচুক আওয়াজ দেয়। আর কেতুর ঘাড় জোরে জোরে নড়ে, কেন কি না, এখন তার প্রত্যয় হয়, 'আর বুঁইতে পারব না হে।' তারপর কেতুর কোমরের গোঁজা থেকে পয়সা বার হয়, ডোমিনী হাত বাড়িয়ে নেয়, জিভে জল টানে, বলে, 'হুঁ, দু-দিন হয়রান টুস মদ না হলেঁ্য কি চলে।'

গদাই বিন্দুর উপর থেকে চোখ সরাতে পারে না। রাতের ঠাণ্ডায় এক রকম ছিল, মড়া এখন চাটাই ফাটিয়ে ফেলতে চায়, এত ফুলেছে। তবু, অই দেখ, মাথাখানি। তেমনি, সিঁথিতে সিঁদুর, সধবা মেয়েটি, পেটে কিছ ধরতে পারে নাই। কিন্তু এখন গদাইয়ের শোক নাই, কোন ভাবনা নাই, মন চিন্তা ছাড়া, এই কি বাতির দশা না কি গ। সে বিন্দুকে বুকে নিতে যায়। মা গ, এই ত্বাখ এখন আর কষ্ট নাই। কেতু এসে তাড়াতাড়ি গদাইয়ের সঙ্গে মড়া ধরে। ডোমিনীর গল্প তবু ফুরায় না, 'ত্থাখ ক্যানে, ই মহাশ্মশানে কত সাধুপুরুষ আছেন, উয়ঁারা কালীর সাক্ষাৎ ছেল্যা বটেঁ, ডাকিনীর সঙ্গে কথাবাত্তা করেন।' অই, আঃ, মানুষের কি অহংকার, তেত্রিশ কোটির সঙ্গে তার ওঠা-বসা। ধুমুচিতে সে দিয়াশলাই জ্বালে, সেই তার বাতি। অ মা, আমার বাতির দশা অন্যরকম দেখি।

ডোমের সঙ্গে চিতা সাজায় গদাই। কৃপণতা যেন না হয় হে, আরো বেশি কাঠ দাও। কাঠওয়ালার কড়ি গদাই ভিটে বিকিয়ে এনেছে। কেতু বোঁচকা খুলে নতুন কাপড় বার করে, গদাই আপন হাতে বিন্দুকে পরায়। শাওনে ভিজা দিনে, এক্শ বছর আগে, যেমনটি মেয়ে এসেছিল, তেমনটি সব মুক্ত করে নতুন কাপড পরায়। নড়নড়ে গলাটি এখন অনেক ফোলা। তবু গলায় দড়ির দাগে রক্তের রসানি। কেতু তখন মখ ফিরিয়ে নেয়, আর-একবাব বলে, 'কিছু বুঁইতে…।'

বিন্দুকে আপন হাতে চিতায় শোয়ায় গদাই, মহাশ্মশানের দিগন্তরে তার নজর নাই। ডোমিনী বুক খুলে ছেলেকে খাওয়ায়, লোহার বাটি মুখে তুলে মদে চুমুক দেয়। 'মায়ের মুখাগ্নি করি।' গদাই চিতায় আগুন দেয়, আর তার মুখখানি দেখ, মায়ের কোলে শোয়ানো ছেলে।

কেতুর দু হাতে পাত্র, গদাইকে দেবে, নিজে খাবে। গদাই ডাকে, 'অই কেতু, আয়।'

' কেতু কাছে যায়, গদাই তার কালো বুকখানিতে হাত রাখে। কেতুর চোখে জল আসে, বলে, 'কিছু বুঁইতে পারলাম না।'

গদাই বলে, 'আমি পেরেছি, কেন কি না, পাপ চাপা থাকে না।'

'পাপ !' কেতুর অবোধ শিশুর মতন চোখে আবার খোয়ারি ভাব দেখা যায়।

গদাই বলে, 'অই, হ্যাঁ।'

'কি পাপ।'

গদাই আগুনের বড় বড় জিহ্বার ভিতর দিয়ে বিন্দুর দিকে তাকায়। ফাল্গুনের কাঠ, তার ধোঁয়া, গড়িমসি নাই। তার ঠোঁট নড়ে, 'অ মা, দাঁড়া আমি যাই।' সে আগুনের জিহ্বার মধ্যে ঢুকে যায়, বিন্দুর পাশে শোয়।

কেতু চিৎকার করে, 'অই বায়েন হে, ই কী পাপ, তুমি কা কর গ।'

গদাই বলে, 'আঃ অই, আগুন কি শীতল গ মা, বাতি কি সোন্দর।' তার সবাঙ্গে আগুন লাগে। কেতু, ডোম, ডোমিনীর ডাক তার কানে যায় না। বিন্দুর পাশে শুয়ে সে হাত বাড়িয়ে আগুন মাখে, যেমন জল ছিটিয়ে খেলা করে। বলে, 'আঃ, বাতি কি সোন্দর, মা, অন্ধকারে দেখতে পেলাম না, কিষ্টোদাসের ঘর থেকে অন্ধকার গিলে পচীর ঘরে গেলাম। পচীর আঁধার ঘরে তুই কেন ছিলি। আঁধার গিলতে গিয়েছিলি, আঁধারে তোকে খেয়েছিল, অ মা গ, বাপবেটিতে আঁধার খেয়ে মরেছি, আঁধারের স্থখে আপন রক্ত চিনি নাই। পচী কোথায় গেছিল, কেতু ভৈরবের কোণের পাড়ে, আপন রক্ত চিনি নাই। ও বিন্দু, আঁধারের ঘোরে তুই ভৈরবের কোণের পাড়ে ছিলি, বাপ চিনিস নাই। আঃ গদাই যখন কালা স্থখে পচীকে ডাকে, তখন সাপের ছোবল লাগে, বিন্দু বলে, "অই গ, তুমি বাপ।" আঃ কী আঁধার গ···। বিন্দু, এবার গলার দড়ি খোল্।'···

গদাই এখনো টের পায়, চিতার আগুনের চারপাশে, মানুষের ছায়া পাক খায়, ডাক ছাড়ে। অই, আগুনের পাশে, পোকা ঘোরে নাকি। 'আঃ কী শান্তি, বিন্দু, এবার তুই বাবা বলে ডাকলি।' গদাই যেন শোনে 'বাপ গ, বাপ !'···গদাই স্থখের আগুনে গলে।

মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

সামনের-রাস্তাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। সরু রাস্তা, দুপাশে ঘিঞ্জি বস্তি। রাস্তার ধারে পানবিড়ির দোকানপাট। দক্ষিণে জেলেপাড়া, উত্তরে মালীপাড়া। মালীপাড়ায় মালী আর নেই। এখন নামটি বেঁচে আছে। ভাল কথায় লোকে বলে খারাপ পাড়া। মফস্বলের ছোট শহর হলেও বেচা-কেনা হাট-বাজার—বেশ জমজমাট শহর।

মেয়েমানুষটি যে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ওইখান থেকে মালীপাড়ার শুরু বলা যায়।

পৌষের দুপুর। দেখতে দেখতে রোদ কাত হয়ে গেছে কখন। পাড়াটার পুবের বাড়ির চালাগুলি পেরিয়ে কোঠাবাড়ির মাথায় ঠেকেছে রোদ।

মেয়েমানুষটির দরজার মাথায় একটি ছোট সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে। লেখা আছে, 'শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী, কীর্তন গায়িকা। ভিতরে অনুসন্ধান করুন।'

দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণভামিনী নিজেই। মাজা মাজা রং, দোহারা গড়ন। মধ্য-ঋতু আশ্বিনের নিস্তরঙ্গ ঢলো ঢলো শরীর। বয়সটা অবশ্য গিয়ে ঠেকেছে তলে তলে আর একটু দূরে। দিনের হিসেবে আশ্বিনের দিন কাবার হয়ে অগ্রহায়ণের একটু শীত ধরেছে সেখানে। একটু রাশভারি, দলমলে কৃষ্ণভামিনী। কপালের সামনে, পাতা পেড়ে চুল এগিয়ে দিয়েছে। সিঁথির সিঁদুর সামান্য। ডাগর চোখে এখনো সজাগ চাহনি, খরতাও আছে। কালো শাড়ি পরনে, গায়ে জামা নেই।

মুখে পান টিপে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণে। চোখে ঠোঁটে রাগ রাগ ভাব। নাকছাবিটিও নড়েচড়ে উঠছে নাকের পাটায়।

পুব কোলের কোঠাবাড়ির বারান্দা থেকে একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়িয়ে আছ যে কেষ্টদিদি?'

কৃষ্ণভামিনী সেদিকে না তাকিয়ে বলল, 'দেখছি।'

কাকে?

মরণকে।

মেয়েটি হেসে বলল, 'বুঝিছি। তোমার খোলঋষিকে তো? তা সে মিনসেকে তো দেখলাম, একটু আগে ভেঁপু ফুঁকতে ফুঁকতে, রিক্‌শা চালিয়ে একটা লোক নিয়ে গেল পাড়ার মধ্যে।'

কথা শেষ হতে না হতেই হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিক্‌শা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণভামিনীর দরজায়। রিকশায় যাত্রী নেই। রিক্‌শাওয়ালা নেমে একটু অপ্রতিভ মুখে হাসল কৃষ্ণভামিনীর দিকে চেয়ে।

কালো মানুষ। পেটা পেটা শক্ত চেহারা। বাবরি চুলও কালো। গোঁফ দাড়ি

কামানো মুখ। এসব মানুষ একটু বয়সচোরা হয়। ধরা যায় না কিছু। কালো মুখে ধুলো লেগে রুক্ষ দেখাচ্ছে। সন্ত রিক্‌শা চালিয়ে ফুলে উঠেছে হাত পায়ের পেশী। অপ্রতিভ হ'য়ে হাসলে তাকে বোকা দেখায়।

ভ্রূ বাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণভামিনী, 'ক'টা বেজেছে ?'

সে বলল, 'এট্টুস্ দেরি হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণভামিনীর রাগ চড়ল তার কথা শুনে। বলল, 'রিক্‌শা চালিয়ে খাবে, ওই চালিয়ে মরবে। ভগবান তোমার হাতে কেন শ্রীখোল দিয়েছিল, বলতে পার ?'

অন্য মেয়েটির কথানুযায়ী বোঝা গেল, লোকটি কৃষ্ণভামিনীর খোলুস্কি অর্থাৎ খোল বাজিয়ে। নাম গগন। হেসে বলল, 'ভগবানের বিষয় বলে কথা ? কী যে কে হয়, কেউ জানে ? পয়সার কাজটা আমাকে করতে হবে তো ! না, কী বলো গো।'

বলে পুবের বারান্দার মেয়েটির দিকে তাকাল। কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণচোখের তারা জলে উঠল দপ্‌দপ্ করে। চতুর্থ ঋতু অগ্রহায়ণেও বৈশাখের বিদ্যুৎবহ্নি। তীক্ষ্ন গলায় বলে উঠল, 'ও আবার কী বলবে ? আমিই বলছি, না পোষায় ছেড়ে দিলেই পার। আমার কি শ্রীখোল বাজিয়েব অভাব হবে, না তোমাকে পয়সা আমি দিতে চাইনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী মান, লোককে, ন্যাকামো করে তবে মরতে আসা কেন এখানে ?'

বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণভামিনী। দাঁড়িয়েছিল রানীর মত, ফিরে গেল ক্রুদ্ধা রাজেন্দ্রানীর মত। দরজাটির পাল্লা নেই। নইলে বন্ধ করে দিয়ে যেত।

বিমর্ষ হেসে গগন ফিরে তাকাল পুবের বারান্দার দিকে। সে মেয়েটি, গগনকে নয়, কৃষ্ণভামিনীকে ভে'চে চলে গেল।

বাড়ির দরজাটি বড়। সেকেলে বড়লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা নেই। পার্টিশান আর দরজার মাথাটা রয়ে গেছে। রিক্‌শাটা ঢুকিয়ে দিল গগন উঠোনে।

ভিতরে তখন কৃষ্ণভামিনী হাঁক দিয়েছে, 'রাধি, ও রাধা, কোথায় গেলি ?'

রাধা ছুটে এল ঘরে। ডাগর-সাগর রাধা, কটা রং। ছোট ছোট চোখে ডাগর চোখের ঢুলুনি। ঠোঁট দুটি বড লাল একটু স্থূল। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে হারমনিয়াটা টেনে নে।'

রাধা বলল, 'খোলুস্কি খুড়ো এল না মাসি ?'

কৃষ্ণভামিনী দেয়ালের পেরেক থেকে খঞ্জনি জোড়া পেড়ে ধমকে উঠল, 'তুই বোস্ দিকিনি। শ্রীখোল ছাডাই হবে। পোষ মাসের আর ক'টা দিন মাত্তর বাকি। নবদ্বীপ থেকে বাবাজীর চিঠি এসে পড়েছে। দোসরা মাঘ বেরুতেই হবে। আমার কাজ আছে।' রাধা চোরা চোখে মাসির মুখ দেখে আর কথা বাড়াল না। ওই মুখের কাছে মুখ বাড়ানো যায় না।

প্রতি বছর মাঘ মাসেই কৃষ্ণভামিনী নবদ্বীপে যায়। মাঘ মাস ভোর, ভোর-সকাল নবদ্বীপে, আখড়ায় আখড়ায় মন্দিরে মন্দিরে কীর্তনের আসর বসে। নবদ্বীপের চেহারা বদলে যায়। স্বয়ং বিষ্ণু অবতরণ করেন। লোকে মাঘে যায় প্রয়াগে, বৃন্দাবনে,

মথুরায়। ত্রিবেণীতে কল্পবাস করে। আর নবদ্বীপে আসেন নামকরা মহাজনেরা, মহাশয় বৈষ্ণবেরা। ত্রৈলোক্য আচার্য, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন মল্লিক, এই সব বড় বড় পণ্ডিত, লেখাপড়া জানা, বৈষ্ণব গায়কেরা আসেন। পদ রচনা করেন, ভাঙেন গড়েন, পুঁথি নিয়ে বসেন বড় বড়। আসর হয়, এক-একদিন এক-এক আখড়ায়। সে আসরে স্কুল-কলেজের ছাত্র মাস্টারমশাইরাও ভিড় করেন এসে। নবদ্বীপের ওই সব আসরে কৃষ্ণভামিনীর বড় আদর। মহাশয়েরা স্নেহ করেন মেয়ের মতো। বাবাজীরা তাকিয়ে থাকেন সতৃষ্ণ নয়নে। ভক্ত অভক্ত জনতার রক্তেও আখরের দোলা লাগে।

পানটি নেশার জিনিস। নবদ্বীপেও ভোরবেলা স্নান ক'রে পানটি মুখে দেয় কৃ-ষ্ণ ভামিনী। ঠোঁট রক্তরেখায় বেঁকে ওঠে। ধোয়া নীলাম্বরী পরে, আঙুল তুলে গায়,

বঁধু, তোমার দেওয়া গরবে,
তোমার গরব টুটাব হে।

নবদ্বীপে না গিয়ে পারে না কৃষ্ণভামিনী। আজকাল, শহরে বাজারে আর তাদের বড় একটা ডাক পড়ে না। বায়স্কোপ থিয়েটার, রেডিও রেকর্ডে অনেক কীর্তন শোনে লোক। শত শত মিঠে গলার বাহারে পদের গান। তা ছাড়া দিন গেছে বদলে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ ও বয়সের ধারায়, যুগটা পাশ কাটিয়ে গেছে অন্যদিকে। পাড়াতে তাদের ডাকতেও নাকি অসম্মান। সাইনবোর্ডটা ঝুলানো আছে এক যুগ ধরে। ওইটি দেখে কোনদিন কেউ ডাকতে আসেনি তাকে। সাইনবোর্ডটির বয়স বেড়ে গিয়ে টিন বেরিয়ে পড়েছে।

তাই নবদ্বীপ যেতে হয়। সেইখানে কিছু বায়না পাওয়া যায়। এখনো দূর জেলা থেকে ডাক আসে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, আরো তলায় মেদিনীপুর, উঁচুতে মানভূম—প্রবাসের বাঙালীরা ডাকেন কখনো সখনো। কীর্তনের খোঁজে সবাই নবদ্বীপেই আসেন এখনো। কৃষ্ণভামিনী কাছে না থাকলেও বাবাজীরা ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় এখানে। না গিয়ে উপায় কী!

বছর দুয়েক আগে, রাধামাধব আখড়ার রাধহরি বাবাজী একদিন গানের শেষে এসে বলেছিল, 'কেষ্ট, আচাখ্যি মশাই বলছিলেন, এবার তোমার আখেরটা একটু দেখতে হয়।'

ধক্ করে উঠেছিল কৃষ্ণভামিনীর বুক।—'কেন বাবাজী? গান জমেনি?'

বাবাজী বলেছিল, 'রাধেমাধব! এমনটি আর কার জমে গো। আচাখ্যি বলছিলেন, কেষ্টর বয়স হল। আখেরের কিছু না করলে শেষ বয়সটা…' একটু থেমেই আবার বলেছিল, 'তোমার কথা সবাই ভাবেন। তাই বলছিলাম, সব গুটিয়ে-সুটিয়ে একেবারে নবদ্বীপেই চলে এস। শেষ বয়সটা রাধামাধবের সেবা করে—'

ধক্‌ধকানিটা থেমেছিল, যন্ত্রণাটা বুকের কমেনি কৃষ্ণভামিনীর। শেষ বয়স! যে কথাটি অনেকবার তার রক্তস্রোত বলে গেছে কানে কানে, আজ সকলে মিলে বলছে সেই কথা। সময় হয়ে এসেছে। বেলা যায়, বেলা যায়, কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল, শুধু তার

রূপ নয়, আরো কিছু আছে। বিলাপের দুই জায়গায় স্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল। বুকভরে দম নিয়ে, গলার শির ফুলিয়েও শেষরক্ষে হয়নি।

বাবাজী আরো বলেছিল, 'গলার আর দোষ কি বল। যেখানে আছ, সেখানে থাকলে অনাচার তো একটু হবেই।'

অনাচার অর্থে নেশা-ভাং আর শরীর পীড়নের ইঙ্গিত করেছিল বাবাজী। একেবারে মিছে বলেনি। কিন্তু নবদ্বীপে এসে থাকলে কি সে সবের কিছু কমতি হবে? একে তো সে-আশ্রয় হবে পরের আশ্রয়। কৃষ্ণভামিনীর তাতে বড় ঘৃণা। আর, রাখহরি বাবাজী যখন ভালোবাসবে, তখন? অমন ঢুলঢুল চোখ বাবাজীর, কেষ্টকে ভাল না বেসে তার উপায় কী।

সে ভালোবাসার আশ্রয় তো সইবে না তার।

তবে আখেরের ব্যবস্থা করেছিল কৃষ্ণভামিনী। মালীপাড়ার মেয়ে সে, নিজের জীবন তাকে শিখিয়েছে অনেক কিছ। রাধাকে পেয়েছিল সে আটবছর বয়স থেকে। আরো বারো বছর গাইয়ে পরিয়ে বড করেছে, গান গেয়ে, দেহ পণ্য ক'রে। কীর্তনে দীক্ষাও দিয়েছে অনেকদিন। মালীপাড়ার কারবার ছেড়ে দেয়নি পুরোপুরি। মেয়েটার রং-ঢং আছে। গলাটি একটু খর তবে মন্দ নয়। কিন্তু বড় মাথা মোটা। দিন রাত্রই সেজে-গুজে আছে। সন্ধ্যা হলেই উঁকি-ঝুঁকি মারবে এদিকে-ওদিকে। মালীপাড়ার মন্ত্র পড়ছে তো কানে দিবানিশি। এখন রক্তে বড় জ্বালা।

প্রথম দিকে শেখাবার অতটা চেষ্টা ছিল না কৃষ্ণভামিনীর। গত দু'বছর থেকে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে সে রাধাকে। তালিম দিচ্ছে চুলের মুঠি ধরে। গতবছর নবদ্বীপের বায়নার জায়গায় জায়গায় নিয়ে গেছল তাকে।

আখেরের ব্যবস্থা করেছে সে। কাউকে বলে দিতে হয়নি। তার গান, গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, তারও যে আখের আছে, সেকথা ভেবে কেন মন পোড়ে।

বঁধু পীরিতি করিয়া রাখিলে যদি,
অভিসার নিশি কাটে কেন।
না রাখিতে নিশি কাটে না যেন।

খঞ্জনিতে দুবার ঝুনঝুন করে কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, মানের গানটা ধর।'

রাধা উস্‌খুস্‌ করছে। এ-বাড়িতে আরো তিনঘর মেয়ে আছে। এ সময়ে তাদের কাছে বসে রাধা তাদের বাসরলীলার কাহিনী শোনে। বলল, 'কোন্‌টা?'

কালকে যেটা হয়েছে।

ভয়ে বলল, 'আমার মনে পড়ছে না মাসি।'

কৃষ্ণভামিনী রাগে জ্বলে উঠল। বলল, 'তা তো তোর মনে পড়বে না। চিরকাল হারোভাতারি তোর কপালে আছে, খণ্ডাবে কে।'

তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে গুন্‌গুন্‌ করে উঠল সে।

তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।

সখীর বচনে কমলনয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান।...

রাধা গান ধরতে না ধরতেই, গগন এসে ঢুকল। কৃষ্ণভামিনী চেয়েও দেখল না। রাধার ভ্রূ দুটি নেচে উঠল শুধু।

এ আসরে সে নিতান্ত বেমানান। ময়লা হাফশার্ট গায়ে, তালিমারা ফাটা ফুল-প্যাণ্ট পরা রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে কোন মিল নেই এ-ঘরের। এ-ঘরের সাজানো-গোছানো অল্পসল্প জিনিস, পরিষ্কার যুগলশয্যা, সব কিছুতেই বিপরীত।

দেয়াল থেকে খোলটি পেড়ে, কপালে ঠেকিয়ে একটু দূরেই বসল সে। কৃষ্ণ-ভামিনীর চোখের পাতা নড়ল না। কিন্তু খঞ্জনির রিনিঠিনি খোলের বোলে একাত্ম হয়ে গেল। রাধারও গলা ছাড়ল।

গগন লোকটি এ তল্লাটের নয়। বছর দশেক আগে, বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে, চলে এসেছে কৃষ্ণভামিনীর পিছনে পিছনে। কৃষ্ণভামিনী গাইতে গিয়েছিল সেখানে।

লোকটির পেছু নেওয়া নজরে ছিল তা'র। দেখেই বুঝেছিল, অন্তঃসারশূন্য গেঁয়ো বাউণ্ডুলে। ঘর-বউ জোটেনি কপালে। রেস্ত থাকলে একটু আশ্‌কারা দিত হয়তো কৃষ্ণভামিনী। মাগনা পীরিতে মন দূরের কথা, শখও ছিল না একটু।

লোকটি কয়েকদিন এদিক-সেদিক ক'রে হঠাৎ এসে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে এট্টুস্ খোল বাজাব ভাই।'

আজকে যেমন অপরাধীর মত হেসে এসে দাঁড়াল, সেদিনও তেমনি করে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কৃষ্ণভামিনীর শ্রাবণের খরস্রোত দেহে, আশ্বিনের ঢল বয়সের হিসেবে। চোখের পাতার নিঃশব্দ ঝাপটাতেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। ওদিকে আবার গগনের একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছিল। বলেছিল, 'আমার রং কালা, ট্যাঁকও কালা, একটু বাজাতে চাই খালি।'

বাজিয়েছিল। বাজিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। তেওড়ার ঢংএ ঠুংকী বাজাতে বাজাতে গোলাপী নেশার মত ঢুলছিল গগন। আর চোখ দিয়ে যেন চাটছিল কৃষ্ণ-ভামিনীকে। দেখে-শুনে ভামিনী রং ফিরিয়ে কালেংড়া সুরে গেয়ে উঠেছিল,—

মতলবে তোর মন ঠাসা,
ঘরের ভাতে কাগের আশা।
নাগর পথ দেখ হে ॥

গগন দমেনি। একমুহূর্তে থেমে তাল চড়িয়ে দিয়েছিল আড়খেমটার। এমন বাজিয়েছিল, পথ দেখানো যায়নি একেবারে গগনকে।

তারপর বছর চলে গেছে। নানান কাজ করে, গগন রিক্‌শা কিনে বসেছে এখানে। সারাদিনে দুটি কাজ এখন। রিক্‌শা চালানো, ওইটি পেটের। কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে খোল বাজানো, ওইটি শুধু শখ না আর কিছু, টের পাওয়া যায়নি দশ বছর ধরে। এখন কৃষ্ণভামিনীরও দরকার হয়ে পড়েছে তাকে। তবে, গগনের ওই

লালাঝরা চোখ দুটিতে কোন আশ্‌কারা দেয়নি সে। রিক্‌শাওয়ালার কাছে, কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী বেচতে পারে না নিজেকে। মাগনা মানিনী নয়, কৃষ্ণভামিনীর মান আছে।

মালীপাড়ার মেয়েরা ফুসলায় গগনকে, 'কী আশায় আছ? না হয় রিক্‌শাই চালাও, আর মেয়েমানুষ নেই এ সোম্‌সারে!'

আছে। কার ঘরে যাতায়াত নেই! তার রিক্‌শাওয়ালা বন্ধুরা বলে, 'ওরে শালা, কেষ্টভামিনীর মধু যে চলে যাচ্ছে বছরে বছরে। যারা খাওয়ার তারা খেয়ে নিলে। তোকে ব্যাটা পাকাচুল বাছতে হবে ভামিনীর।'

গগন বলে, 'তা জানি। চাকে মধু না থাক, মোম তো থাকবে। ভামিনীর পাকাচুল, সেও যে অনেক ভাগ্য।'

এই মরেছে, শালা কুত্তা নাকি রে।

গগন হাসে: মাথা গুঁজে সোয়াবি বয। তখন বোঝা যায়, তারো বয়সে শীতের বেলা লেগেছে।

কৃষ্ণভামিনী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মরণ! রিক্‌শাওয়ালা হলেই অমন নোলা হয।'

কথায় কথায় গগন দু-একবার ভামিনীর বাড়িতেই থাকবার প্রস্তাব করেছে। খাওয়াটা থাকাটা যদি এখানেই ব্যবস্থা হত, মন্দ হত না। ভামিনী উগচণ্ডী মূর্তি নিয়ে তেড়ে এসেছে, 'বেরো বেরো বেরো।'

*　　　*　　　*　　　*

রাধার ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে। ভামিনী খঞ্জনির খুন্‌খুন্‌ শব্দ থামিয়ে বলে, 'হল না। মুখপুড়ি, একটু হেসে গা। হারমনিয়া ছাড, খালি গলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা। আগে বল্‌—'

বলে নিজেই বলে, 'সখি, আমার মন নেই, কাকে বল। আমার চোখ নেই, কাকে দেখাও! আমি বধির, শুনতে পাইনে সই। তবুও ওইখেনে কে দেখা দেয়? কে, ও?

সখি, কেন কুঞ্জের ধারে দাঁড়িয়ে কালা,
ফিরে যেতে বল্‌।'

এদিকে গগনের হাত যেন অবশ। খোলে চাঁটি নেই। হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণভামিনীর দিকে। রুখে উঠল কৃষ্ণভামিনী, 'আ মরণ!'

মরবার আগেই খিচ্‌ খিচ্‌ করে খোল কথা বলে উঠল, 'ফিরে যেতে বল্‌।'

রাধা হাসে মিটমিটি করে। জোরে হাসতে ভয় পায়। মাসি গলায় পা দেবে যে!

আশ্চর্য! রাধা চোরা চোখে বিজলী হানে গগনকে। তার কটা রংএর শরীরের রেখায় বড় ঝাঁজ। নেশা করার মত স্থূল টকটকে ঠোঁট দুটিতে যেন মনে মনে কী বলে। দেখেশুনে ঘেন্না করে কৃষ্ণভামিনীর। ছুঁড়ির রুচি বলে কিছু নেই। গগনের

রকম-সকমও তেমনি। রাধার হাসিতে ঢুলে ঢুলে ঢোল বাজায়।

বেলা গেল। পৌষের বেলা, এল কখন, গেল কখন, কে জানে। এর মধ্যেই ঘরের মধ্যে মশার শানাই বাজছে। স্থির হয়ে বসতে দেয় না একদণ্ড। ঘরে ঘরে, ধোয়া মোছা, সাজাগোজা চলছে। বাতি জ্বলছে বারো-বাসরে।

গান শেখানো শেষ হল। গগন উঠতে যাবে। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'রাধি, রিকৃশওয়ালাকে জিজ্ঞেস কর, ওর খোলবাজাবার কত চাই।'

গগন বলল, 'খুব রেগে গেছ বাপু। দশ বছর যখন দেওনি, থাক। সবটা একসঙ্গেই দিও না হয়।'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'বাকি বকেয়া আমি ভালবাসিনে।' টান মেরে আঁচল নামিয়ে চাবির গোছা খুলতে খুলতে বলল, 'আর রাস্তার মানুষের সামনে, ছোটলোকের মুখে ছোট কথাও শুনতে চাইনে।'

কালো মুখে, হলদে চোখে গগনকে বোবা অসহায় জানোয়ারের মতো মনে হয়। মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, 'আচ্ছা বাপু, আর কোনদিন কিছু বলব না। এবার থেকে সময়মতো আসব।'

বলে না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। রিকৃশা বার করতে যাবে। দরজার পাশ থেকে রাধা বলল, 'চললে খোলুঞ্চি খুড়ো?'

গগন বলল, 'হ্যা-লো! তোর মাসীর যা রাগ!'

রাধা বলল ঠোঁট ফুলিয়ে, 'তা বলে আমি তো আর রাগ করিনি।'

গগন বলল হেসে, 'করবি কেন। তুই তো আর কেষ্টভামিনী নোস্! তা হ্যাঁরে, রাতে কেউ আসবে নাকি তোর মাসীর গান শুনতে?'

: আজ? হ্যাঁ, ওপারের মথুর ভটচার্য আসবে রাত দশটায়।

: থাকবে বুঝি রাত্রে?

: কী জানি। তুমি আসবে?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে রিকৃশা নিয়ে বেরিয়ে গেল গগন। রাস্তার উপর থেকে কে একজন শিস্ দিয়ে উঠল রাধার দিকে চেয়ে। রাধা হাসল। সালীপাড়া জমে উঠেছে শীতের সন্ধ্যায়।

জুড়িয়ে এল রাত দশটাতেই। শীতে আপাদমস্তক ঢেকে কোঁকাতে কোঁকাতে এল মথুর ভট্টাচার্য। তার পিছনে পিছনে গগন।

কৃষ্ণভামিনী সেজেছে। শান্তিপুরের নীলাম্বরী তার বড় প্রিয়। রংটি মাজা মাজা হলেও মানায়। মুখে স্নো-পাউডার মেখেছে, জামার গলাটি একটু বেশি কাটা। চওড়া ঘাড়ে ও গলায় বয়সের ঢেউ পড়েছে। ঢাকা পড়েছে একটু চওড়া বিছে হারে। পানরাঙানো ঠোঁট, পায়ে আলতা। ভট্টাচার্যকে দেখে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, ভটচাযমশাই।'

মথুর বলল বুড়োটে গলায়, 'অ্যাঁ? আসব? তা আসব। কিন্তু, তোমার সেই মেয়েটি, কী নাম তার? রাধা, হ্যাঁ, রাধা! আজ তার মুখে একটু ভাব-

সম্মিলনের গান শুনব। তোমার গান তো অনেক শুনেছি কেষ্টভামিনী।'

চকিত ছায়ায় এক মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণভামিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক শোনা হয়েছে, অনেক। গান শুনবে লোক, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দিন বুঝি আর নেই। ভাব-সম্মিলনের মিলন কোলাকুলির রস উপছে পড়বে না বুঝি আর তার গানে। পর মুহূর্তেই হাসল। পঞ্চম ঋতুর শীতার্ত শুষ্ক হাসি যেন। ভালো, ভালোই তো। সে আসল, রাধা যে তার স্বদ। তারই গান শুনুক লোকে। বলল, 'বেশ তো, শুনবেন, বসেন।'

মথুর বসল। ভূতের মতো বেমানান, তালি মারা প্যাণ্টটা পরে হাঁ ক'রে বোকা চোখে গগন তাকিয়েছিল ভামিনীর দিকে। চোখে চোখ পড়তে, চমকে খোল নামাল সে।

রাধা তখন অন্য ঘরে। ভামিনী বলল, 'বসুন, ডেকে নিয়ে আসি।' রাধাকে নিয়ে তখন অন্য ঘরে টানাটানি। ছাড়িয়ে নিয়ে এল ভামিনী। মথুর বলল, 'এস এস।'

পৌষ সংক্রান্তি গেল। উত্তরায়ণে বাঁক নিল সূর্য। সোনার মতো রোদে, ছায়া বেঁকে গেল একটু দক্ষিণে। দিনের ঘোমটা খুলতে লাগল একটু একটু ক'রে।

দোসরা মাঘ রাধাকে নিয়ে রওনা হল ভামিনী। গগনও এসে, ঢাকা বারান্দায় তুলে দিল রিকশা। শ্রীখোল নিলে কাঁধে। সেও যায়। না গিয়ে পারে না। বাজাবার বড়ো সাধ। দশ বছর ধরে নবদ্বীপে সেও চেনা হয়ে গেছে। কেষ্টভামিনীর খোলবাবাজী তার নাম হয়েছে। গগন বড় খুশি। আর, আজকাল অপরে খোল ধরলে একটু বাধ-বাধ লাগে ভামিনীর। গগনের সেখানে বেশ নাম। তবে, বেশিদিন থাকতে পারে না। পেট চালাতে হবে তো। দু'চারদিন বাদেই ফিরে এসে রিকশা নামায়।

মালীপাড়ার মেয়ে-পুরুষেরা বলে, 'কেষ্ট খেতে দিলে না বুঝি?'

গগন বলে, 'আমি কেন খাব?'

রওনা হল তারা। পাড়ার মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'মাগীর ঠ্যাকার দেখলে গা জ্বালা করে।' স্টেশনে গিয়ে ভামিনী দুটি টিকিটের টাকা দিল গগনের হাতে। গগন তিনটি টিকিট কেটে নিয়ে এল।

নবদ্বীপে আসর জমে উঠেছে সংক্রান্তির দিন থেকেই। সকলেই অভ্যর্থনা করল কৃষ্ণভামিনীকে। আখড়ায়, মন্দিরে, চেনাশোনা বাড়িতে। রাধাকে গত বছরই সবাই দেখেছে। গত বছর রাধা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে, রাধার কাছ ঘেঁষাঘেঁষির জন্য সকলেই বড়ো ঠেলাঠেলি করেছে। গগন খোলুক্কিকেও চেনে সকলে। রাধহরি বাবাজীর আখড়াতেই আস্তানা নিল ভামিনী।

মহাজন মশাইয়েরা এসে ঠাঁই নিয়েছেন এক-এক জায়গায়। আসরে দেখা হয় সকলের সঙ্গে। সকলেই ডেকে কুশল জিজ্ঞেস করলেন ভামিনীর।

পরদিনই গানের আসরে বসল ভামিনী। লোকারণ্য হল সেই আসরে। প্রথম দিন। সে কৃষ্ণ রাধা ভজন, খোল করতাল ভজন, মান্যগণ্য মহাজন গুরুজন ভজন। তারপর ধরল,

প্রভু না বাঁধিয়ে টানো,
কী যে টানে টানো
আমারে জনম ভরিয়ে টানো।
পীরিতি রশিতে বাঁধিয়া টানো।
টানো হে।
ধূলায় পড়ে, কাঁটায় ফুটে
রক্ত ঝরে, জ্বালায় পুড়ে,
মরিব, তবু টানো হে নাথ॥

অনেকক্ষণ গাইল ভামিনী। কিন্তু তেমন সাড়া শব্দ পড়ল না। নিজেকে বড়ো ক্লান্ত লাগল ভামিনীর। ঠোঁট শুকিয়ে উঠতে লাগল। চোখের কটাক্ষে সেই রং ফুটছে না। সুরের দোলায় দোলায় হাত উঠছে না তেমন করে।

এক ফাঁকে বাইরে এল। রাখহরি বলল, 'কী হয়েছে তোমার কেষ্ট?'

: কেন?

: গলায় যে তোমার বয়সা ধরেছে।

বয়সা? হেসে উঠল ভামিনী। বলল, 'এ বয়সে আবার বয়সা কি বাবাজী? সে তো ছেলেমানুষের ধরে।'

রাখহরি বলল, 'এ বয়সেও ধরে গো! গলায় তোমার দোআঁশলা জট পাকাচ্ছে কেন?'

দোআঁশলা-জট। আচমকা শীতের কাঁপ ধরে গেল যেন ভামিনীর বুকে। হেসে বলল, 'একটু চা খেয়ে নিতে হবে।'

রাখহরি ভামিনীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, 'থাক না। এবার না হয় থাক। তোমার রাধাকে গাইতে দাও। দেখা যাক কেমন শিখেছে।' রাখহরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভামিনীর রাঙা শুকনো ঠোঁট ও বেঁকে উঠল। কিন্তু গাইতে বলল রাধাকেই।

রাধা ভ্রূ তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাইল,

আমারে, অবলা পেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
বাঁধিলে পীরিতি ফান্দে।
অতি অভাগিনী কুট নাহি জানি
ফান্দ খোলে কি ছান্দে॥

গলা একটু খরো। কিন্তু কাঁচা গলায় চড়া সুরে, আর কাঁচা বয়সের কিশোরী

ঠমকে আসর গুনগুন্ করে উঠল। কোথায় ছিল আসরের এই হাসি ও আনন্দাশ্রু।

অন্ধকার চেপে আসছে কৃষ্ণভামিনীর মুখে। তবু হাসছে। শীত, বড়ো শীত। গুরগুর্ ক'রে কেঁপে উঠছে বুকের মধ্যে। কেন? চুলের মুঠি ধরে যাকে শিখিয়েছে, সেই রাধার গুণে বলিহারি যাচ্ছে সব। তার সুদের ঐশ্বর্য।

স্বয়ং মোহিনী, মল্লিক মহাজন আশীর্বাদ করলেন ভামিনীকে, 'বাঃ বেশ! শুধু আখেরের স্বার্থে এমনটি শিখুনো যায় না মা। তুমি, সত্যিকারের আখেরের কাজ করেছ।'

বড়ো সুখ, তবু মুচড়ে মুচড়ে ওঠে বুক। কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী আর নেই, আখেরের কাজ আছে। এমন মহাজন কেন হল না ভামিনী, যে সুদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

কেবল দুটো দিন গগন চুপচাপ খোল বাজাল। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখল ভামিনীকে। যতবার চোখাচোখি হল, তার হ্যাংলামো দেখে ভামিনী বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে নিল মুখ। মরলে ওকে হাড় ক'খানা চিবুতে দিয়ে যাবে।

দুদিন পরে, গগন বিদায় নিল। বলে গেল, আবার আসবে মাঘেই।

ভামিনী মনে মনে বলল, পাছ ছাড়লে বাঁচি।

তারপর গান চলল আখড়ায় আখড়ায়। রাধা এবার ভাসিয়ে দিল নবদ্বীপ। যা গায়, সবই মানিয়ে যায়। একদিন কৃষ্ণভামিনীরও যেত। যা করত, যা বলত, যা গাইত, তাই ভাল লাগত লোকের। খরস্রোতা কৃষ্ণভামিনীকে দেখছে সে রাধার মধ্যে। সবাই রাধার পিছনে পিছনে।

রাত্রে রাধাকে বুকে নিয়ে আদর করল ভামিনী। বলল, 'রাধি, আমার মান রেখেছিস্ তুই, মান রেখেছিস্।'

বলতে বলতে চোখ ফেটে জল এল। রাধা অবাক হল। একটু বিরক্তও। বলল, 'এ আবার তুমি কী শুরু করলে বাপু। ঘুমোতে দেও।'

ঘুমোতে দিল তাকে। নিজের হাতে ভালো করে কম্বল ঢেকে দিল। হয়, এমনটি হয়। এত জনে জনে, মহাজনে, সবাই মিলে চোখে-মুখে তাকে বন্দনা করছে। হবে না। এক সময়ে কৃষ্ণভামিনীরও যে হয়েছিল।

আসরে আর ভালো করে ভামিনীকে কেউ সাধেও না। রোজ গাওয়াও হয় না তার। তবু আসরে আসরে থাকতে হয়, বসতে হয়।

বায়না পাওয়া গেছে কয়েকটি। বায়নার সর্ত রাধা, তবে কৃষ্ণভামিনীকেও চাই। চাই বৈকি। সুদকে একলা ছাড়বে কী করে সে।

মাঘের শেষে এল আবার গগন। এসে দেখল, ভামিনীর চোখের কোলে কালি। মুখখানি শুকনো। চলতে ফিরতে পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। যেন এতদিনে সত্যি বুড়ি হয়ে গেছে সে। পা ছড়িয়ে বসে। তেমন সাজাগোজা

নেই। যেন মালীপাড়ার সুকী মাসী।

গগন বলল, 'শরীলটা তোমার খারাপ দেখছি যে।'

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ভামিনী, 'শরীলটা ছাড়া বুঝি আর কিছু দেখতে পাও না ওই মরাখেগো চোখে।'

গগন বলল, 'তাও দেখতে পাই।'

: কী দেখতে পাও?

: তোমার দুঃখু।

: মরে যাই আর কি! উনি এলেন আমার দুঃখু দেখতে, হুঁ!

তারপর হঠাৎ কী হল ভামিনীর। ভীষণ ক্ষেপে উঠল, বলল 'গতরখেগো মিন্‌সে, আর কবে ছাড়বে পেছন? ম'লে? তবে আগে মরি, তার পরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেও।'

গগন একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা তাই হবে, তুমি চুপ কর এখন।'

ব'লে সরে পড়ল।

মাঘ মাসের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে যাত্রা শুরু হল। গুটি সাতেক বায়না আছে। কৃষ্ণনগরে, চোত্‌খণ্ডে, রামপুরহাট, ধানবাদ, গোটা দেশটায় প্রায়।

সব জায়গাতেই সবাই ছুটে এল কৃষ্ণভামিনীর নাম শুনে। মুঠি ভরে পয়সা আর বাহবা দিয়ে গেল রাধাকে। তবে, কৃষ্ণভামিনীকেও বাহবা দিয়েছে সবাই। সে নইলে, এমন মেয়ে শাগ্‌রেদ আর কার হয়।

চোতখণ্ড অবধি সঙ্গে রইল গগন। ওখানেই কাছাকাছি তার জন্মভূমি। সে বিদায় চাইলে ভামিনী বলল, 'আগে বলনি কেন? আমার খোল বাজাবে কে?'

গগন বলল, 'পেটের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো আমাকে। ট্যাঁক যে ফাঁক।'

ভামিনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না হয় খেতেই দেব।'

হলদে চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল গগন, 'তা পারব না বাপু আমি। খোল বাজিয়ে যোগাড় ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।'

সেইদিনই বর্ধমান শহর থেকে জুটিয়ে দিয়ে গেল একজনকে। ভামিনী ঠোঁট উল্টে বলল, 'মুরোদ বড়ো মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আপদ কোথাকার! ও আবার খাবে খোল বাজিয়ে!'

পয়লা বৈশাখ ফিরে এল কৃষ্ণভামিনী আর রাধা। রোজগারে একটু ভাঁটা পড়েছিল কয়েক বছর। এবার সুদশুদ্ধ আদায় ক'রে নিয়ে এসেছে ভামিনী। কিন্তু বুকের কাঁটার মতো একটা লোক পেছন নিয়েছে বর্ধমান থেকে। যত জায়গায় তারা গেছে, সব জায়গায় গেছে লোকটা। ভাবও হয়েছে খুব রাধার সঙ্গে। রাধার আশ্‌কারাতেই এখানেও ছুটে এসেছে।

বুকে বড়ো ধুকুপুকু ভামিনীর। গগনের মতো হলেও ভালো ছিল কিন্তু লোকটি

অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা উগ্রক্ষত্রিয় ঘরের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে ভামিনীর সঙ্গে। রাধার সঙ্গে পীরিত হয়েছে। একেবারে দূর দূর করতে পারেনি।

ফিরে এসে রাধা বলল, 'মাসী, লোকটা কিন্তু ছুদিন থাকবে এখানে।'

ভামিনী গম্ভীর গলায় বলল, 'না।'

রাধা ফুঁসে উঠল, 'হ্যাঁ, থাকবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু সে তেজ নেই তার। নিস্তেজ গলায় বলল, 'মুখপুড়ি, বেশি অত্যাচার করলে গলাটা যে যাবে।'

রাধা হুকুমের স্বরে বলল, 'যাক্। গলার জন্যে কি কারুর ঘরে লোক আসা বাদ ছিল?'

অন্ধকার মুখে চুপ ক'রে রইল ভামিনী। বুকটার মধ্যে পুড়তে লাগল চাপা আগুনে। চোখের মণিতে সে আগুন নেই। অঙ্গুলি সংকেতের সেই নির্দেশ নেই। রাজেন্দ্রাণী কৃষ্ণভামিনী নেই।

সারা বাড়ি মজা দেখল। রাধা আর তার লোকটিকে নিয়ে গুলজার করল সবাই। মালীপাড়ার বুড়ি ছুঁড়ি সবাই বলল, 'মাগীর তেজ একটু কমেছে।'

কিসের তেজ। কেন তেজ তো কোনোদিন ভামিনী দেখায়নি কাউকে। সে যা, তাই তো সকলের কাছে তেজ।

গগন এল যথাপূর্বং। আসতে লাগল রোজ আগের মতোই। রাধার লোকটি বিদায় নিয়েছে। সব সময় ভামিনীর কথা মানে না রাধা। তবু, ঝগড়া করে, টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে বসে ভামিনী। গান হয়। খোল বাজায় গগন।

রাধাকে দেখাতে গিয়ে গলা খুলতেও লজ্জা করে কেন যেন ভামিনীর। সপ্তমে বাঁধা রাধার গলা টং টং ক'রে বাজে। ভামিনীর গলা বেসুরো ঢ্যাবঢেবে শোনায় সেখানে। অপ্রতিভ হয়ে খ্যাকারি দেয়, আবার তোলে গলা। 'বলে, নে বল্—'

রাধা বলে, 'থাক্ বাবু, তুমি বরং একটু শুয়ে থাকোগে।'

ব'লে উঠে যায়। কথা সরে না ভামিনীর মুখে। শুধু বসে থাকে চুপ ক'রে। হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হয়, মুখোমুখি খোল কোলে ক'রে বসে আছে গগন। ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'বসে আছ যে?'

গগন বলে অপ্রতিভ হেসে, 'যদি এট্টু গাও, তা'হলে বাজিয়ে যাই।'

: কে, আমি? রস যে প্রাণে ধরে না দেখছি। গাইব এবার ঘাটে গিয়ে, পালাও পালাও।

আরো একটি বছর গেল এমনি। রাধার সেই পীরিতের ছেলেটি এসেছে মাসে একবার ক'রে। এ-বছরও ঘুরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে মালীপাড়ায়ও এসেছে। এবার ফিরে এসে রাধা ছুদিন বাদেই বলল, 'মাসী, আমি চলে

যাব।'

ধ্বক্ ক'রে উঠল কৃষ্ণভামিনীর বুকের মধ্যে। চার বছর আগে রাথহরির কথায় এমনি ধ্বক্ ক'রে উঠেছিল। গানের গলা নেই, আজ কথা বলবারও গলা নেই ভামিনীর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাধার নির্বিকার দৃঢ় মুখের দিকে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'কোথায় যাবি ?'

: ওর সঙ্গে।

ওর মানে, সেই পীরিতের লোকটির সঙ্গে। বুকের মধ্যে কন্ কন্ করছে কৃষ্ণভামিনার। পঞ্চম ঋতুর দারুণ শীতে নেমেছে হিমপ্রবাহ। গলা গেছে, গান গেছে ধমক-টমক গেছে। সুদ যাচ্ছে আজ, আসল খেয়ে গেছে কবে। মথুর ভটচাযরা কবেই ছেড়ে গেছে। টাকা পয়সা সোনাদানা ও কিছু রানীর ঐশ্বর্য নেই। এ-বয়সে আর কিসের বেসাতি করবে। কে আসবে এ-ঘরে।

ভামিনী বলল, ভীত করুণ চোখে তাকিয়ে বলল কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিন, 'যাবি মানে ? তোকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করলাম, শেখালাম পড়ালাম, আমাকে কোথায় রেখে যাবি ?'

রাধা বলল কট্‌কট্ ক'রে, 'খাইয়েছ পরিয়েছ বলে, আইন নেই যে, তুমি আমাকে চিরদিন ধরে রাখবে। মন চাইছে যাকে, তার সঙ্গেই চলে যাব।'

মন চেয়েছে! এ বুঝি ভালবাসা। থিয়েটার বায়স্কোপে এমনি পীরিতের আজকাল নাকি বড়ো ছড়াছড়ি। কিন্তু দুদিনে যে তেজ ভেঙে যাবে। ঘরের বউ না, কুলটা। তোকেও যে একদিন এমনি করে এক রাধাকে খাওয়াতে পরাতে হবে।

গম্ভীর গলায় বলল ভামিনী, 'যা!'

এমন আচমকা আর নির্বিকার ভাবে বলল ভামিনী যে, রাধাও একমুহূর্তে থমকে রইল। কুঁকড়ে উঠল ঠোঁট দুটি।

ভামিনী বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখল। একটা রিকশাওয়ালা যাচ্ছিল, তাকে বলে দিল, 'তোমাদের গগন রিকশাওয়ালাকে একটু ডেকে দিও তো।'

ওদিকে যাবার তাড়া লেগেছে। আর তিন ঘরের মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। খবর রটেছে সারা মালীপাড়া। সবাই একবার ক'রে দেখতে আসছে রাধা আর তার নাগরকে। রাত দশটায় চলে যাবে ওরা।

ভামিনী বসেছিল বাতি জ্বালিয়ে। মনটা বড়ো গান করতে চাইছে, পারছে না ওদের কথার ফিস্‌ফিস্ খিল্‌খিল্ হাসিতে।

একটু পরেই এল গগন। বলল, 'তুমি নাকি ডেকেছ ?'

ভামিনী বলল, 'হ্যাঁ। বলছিলাম, আমার একটা লোক দরকার। রোজগেরে লোক। আমাকে রাখতে পারে এই রকম।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইল গগন। বৈশাখ মাস। সারা গায়ে ধুলো

বালি গগনের। কালো মুখে ঘাম। তারপরে হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল গগন। অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'তা আমাকে যদি বল…এখনো রিক্‌শাটা চালাই, রোজগারও হয়। আমি তোমার কাছে থাকতে পারি।'

ভামিনী বলল, 'তোমার যদি মন চায়। থাকা তো নয়, আমাকে রাখাও বটে।'

গগন বলল, 'তা তো বটেই। তবে আজকের রাত থেকেই থাকি?'

কৃষ্ণভামিনীর চোখে যন্ত্রণা ও ঘৃণা। বলল, 'এস।'

: খাওয়াটাও আজ থেকে তাহলে এখানেই হবে?

: তাই হবে।

গগন বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল। একটু খাটো হলেও কোঁচা দিয়ে আজ ধুতি পরে এসেছে গগন। গায়ে ক্ষারে কাচা জামা, গলায় একখানি সুতীর চাদর। পায়ে অবশ্য টায়ার কাটা স্যাণ্ডেলটি-ই আছে।

এই বেশে তাকে রিকশা চালিয়ে আসতে দেখে সবাই হৈ-চৈ ক'রে উঠল। ভামিনীর বাড়ির মেয়েরাও হেসে কুটিপাটি। ওমা! একি খোলুঙ্কি খুড়ো!

ওদিকে যাবার সময় হল। বিদায় নিল রাধা, গগন ভামিনীর কাছ থেকে। ভামিনী নীরব। গগন বলল, 'সুখে থাকিস্, বুঝে চলিস।'

চলে গেল ওরা! তারপরে সবাই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল ভামিনীর ঘরে।

ভামিনী রান্না শেষ করল। চোখ না তুলে, মাটির দিকে চেয়ে আসন পেতে খেতে দিল গগনকে। খাওয়া হলে, গা ধুয়ে, ধোয়া কাপড় পরে গগনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসবার চেষ্টা করছে না। বুকটা বড়ো ধড়ফর করছে। ঠাঁট বাট করতে হবে। কিন্তু রক্তে সে দোলা নেই। বয়সের ভারে অচল।

তবুও হেসে তাকাল। চোখের চারপাশে কোঁচ পড়েছে। সেই চোখে অসহায় ইঙ্গিত। গগন হেসে মাথা নামাল।

দরজা বন্ধ করল ভামিনী। জানালা বন্ধ করল। বাতিটা কমাল, কিন্তু জ্বলতেই লাগল। সামান্য অস্পষ্টতা। তারপর কাছে এসে হাত ধরল গগনের।

গগন চমকে উঠে বলল, 'কই, হারমনিয়া পাড়লে না?'

ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বলল ভামিনী, 'কেন?'

: গাইবে না?

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'শোবে না?'

তেমনি অপ্রস্তুত ভাবে হাসতে গিয়ে আজ প্রথম গগনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বলল, 'কেষ্টভামিনী ওইটির জন্য তোমার কাছে আসিনি। তুমি যা দেবে, সব নেব। কিন্তু কেষ্টভামিনী।' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঢোক গিলে বলল, 'তোমার কাছে থেকে বাজাবো, তাই চেয়েছি এতকাল ধ'রে।'

বিস্মিত সংশয়ে ফিরে তাকাল কৃষ্ণভামিনী। পরমুহূর্তেই চোখে জল এসে পড়ল তার। রুদ্ধগলায় বলল, 'কেন?'

গগন বলল, 'বাবারে! সব ভুলে গেলাম কেত্তন-গায়িকে কেষ্টভামিনীর গান শুনে, সে কি ভুলতে পারি? আজ যদি ডাকলে, এট্টু বাজাতে বল আমাকে।'

কে বলবে। কে কথা বলবে। হৃদয়ের সব গান আজ আর এক গানের রসে যে গলা বুজিয়ে দিয়েছে।

হারমোনিয়ম পেড়ে দিল গগন। শ্রীখোলটিতে কপাল ঠেকিয়ে কোলে নিয়ে বসল! বলল, 'গাও।'

হারমোনিয়মে সুর উঠল। কৃষ্ণভামিনী সুর দিল। সুর উঠল, স্বর উঠল। সেই স্বরে পঞ্চম ঋতু পেরিয়ে ষষ্ঠ ঋতুর বাতাস লাগল।

সারা মালীপাড়াটা প্রেতিনীর মতো ফিসফিস করে হাসতে লাগল, কেষ্টভামিনী আবার গাইছে গো!

রাত পুইয়ে এল। তবু খানিক দেরি আছে। সময়ের মাপে নয়। আকাশের মুখ কালো। আশ্বিনের শেষ। হেমন্ত আসছে। তবুও আকাশে বর্ষার মেঘবতীর গোমড়া মুখের ছায়া।

এ সময়ে কলকাতা থেকে কিছুদূর উত্তরে মাঠের মাঝে রেল স্টেশনটা যেন একটা বোবা বদ্ধভূমি। স্তিমিত কয়েকটা আলো যেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিষ্পলক চোখে কিসের প্রতীক্ষা করছে। প্ল্যাটফরম, টিনের ছাউনি, দরজা-বন্ধ অাপিস, খোঁচা লোহার বেড়া আর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মাঠ, জলা, সব বোবা, তবু জীবন্ত। নিশ্চল, তবু অনুভূতিময়।

থেকে থেকে আসছে একটা পুবে হাওয়ার ঝোড়ো ঝাপটা। পূর্ব আকাশে সামান্য আলোর ইশারা। সে আলোয় মেঘ দেখাচ্ছে যেন ছড়ানো লটবহর।

ঘটাং করে একটা শব্দ এল দূর থেকে। সিগন্যালের খবরদারি লাল চোখ বুজে গেল, ভেসে উঠল নীল চোখের আমন্ত্রণ। আসছে। ভীত পাখি কিচির-মিচির করে উঠল সিগন্যালের মাথার বাসা থেকে। আবার চুপচাপ।

দু-একজন করে লোক আসছে স্টেশনে। ধীরে নিঃশব্দে। বড় বড় ছায়া ফেলে, গা হাত পা এলিয়ে। স্টেশনের বাইরে আচমকা কালো আঁধার থেকে যেন হঠাৎ প্রতীক্ষারত আততায়ীর দল বেরিয়ে আসছে। আসছে।

তারপর বোঝা গেল সেই চিরপরিচিত কাশি। ঘুংরি কাশি। কাশি নয়, যেন কামারের নেহাইএর বুকে হাতুড়ির ঘা। তীব্র শ্বাসরোধী, একটানা। কাশি শুনে বোঝা যায় না লোকটার বয়স, বোঝা যায় না মেয়ে না পুরুষ।

স্টেশনের পূর্বদিকের অন্ধকার মাঠ থেকে কাশিটা ধেয়ে এল প্ল্যাটফরমের দিকে। সেই সঙ্গে কাশির প্রতি ক্ষমাহীন অস্ফুট কটূক্তি, 'শালার কাশির আমি ইয়ে করি।'

গাড়ি এসে পড়ল। তার কপালের তীব্র আলোয় দেখা গেল দুটো ভেজা লাল চোখ, শুকনো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে লাল্‌চে ছোট ছোট দাঁত, কোঁচকানো মুখ, তামাটে রং, চট ফেঁসোর মতো চুল, চটের বস্তা কাঁধে, গায়ে বুক-খোলা একটা তালি মারা হাঁটু পর্যন্ত হাফশার্ট, তার তলায় প্যান্ট বা কাপড় কিছু আছে কিনা বোঝবার যো নেই। তার তলা থেকে নেমে এসেছে দুটো কঞ্চির মতো পা আর পায়ের পাতা যেন পাতি হাঁসের চ্যাটালো পা। থ্যাবড়া, মোটা ফাঁক ফাঁক আঙুল। লম্বায় আড়াই হাত। সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, যেন তলোয়ার নয়, বেখাপ্পা খাপে ঢাকা একটা শাণিত গুপ্তি।

বয়স বিশ কি পঞ্চাশ কি বারো, বোঝার উপায় নেই।

তবে আসল বয়স তেরো। নাম গৌরাঙ্গ। অর্থাৎ গোরা।

তবে যদি জিজ্ঞেস কর, 'তোর নাম কি র‍্যা ?'

শুনবে দোআঁশলা স্বরের জবাব, 'গোরাচাঁদ এস্‌মাল্‌গার।'

এস্‌মাল্‌গার অর্থে স্মাগ্‌লার। কিসের স্মাগল ? অমনি শুনবে যাত্রার সুরে,

চাল চুলো নেই বেচালেরে
আমি যোগাই চাল।

দেখা যাবে, গাড়ির কামরার মধ্যে সে গানের দোহার আছে গণ্ডা কয়েক তারাও গেয়ে উঠবে। সবাই এস্‌মাল্‌গার।

আশি মাইলের মধ্যে যে ক-টা জংশন স্টেশন আছে, সবগুলোর পুলিশ রিপোর্টের খাতায় একটু নজর করলেই দেখা যাবে নাম, গৌরাঙ্গচন্দ্র দাশ, বয়স তেরো, অপরাধ বে-আইনী চাল বহন (পনের সের), কোর্টের প্রডিউসের অযোগ্য। অতএব···।

গোরাচাঁদ তিনবার জেল খেটেছে। একবার পুরো একমাস, একবার পঁচিশ দিন আর আঠারো দিন একবার। জেলে ছোকরা ফাইলে থেকে জীবনের নোংরামি ও সর্বনাশের এক ধরনের শেষতলা অবধি সে দেখেছে। বুঝেছে কিছু কম। তবে নেশা তার জীবনের যেটা ধরেছে সেটা সর্বনাশের।

একবার ট্রেনের মধ্যে শুনল, সামনের স্টেশনে পুলিশ রয়েছে চাল ধরার জন্য। গাড়ি স্টেশনে ঢোকবার আগেই গোরা প্রথমে ফেলে দিল তার পনের সেরের ব্যাগ, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নিজে।

একমাস পরে যখন হাসপাতাল থেকে এল তখন তার গায়ে মাথায় অনেকগুলো ক্ষতের দাগ আর সামনের মাড়ির একটা দাঁতের অর্ধেক নেই, বাকিটা নীল হয়ে গিয়েছে। ফলে, তার পাকা পাকা মুখে যেটুকু ছিল ছেলে-মানুষির অবশিষ্ট, তা হল এক মহা ফেরেববাজের হাসি।

তার পঞ্চাশ বছরের বুড়ো এস্‌মাল্‌গার বন্ধু রসিকতা করে বলল, 'বাবা গোরাচাঁদ, তোমার সেই চালগুলান এ্যাদ্দিনে গাছ হয়ে আবার ধান ফলেছে।'

অর্থাৎ যে চাল নিয়ে সে লাফিয়ে পড়েছিল। যেমনি বলা, তেমনি দেখা গেল একরাশ বাদামের খোসা ও ধুলো বুড়োর মুখ চোখ ঢেকে দিয়েছে। সুতরাং গালাগাল আর অভিশাপ। কিন্তু ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে গোরাচাঁদ মাথা ঘামায় না।

গাড়ি এল। গোরা তখন দম নিচ্ছে কাশির দমকের। স্টেশনের কুলিটা বিরক্তিভরে এমন করে এসে ঘণ্টা বাজাল, যেন কোনো রকমে কর্তব্য সারা গোছের পাড়ার নেড়ি কুকুরটার খিঁচোনি। গাড়ি যখন ছাড়ল তখন গোরা তার পছন্দসই কামরা খুঁজতে লাগল।

গাড়ির গতি বাড়ল তবু কামরা আর পছন্দ হয় না। সেই মুহূর্তে একটা কামরা থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ্যাই শালা গোরা।'

চকিতে কি ঘটে গেল। দেখা গেল, গোরা সেই কামরার হাতলে বাদুড়ের

মতো ঝুলছে আর তার বন্ধুরা চিৎকার জুড়েছে তাকে পেয়ে।

ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কিন্তু ওটা অভ্যাস। একদিন ছিল, ক্রু আর পুলিশের ফাঁদে পড়ার ভয়ে দেখে শুনে নিজেই গাড়ি ছেড়ে দিত, দৌড়ে উঠতে হত। এখন তো দুটো চোখ নয়, চোখ চারটে এবং সচকিত। তবু ধীরে সুস্থে থামানো গাড়িতে উঠবে, মনের এতখানি সুস্থিপনা ভাবাই মুশকিল।

এর মধ্যে টিকেট কাটার কথা কল্পনাই করা যায় না। মূলধন তো পনের সের চাল। এ পনের সের আর কোনোদিন আধমণে পৌঁছল না। অর্থাৎ যাট মাইল দূর থেকে পনের সের চাল আনলে, প্রতি সেরে কোনোদিন দু-আনা, দশ পয়সা, কখনো বা মেরে কেটে তিন আনা তার থাকে। সারা দিনে খাবার বরাদ্দ চার আনা থেকে পাঁচ আনা। বাকিটা বাড়িতে দিতে হয়। সেখানে আছে ছোট ছোট পাঁচটা ভাইবোন, আর একটি তার মায়ের পেটে বাড়ছে। বাপ না থাকার মধ্যে। অন্তত গোরার কাছে। সে লোকটি এককালে ছিল নিম্নবিত্তের ভদ্রলোক। আশা ছিল বিত্তবান হওয়ার। এখন কলকাতার বাইরে রেফিউইজি ক্যাম্পে বসে সে আশা তো কবেই উধাও হয়েছে। উপরন্তু সে এখন গোরাচাঁদের রোজগারে নির্ভরশীল একজন অবাঞ্ছিত রুগ্নভার মাত্র।

সুতরাং এ যুগের বাঙালিরা বাঙালি গোরাকে চেনে না। দু-বছর আগে ওদের এলাকার রেশন ইনস্পেক্টর এসে যখন গোরার মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'হেড্ অব্ দি ফ্যামিলি কে,' তখন ইঞ্জিরি কথা শুনে গোরার মা হাঁ করে তাকিয়েছিল। ইনস্পেক্টর ব্যাপারটা বুঝে বললে, 'তোমাদের সংসারের কর্তা কে?' তখন গোরার হাত ধরে এনে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ইনস্পেক্টর তো থ।

এর উপরে যাট মাইলের ভাড়া দুটো টাকা যদি গোরা খরচই করতে পারবে তবে আর এস্‌মাল্‌গার হওয়ার কি দরকার ছিল।

এর পরে গাড়ির মধ্যে সে এক তুমুল কাণ্ড! মস্ত লম্বা কামরাটার মধ্যে আর কোনো যাত্রীকে চোখে পড়ে না কেবল গোরা আর তার সমবয়সী সঙ্গীদের ছাড়া। তারা সকলেই গোরার সহগামী ও সহধর্মী, সকলের প্রায় একই ছাঁচ, একই গড়ন। তবে নেতা হিসাবে তারা যে-কোনো কারণেই হোক, গোরাকেই মেনে নিয়েছে।

সমস্ত গাড়িটার মধ্যে তারা এককোণে দলা পাকিয়ে বসল। যেন একগাদা কুকুরের ছানা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।

একজন বলল, সেই গানটা ধর এবার।'

'কোন্‌টা?'

'সেই ঠাকুরের নাম রে। আমাদের গোরা শালার নাম।'

বলতে বলতেই তারস্বরে চিৎকার করে উঠল:

'এহ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম হে'

সেই সঙ্গে এ ওর আর ও এর পিঠে চালাল খোলের চাঁটি। এ ভজনার মধ্যেও ছিল গোরার চিল গলার 'সখী হে' বলে টান।

হঠাৎ একটা চিৎকারে ওরা সবাই থামল। দেখল, কামরাটাতে যাত্রী একজন আছে। কিন্তু যাত্রীটি ছিল বেঞ্চির তলায়। বোধ করি আত্মগোপনের আশায়। বুড়ো। দুটো ভাঁটার মতো চোখ, একমুখ দাড়ি আর সারা গায়ে একটা অজস্র তালিমারা আলখাল্লা।

খেঁকিয়ে উঠল, 'বলি কোন্ সুখে র‍্যা, অ্যাঁই কোন্ সুখে?'

অর্থাৎ কোন্ সুখে এ চেঁচামেচি। গোরার দলটা এ বেঞ্চির তলার যাত্রীর দিকে এক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল। লোকটা শাসিয়ে উঠল, 'ফের আমাকে জ্বালাতন করলে—'

অমনি গোরা টকাস্ করে তার এক বন্ধুর মাথায় চাঁটি মেরে বলল, 'এই, কেন জ্বালাতন করছিস রে?'

বন্ধু আর এক বন্ধুর মাথায় মেরে বলল, 'আমি নাকি? এই শালা তো।'

আবার সে মারল আর একজনের মাথায়। তারপরে দেখা গেল. গানের চেয়ে চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে হুড়োহুড়ি আর কোস্তাকুস্তি। বুড়ো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত মুখে ঘটনাটা লক্ষ্য করতে করতে তেলচিটে আলখাল্লাটা এমনভাবে ঝাঁকানি দিল যে একরাশ ধুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বললে, 'শালারা হনুমানের জার—।'

তারপর গাড়িটা একটা স্টেশনে দাঁড়াতেই বুড়ো দৃপ্ত ভঙ্গিতে আলখাল্লা ঝাপটা দিয়ে নেমে গেল, যেন রাজা দরবার ত্যাগ করছেন। বললে, 'আচ্ছা দেখে লোব।'

এতক্ষণে গোরাদের দলটা পাছায় চাঁটি মেরে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ছুটে নেমে পড়ল বাইরে। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও দাদু, ও জগাই, ও মাধাই'—

বুড়ো ততক্ষণে আর একটা কামরাতে উঠে একটা বেঞ্চির তলায় আশ্রয় নিয়েছে আর বলছে, 'শালারা মাথার উকুনের হদ্দ।'

উকুনের হদ্দ দল আবার তেমনি জড়াজড়ি করে বসেছে। কিন্তু প্রত্যেক স্টেশনে তারা নামবেই। চুপচাপ বসেই যদি যাবে তাইলে আর ভাবনা ছিল কি। বোধ করি এই গান, মারামারি, খেলা, নিজেকে আর নিজের সব কিছুকে ভুলে থাকার এ অবিশ্রান্ত উন্মাদনা না থাকলে এ দীর্ঘ পথ, সময় হত মরুভূমি ও রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা। তাছাড়া পথ অতি দুর্গম। কোথায় বাঘের মতো ওত পেতে আছে ক্রু, মোবাইল কোর্ট, পুলিশ, ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড আর কালকেউটের মতো সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, বলা তো যায় না।

ভোর হয়ে আসছে। হাজারো মেঘের ভিড় আকাশে, তবু মেঘে মেঘে অপ্রতিরোধ্য বেলা আসছে। পুবের ধূসরতায় যেন ছাই চাপা মুক্তোর জেল্লা। টেলিগ্রাফের তার যেন একটা দিকপাশহীন বেহালার তার। সেই তারে, তারে

জটলা ন্যাজঝোলা পাখির।

যাত্রী বাড়ছে। বাড়ছে কোলাহল। ভিড় বাড়ছে গোরার সহধর্মীদের। মেয়ে, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। যেতে হবে দূরে, বহুদূরে। এক জেলা থেকে আর এক জেলায়, পথ মাঠ ভেঙে, গাঁয়ে হাটে। তারপর ফিরে আসতে হবে এখানে, স্টেশন এলাকায়, কর্ডনের অবরোধ ভেঙে।

বিড়ি খাচ্ছে গোরা। খাচ্ছে না, ফুঁকছে। বুড়ো মন্দ হন্দ হয় তার নাক মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুনো দেখলে। স্টেশন-এর ধারে কোয়ার্টারের জানলায় বসে একটা ছেলে পড়ছিল, 'সাজাহান আঁ্যা সাজাহান অত্যন্ত, হৃদয়—' কিন্তু থেমে গেল পড়া, চোখাচোখি হয়ে গেল গোরার সঙ্গে।

গোরা চোখ নাচিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কি পড়ছিস? বিড়ি খাবি?'

বিড়ি? ছেলেটার চোখে কৌতূহল, বিস্ময় ও ভয়। বুক জোড়া কপাটে কপাটে যেন হাজারো করাঘাত পড়ল। খিলখিল করে হেসে চলন্ত গাড়িটাতে গোরা ন্যাকড়ার ফালির মতো উড়ে গেল। হাসির রেশটা একটা ভয় ব্যথা আনন্দের শিহরণ রেখে গেল শুধু জানলায়।

হঠাৎ যেন থমকে যায় গোরা। বুকের দ্রুত তালে ভাঁটা পড়ে মন উজানে চলে। জলা মাঠে ছিটেবেড়ার ঘর, একগাদা পুতুল আর পেট-উঁচু মা। পেটের বোঝার ভারে নত, চোখের কোল বসা, চোপসানো গাল, একটা অর্থহীন যন্ত্রণা কাতর চাউনি। সেখানে জানলা নেই, সবটাই খোলা, নয়তো সবটাই বন্ধ। ভয় কৌতূহল বিস্ময় আনন্দ নেই। একটা তীব্র হাহাকারের অসহ্য নৈঃশব্দ্য আর কিসের তাড়নায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে চলা কিংবা আচমকা একটা সুরতালহীন ভাঙা স্বর, 'আর বিড়ি খাসনি বাবা!'

চকিতে গোরার মুখের উপর একটা থাবা পড়ে আবার উঠে গেল। দেখা গেল তার মুখের বিড়িটা আর একজনের মুখে চলে গিয়েছে। সেটা নিয়ে আর একজনই, তারপরে আর একজন, তারপরে আবার হল্লা ও চিৎকার।

শহরতলির ভিড়। রেললাইনের ধারে ধারে কারখানা, বস্তি, ধুলো, ধোঁয়া আর মানুষ। মানুষ গাড়িতে। যাত্রী, অযাত্রী, ভিখিরি, হকার। বৈরাগী গাইছে:

গৌর বিনা প্রাণে বাঁচে না। কি যন্ত্রণা—

গোরা বলল চেঁচিয়ে, 'কি যন্ত্রণা বল না গো! এখেনেই আছি।'

সবাই হেসে উঠল গাড়িসুদ্ধ। গোরা আরও গম্ভীর হয়ে বললে, 'অ! ঠিক ধরেছি, আর বলতে হবে না। দুটো পয়সার যন্ত্রণা তো!' আবার হাসি। কিন্তু বৈরাগী ভিখিরির পিত্তি জলে গেল। গোরা আবার বলল, 'তা কি করব বল। আমি যে এখন গোরা এস্‌মাল্‌গার হইছি গো!'

গাড়ি থামতেই একগাদা মেয়েমানুষ হুড়মুড় করে ঢুকল। তাদের কাঁধে আর কোমরে চটের ব্যাগ। এরা সব গোরাদেরই সহযাত্রিণী। গোরা বলে

এস্‌মাল্‌গারিনী। এদের মাঝে সুবালা হল গোরার বান্ধবী। গোরা বলে, আমার বিষ্ণুপ্রিয়া।

সুবালার ভাঁটো বয়স। ভাঁটো মেয়ে, খাটো গড়ন। ঘরে আছে পিঠোপিঠি দুই ছেলে। তারা একটু দড়ো হয়েছে। তিন বছর ধরে স্বামী নিখোঁজ, আর সুবালা রেফিউজী, কলোনীবাসিনী। কপালে আর সিঁথিতে জ্বলজ্বল করে সিঁদুর আর কি করে জানি না তার কালো মুখে সাদা দাঁতে নিয়ত ঝলমল করে হাসি। অতএব যা বলতে হয় তাই কলোনীঘরনীরা বলাবলি করে, 'পোড়া কপাল তোর বেঁচে থাকার আর সিঁদুর পরার। তোর কোন্ যমের ঘরে রইল সিঁদুর। তাকে রাখলি তুই মাথায়। ও, চাল না টিপেই বুঝি, ক-ফুট হল।' সুবালারও নাম আছে পুলিশের খাতায়: সাতদিন হাজতবাস করেছে সে বে-আইনী চাল বহনের অপরাধে।

আর এ পেশায় এ পথে, সহস্র চোখও তার দিকে বাড়ানো হাতের মাঝে সে নজর করল গোরাকে। ঘরে তার দুই ছেলে, বাইরের সারা দিনের জীবনে সে বোধহয় স্নেহ দিতে বাঁধতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু গোরার জীবন ধারণের ক্ষেত্রে স্নেহ শাসন ভয় আইন শৃঙ্খলাটাই বে-আদবি।

সে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, 'তুমি কিন্তুন্ আমার বিষ্ণুপ্রিয়া।'

সুবালা খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল, 'কেন, আমি—আমি তো শচীমাতা।'

একটা অদ্ভুত গোঁ ধরেছিল গোরা, 'সে আমার ঘরে আছে। তা হবে না।'

ফিক্ করে হেসে উঠতে গিয়ে চকিত যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সুবালার গলা। দেখেছিল, তার সামনে সেই উসকো-খুসকো ক্ষুধার্ত ছেলেটার বয়স গৌণ, এ সংসারে ও একটা মস্ত দিগ্‌গজ। বয়সটার কথা গোরা নিজেও ভুলে গেছে। তাই তার দাবি আর দশটা বয়স্ক পুরুষের মতোই।

কান্না চেপে অদ্ভুত হেসে বলেছিল সুবালা, 'আচ্ছা, তাই হল গো গোরাচাঁদ।'

হোক মিথ্যে, তবু সেই ভালো। সুবালার হৃদয় তো আর মিথ্যা নয়, আর সেই থেকে এ দলের মধ্যে তার মজার কাহিনী রাষ্ট্র হয়ে গেল। আসলে যেটা ঘটল, সেটা সুবালার কাছ থেকে গোরাচাঁদের দৈনিক এক আনা চায়ের বরাদ্দ। সম্পর্কের মধ্যে এ নগদ আদায়ের আত্মীয়তা ছাড়া আর কারো কিছু বোধকরি দরকার ছিল না। এ নিয়ে যারা টিপ্পনী কাটত, তারা হল সুবালার বয়স্ক মেয়ে পুরুষ সঙ্গীরা।

কে চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা, তোর বিষ্ণুপিয়ে এয়েছে।'

অমনি গোরা গান ধরল,

পরাণ ধরে বসে আছি, তোমারি পথ চেয়ে গো—

সুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে। অচেনা যাত্রীর দল অবাক হয়। একটু রসসন্ধানীও হয়ে ওঠে। মুহূর্তে সুবালা চুম্বক হয়ে ওঠে একটা।

সুবালার মনের মধ্যে একটা চাপা লজ্জাও হয়। তার সঙ্গিনীরা বিরক্ত হয়-কেউ, কেউ হাসে।

গোরা বলে ঠোঁট উল্টে, 'তোমাদের ইস্টিশানটা বাপু বড় দূরে।'

সুবালা হেসে বলে, 'তোর বুঝি তর্ সয় না?'

গোরা তার কোঁচকানো গালে হাসে আর ভাঙা নীল দাঁতটা জিভ দিয়ে ঠেলে। ভাবে, কিসের তরের কথা বলছে সুবালা। সেই চারটে পয়সার, না, সুবালার। বলে, তর্ আবার কিসের?

সুবালা বলে, 'আমার জন্যে?'

গোরা সমানে সমানে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ গো, তুমি যে বিষ্ণুপিয়া।'

বেশি ঘাঁটায় না সুবালা। জানে, গোরার ছোট বড় চেনা অচেনা, কোনো মানামানি নেই। চারটে পয়সা দিয়ে বলে, 'যা পালা।'

বলতে হয় না। পয়সা পেয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়ে গোরা। জংশন স্টেশনে নামতে গিয়ে দরজার দিকে ছুটতে গিয়ে কারো হাঁটুর গুঁতো মাথায় চাঁটি ঠক্‌ঠক্ পড়ে। সে সব যেন গোরার গায়েই লাগে না। যেন কার পিঠে বা পড়ছে। জংশন স্টেশনটা আসতেই সে কোনো রকমে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। একা নয়, সঙ্গীরাও আছে পিছে পিছে।

চার পয়সা দিয়ে এক গেলাস চা নিয়ে গোরা দু-এক চুমুক না দিতেই আর একজন চুমুক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন, তারপর আর একজন। সেই সঙ্গে কাড়াকাড়ি খেলার হাসি। যেন একটা পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক গাদা কুকুরের বাচ্চা। মুহূর্তে দেখা যায়, তপ্ত চা ভর্তি গেলাস একেবারে সাফ।

এমন সাফ বুঝি ধুতেও হবে না।

চা-ওয়ালা কটূক্তি করে এক হ্যাঁচকায় গেলাসটা ছিনিয়ে নেয়, 'শালা ভিখ্-মাঙ্গার দল।'

'ভিগমেগো লয় হে, এস্‌মাল্‌গার।' জবাব দিল গোরা।

চা-ওয়ালা বুঝল না, জবাবও দিল না।

কিন্তু চা চেটে ওদের অতৃপ্ত রসনা যেন লকলকিয়ে ওঠে। খাওয়ার পয়সাটা ওরা আরও দূর মফস্বলে গিয়ে খরচ করবে। সেখানে ভাত দুটো বেশি পাওয়া যায়।

একজন বলল, 'মাইরি, আমারও যদি এট্টা বিষ্ণুপিয়ে থাকত।'

আফসোসটা বোধ করি সকলের। সকলেই চুপ করে থাকে।

গোরা খুব নির্বিকারভাবে তাচ্ছিল্য ভরে বলে, 'বে...টা এবার করে ফেলব।'

এমন গম্ভীরভাবে বলে যে তার সঙ্গীরা সন্দেহ করলেও প্রশ্ন করতে সাহস করে না।

একজন বলে ফেলে, 'তোর চে তো বড়।'

গোরা বলে, 'কিসে?'

'বংসে।'

'ফুঃ!' যেন ফুঁ দিয়ে ওড়ানো ছাড়া গোরার এতে জবাবই নেই।

গাড়ি ছোটে পুবে উত্তরে বাঁক নিয়ে। শহরতলির কারখানা এলাকা ছেড়ে এসে পড়ে দিগন্তবিসারী মাঠ গ্রাম। বেড়ে যায় স্টেশনের দূরত্ব।

বেলা বাড়ে মেঘে মেঘে। কখনো বা গোমড়া মুখে হঠাৎ হাসির মতো চকিত রোদ দেখা দেয়।

গোরাদের জীবনটাও এই মেঘেরই মতো। বয়সটা যেন মেঘ ঢাকা সূর্য। হাজারো কষ্ট, যন্ত্রণা, নিষ্ঠুরতা ও পাকামি থাক, চাঞ্চল্য যেন উপচে পড়ে। চুপ করে বসে থাকা যে কুষ্ঠিতে লেখা নেই। তাই চলন্ত গাড়িতেই শুরু হয় খেলা। ইঁদুর আরশোলার মতো এর পায়ের তলা দিয়ে, ওর ঠ্যাঙের তলা দিয়ে। বা একেবারে পাদানি ধরে ঝুলে পড়ে বাইরে, নয়তো কামরা থেকে কামরায় যায় ছুটে।

যাত্রীরা গালাগালি দেয়, খেঁকিয়ে ওঠে, ওরা ভ্রূক্ষেপ করলেও আবেগ মানে না।

সে খেলার দিকে চেয়ে সুবালা শিউরে শিউরে ওঠে। তারও জীবনের বিড়ম্বনাটা যেন মেঘের মতো, আর বুকের ভেতরে যেখানটায় শিহরণ, সেখানটা মেঘচাপা সূর্যের মতো। হাজারো অভিশাপ ওইখানে ম্লান। ঘরে ছুটোকে রেখে আসার জন্য উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা এখানে গোরাকে ঘিরে বুঝি মগ্ন হয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে গোরার সেই পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো বন্ধু সুবালার কাছেই গোরার ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ করতে বসে। 'ছোঁড়া ভারি হারামজাদা, দেখ, যাচ্ছিস বিনি টিকটে, করছিস বে-আইনী কাজ, আবার প্যাসেঞ্জারের গায়ে পড়বে।'

সুবালা বলে, 'ধরে আনো না।'

'কে? আমি?' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে বুড়ো, 'রামো রামো। আমার একটা মানজ্ঞান নেই?'

সুবালা অবশ্য বলে না বুড়োকে যে, গোরা যখন রোজ তার চালের বস্তা মাথায় করে এনে গাড়িতে তুলে দেয় তখন কোথায় থাকে এ মানজ্ঞান।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা, একটা মামা রয়েছে রে।'

মামা মানে ক্রু-ম্যান। গোরা বলল, 'কোথা?'

'ফ্যাস্ট কেলাসে ঘুমোচ্ছে।'

গোরা বলল, 'খবরটা বিষ্ণুপিয়েকে দিয়ে আয়।'

অর্থাৎ সকলকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে। একটা ক্রু-ম্যানের পক্ষে এ চাল বহনকারী বাহিনীকে অবশ্য ধরে নামানো সম্ভব নয়। তবু সাবধানের মার নেই। একজনকে মাঝপথে নামিয়ে দিলেই তো সে গেল। আর গোরার ভাষায় এই এস্মাল্গার দলের সমস্ত খবর পাওয়া যাবে গোরাদের কাছেই। এদের ধরবার জন্যে কোথায় কোন শত্রু আত্মগোপন করে আছে, এরা নানান্ রকমে সে সন্ধান

যোগাড় করে নেয়।

'মোশায়, এট্টুস আগুন দেবেন?' গোরা বিড়ি মুখে দিয়ে দাঁড়াল একজনের সামনে।

লোকটি ভদ্রলোক। তিনি সিগারেট খেতে খেতে একবার খালি রাগে কট্‌মট্ করে গোরার দিকে তাকালেন।

কিন্তু বৃথা। ওর কাছে এ আত্মসম্মান, অপমান, ছোট বড়র কোনো স্থান নেই। এ সমাজের শৃঙ্খলা ও আইনকে যে-কোনো উপায়ে ভেঙে পলে পলে ওকে নিঃশ্বাস নিতে হয়। ও কিশোর নয়, বালক নয়, ছাত্র নয়, এমন কি একটা অফিস বয়ের আনুগত্যও ওর জানা নেই। ও এ যুগের হেড অব্ দি ফ্যামিলি। একটা মস্ত পরিবারকে পালন করে। ও এস্‌মাল্‌গার। সভ্যতা ভদ্রতা এখানে অচল।

আবার বলল, 'দেবেন না?'

ভদ্রলোক পাশের লোকটিকে বলল, 'দেখলেন মশাই সাহসটা?'

কিন্তু যাকে বললেন, বোধহয় দেখে বলেননি লোকটা কোন্ কোয়ালিটির। সে বলে উঠল, 'শালাদের খালি উঠতে বসতে লাথাতে হয়।'

'মাইরি'! বলেই গোরা খানিকটা সরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে গেয়ে উঠল:

যে বলে আমাকে শালা
তার বোনেরে দিব মালা।

অমনি একটা রাগ ও হাসির রোল পড়ে গেল। আর শালা বলেছিল যে লোকটা, সে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে গোরার উপর। চলল কিল, চড়, লাথি, ঘুষি আর গালাগাল।

গোরার বন্ধুরা হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও উঠল কামরাটা মধ্যে। সুবালা ওইখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল গোরা গোরা বলে।

ততক্ষণে গোরাকে মুক্ত করে নিয়েছে তার বন্ধুরা, আর সে লোকটা আস্ফালন করেই চলেছে, 'মেরে ফেলে দেব আজ কুত্তার বাচ্চাটাকে।'

কিন্তু সবাই দেখছিল গোরাকে। মার খেয়ে তার তামাটে মুখটা আরও তামাটে হয়ে উঠেছে। চুলগুলো ঢেকে ফেলেছে প্রায় অর্ধেক মুখটা। তার ভেতর শুকনো চোখ দুটো জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে।

পরের স্টেশনে যখন লোকটা নামতে গেল, সবাই দেখল একটা প্রকাণ্ড শরীর ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল প্ল্যাটফরমের উপর আর কাঁটা কাছাটা পড়ল ঝুলে।

পড়াটা এমনই মোক্ষম হয়েছে যে, সে ওঠবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল আর সেই সঙ্গে একটা কাঁচা পাকা দো-আঁশলা গলার সমবেত হাসির শব্দ ভরে দিয়ে গেল আকাশটা।

আবার খেলা! বোঝবার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে গোরা মার খেয়েছে।

এরকম ঘটনা তো প্রায় রোজই ঘটছে। বিড়ি খাচ্ছে, থুথু ফেলছে এখানে সেখানে, বক্‌বক্ করছে, পানের কৌটা চিবোচ্ছে পানওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে, ফেরীওয়ালার কাছ থেকে আচারের নমুনা চেয়ে খাচ্ছে। কাশছে ঘংঘং করে। যেন জ্বরের ঘোর। যেন পাগলাটে নিশি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যেন থামলেই সব শেষ হয়ে যাবে এখুনি। সময় নেই।

আর কতদূর? দুটো জংশন স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছে। দূরের ঐ স্টেশনটার ওগুলো কি দেখা যায় সারি সারি? মোবাইল? না, জলার কাশবন।

বেলা বাড়ছে। রোদ নেই, পুবের ঝোড়ো হাওয়া জলো জলো। চোখ জলছে, খালি তেষ্টা পাছে, পেটটা চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু এখনো যে অনেক দূর।

কি দরে আজ চাল পাওয়া যাবে, কে কত সের কিনবে, কে কত নিয়ে এসেছে, সবাই আলোচনা করে।

গোরা হঠাৎ কখনো কখনো ছুটে আসে সুবালার কাছে। ডাকে, 'বিষ্ণুপিয়ে।' সে ডাক যেমন অদ্ভুত, তেমনি হাস্যকর। বলে, 'তুমি কবে আমার সঙ্গে যাবে?'

সুবালা যেন ছোবল খেয়ে হাসে। বলে, 'যবে তুই নিয়ে যাবি।'

তারপরে গোরা হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়। চোখ দুটো শূন্যে নিবদ্ধ, কিন্তু সেখানে যেন কত লুকোচুরি খেলা।

নিঝুম গেঁয়ো স্টেশনটার জলা ঝোপ থেকে সেই পাখিটা ডাকে কুর্ কুর্ করে, 'ওগো, খোকা কোতায়! খোকা কো-তায়!' গোরার চোখে ভেসে ওঠে একটা গ্রাম, ঘর, আর নিকনো দাওয়া। মা সেই দাওয়ায় বসে নাদা-পেটা ছেলেকে তেল মাখায়। ছেলে কাঁদে তেলের ঝাঁজে। মা বলে, 'কেঁদোনি, সোনা, কেঁদোনি। তোমারে ফটিক জলে নাওয়াব, দুধে ভাতে খেতে দেব, সোনার কপালে চুমু খাব।'

সে কথা কোন্ জন্মের? আবার চোখে ভাসে, শহরতলির কারখানায় রাবিশের স্তূপ। তার পাশে বিস্তৃত জলা, ছোট ছোট ছিটে বেড়ার ঘর, সারি সারি কতকগুলো রুগ্ন পুতুল আর পোয়াতি মা। মুখে কোন কথা নেই, শুধু নিষ্পলক অদ্ভুত দুটো চোখে চেয়ে থাকা, এ দুরন্ত জীবনেও এ চোখের কথা সরল, স্বরবর্ণের মত সহজ!

হঠাৎ গোরা আনমনে ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে, 'মা।...মা!'

সুবালার নিষ্পলক চোখে কিছুই এড়ায় না। সেই দেখে, গোরা যেন সত্যিই এক স্বপ্নাচ্ছন্ন তন্ময় কিশোর। সে অমনি ঝুঁকে পড়ে ডাকে, 'কি রে গোরা, কি হয়েছে?'

বিমূঢ় গোরা অবাক চোখে সুবালার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখটা ঠেকে সুবালার বিশাল বুকের কাছে। ভাবে, মা বুঝি ডাকছে। তার মা।

পরমুহূর্তেই সংবিৎ ফিরে আসে। ততক্ষণে কি যেন ঠেলে আসছে গলায় আর

চোখে। কিন্তু তাকে কিছুতেই আসতে দেওয়া হবে না। এ জীবনে আর যাই হোক, চোখে জল ফেলে অধর্ম গোরা করবে না।

হঠাৎ কাশিতে হাসিতে একটা বিকট শব্দ করে সে ছুটে খেলায় যোগ দিতে যায়। অমনি একটা হৈচৈ পড়ে যায়। যেন ঝোড়ো হাওয়ায় সবাই শশব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কে প্রাণ খুলে গান ধরেছে,

বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও,
নগর ছানিয়া দিব, পরাণ ভরে খাইও।

আর গোরা একজন যাত্রীকে হাত মুখের ভঙ্গী সহকারে বলছে, 'জেলের ভয় দেখাচ্ছেন? মোশাই, তিনবার ঘুরে এয়েছি।' ভাঙা দাঁত আর মুখের দাগ দেখিয়ে বলছে, 'পড়ে মরব? তা-ও হাসপাতালে থেকে এয়েছি। আমার নাম গোরাচাঁদ।' যাত্রীটি একমুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, 'ডেঁপো।'

'ডেঁপো নয় বাবু, ভেঁপু।' বলে মুখের একটা বিচিত্র শব্দ করে সরে গেল। তারপরেই হঠাৎ, 'সখী একবার ফিরে চাও গো।' বলে তীব্র চিৎকার।

কিন্তু আর কতদূর? এ গাড়িটা মাঝে মাঝে থামতে পারে। ওরা যে পারে না। বিড়ি ভালো লাগে না। প্যাচ্‌প্যাচ্‌ করে ফেলার মত থুথুও মুখে নেই। চোখ ছোট হয়ে আসে, গা-টা ঘুলোয়। ওই লোকটা কি সিভিল সাপ্লাইয়ের বাবু? না, ওটা তো একটা এস্‌মাল্‌গার।

বেলা বাড়ে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যেন রেলগাড়িটাকে মনে হয় ঠেলা-গাড়ি। তবু রোদে নয়, ছায়ায় বাড়ে বেলা।

তারপর একসময় সবাই হুড়মুড় করে নামতে আরম্ভ করে। একটা ছোট্ট স্টেশন, যেন কুলগোত্রহীন চালচুলোহীন গেঁয়ো ছেলের শহুরে ঢং-এর মত। সমান্তরাল পাথুরে প্ল্যাটফরম, টিকিটঘর, সাইনবোর্ড, তারপরেই বেতবন ও আসশেওড়ার ঝোপ। ধার দিয়ে সরু পথ চলে গেছে মাঠের দিকে। বুনো বুনো গন্ধ।

ওরা সব গাড়ি থেকে নামতেই যেন যাত্রীরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, 'শালা, মাথার উকুন নামল।'

উকুনের দল পিলপিল করে রাস্তায় নামে। যাবার সময় স্টেশনের কুলীটাকে সবাই দুটো করে পয়সা দিয়ে যায়। ওটাই রেওয়াজ। কে আর রোজ রোজ টিকিটের জন্য বিবাদ করে।

চলে সবাই গঞ্জের দিকে। এখান থেকে ক্রোশখানেক দূর। তারপর ছোট নদী। নদীর ধারে গঞ্জ। সেখানে চালের আড়ত।

মাটি পায়ে ঠেকতে যেন আবার একটু দম ফিরে পায় সবাই। এখানে নেমেছে একটা দল মাত্র। বাদবাকীরা আগে নেমেছে। পরেও নামবে কেউ কেউ।

এ-দলটার সবার আগে চলেছে গোরা, তার বন্ধুরা চলেছে জোয়ান বুড়ো,

মেয়ে পুরুষ। যেন একটা মিছিল চলেছে। ধুলো আর ধূসর বেলায় যেন একটা ছায়া মিছিল।

মাঠে মাঠে ধানে পাক ধরেছে। নিরালা, জনশূন্য মাঠ।

হঠাৎ ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে আরম্ভ করে গোরাদের দলটা। যেন উচ্ছ্বসিত চড়ুই দলের হুটোপুটি খেলা।

তারপরে গঞ্জ। অমনি সকলে অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। যে যার কোমরে পকেটে হাত দেয়। বার করে তাদের প্রত্যহের মূলধন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোনে কত আছে। জানে না কত আছে, তবু গোনে। সন্তর্পণে মুঠো করে ধরে। তাদের জীবন, সেই সঙ্গে আরও অনেকের। যে পয়সা থেকে মরে গেলেও আধ পয়সা ছাড়া যাবে না। এমন কি এক পয়সার লজেন্স, দুটো মুড়ি বিস্কুট কিংবা বুড়ির মাথার পাকা চুল। কিছুই না। স্বাদ আস্বাদ খিদে ভালোবাসাও নয়।

আড়ত দু-তিনটে। সবাই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে ব্যাগ আর পয়সা নিয়ে।

দেখা গেল দর একটু চড়েছে। শরতের শেষ, হেমন্তে শুরু। নতুন চাল বাজারে বেরোয়নি এখনো। চাষী বিক্রেতা একটাও নেই। শহরের লোকগুলো হন্যে হয়ে ফিরছে চালের জন্য। শহরে চাল নেই রেশনের আধপেটা ছাড়া শহরের খুচরো দোকানওয়ালা তাই তখন ভারি খাতির করে গোরাদের।

ওদিকে নদীর বুকে নৌকা বোঝাই হচ্ছে চাল। যাবে কলকাতায়, কালো-বাজারে। যেমন যাবে গোরাদেরটা। ওদের নেই মোবাইল কোর্ট, পেছনে সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, পথে পথে পুলিশের জুলুম। গোরা বলে, 'ওরা এস্মাল্গার লয়, সরকারের বোনাই, তাই ঘর-কারবার।'

তারপর সবাই যায় গঞ্জের হোটেলে খেতে। কাঁচা মেঝেয় শুকনো কলা-পাতা। কিন্তু ভাতের গন্ধে যেন চারদিক ম ম করছে। একটু ডাল আর ভাত। রেট চার আনা।

গোরারা সবাই পাতাপাতি করে খায়। কারো কম কারো বেশি হয়। তারপর হঠাৎ খালিপাতের দিকে দেখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সবাই বোকার মত হাসে। আর এঁটো পাতাগুলো যেন সদ্য ধোয়াপাতার মত হয়েছে।

ম্যানেজারকে পয়সা দিয়ে, নদীর জলে আঁচিয়ে উঠে গোরা বলে, 'শালা কেষ্ট ঠাকুরের খুব খাওয়া হল। এই দ্যাখ্।' বলে পেটটা ফুলিয়ে দেখায়। আর একজন পেটা বাজায়। হাসি আর হল্লায় মনে হয় যেন বর্গী এসেছে গঞ্জে।

এস্মাল্গাররিনীর দলও খেতে বসে হোটেলে। সুবালা বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে ভাতের গরাস তোলে মুখে। বাইরে সদ্য খাওয়ার ঢেঁকুর তুলে সেইজন যেই গান গেয়ে উঠেছে:

বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও।

আবার ফিরে চলা। এবার আরও হুঁশিয়ার। পদে পদে আরও ভয়, আরও

উৎকণ্ঠা। আর সে শুধু প্রাণে নয়, ধনেও বটে। প্রাণ গেলেও এ ধন দেওয়া যায় না। এ যে মূলধন।

সবাই অভিন্ন একক এখানে। এক কথা, এক চিন্তা, এক ভয়, এক ভাবনা। এর বোঝা ও নেয়, ওর বোঝা এ নেয়। গোরা বলে, 'বিষ্ণুপিয়ে, তোমার বোঝাটা আমার মাথায় দেও।'

সুবালা হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, 'আর মরদগিরি করতে হবে না, চল দি নি।'

একটা বুড়ি তার বোঝাটা গোরার মাথায় তুলে দিয়ে বলে, 'নিবি তো, এটা নে বাবা।'

গোরা বলে, 'লোব গো বিষ্ণুপিয়ে?'

'পারলে নিবি।' জবাব দেয় সুবালা। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়, রুষ্ট হয় বুড়িটার উপর।

পিঠটা বেঁকিয়ে ঝুঁকে চলে গোরা। যেন একটা ভুমড়ানো কঞ্চি।

দেখা যায়, সবাই নানান কথায় জমে উঠেছে। পারিবারিক আর অতীত জীবন। কে কবে কাঁড়ি কাঁড়ি ভোগবতী চাল রেঁধে খাইয়েছে, কার উঠোন ভরে একদিন অমন পনের সের চাল চড়ুই পায়রায় খেয়েছে। কার ছেলে একটা চাকরি পাবে, কে পাকিস্তানে গিয়ে তার জমিজমা বিক্রি করে ড়-পয়সা নিয়ে আসবে, কার নিখোঁজ ছেলে নাকি সত্যি ডাক্তার ছিল।

সুবালা ভাবতে চেষ্টা করে তার নিখোঁজ স্বামীর কথা। আশ্চর্য! ক'টা বছর, তবু মুখটা একদম মনে পড়ে না। গোরা হঠাৎ বলে, 'বিষ্ণুপিয়ে।'

'কিরে।'

গোরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার কিছু ভালো লাগে না।'

হঠাৎ যেন সুবালার ফিক্ ব্যথা লাগল বুকে গোরার কথা শুনে। দেখে গোরার ক্লান্ত হাঁ মুখ, মাথার বোঝার তলায় দুটো ম্লান চোখ, সমস্ত মুখে যেন একটা কিসের আচ্ছন্নতা।

সুবালা তাড়াতাড়ি তাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে জিজ্ঞেস করে, 'কেন রে, কেন?'

জবাব দিতে গিয়ে ফিক্ করে গোরা হেসে বলে, 'তোমার গায়ে কি-সোন্দর গন্ধ।'

'ওমা! সে আবার কী?'

'হাঁ গো, আমার মার মতন।'

সুবালা আছাড় খেতে গিয়ে সামলে নেয়।

বেলা ঢলো ঢলো। আকাশ আরও কালো হয়। এবার স্টেশন, তারপরে গাড়ি।

গাড়িতে তুমুল ব্যাপার। তবে প্রাত্যহিক। মালে-মানুষে ঠাসাঠাসি।

দরজা দিয়ে জানলা দিয়ে গলে গলে ঢুকছে ব্যাগ আর মানুষ। গালাগাল, শিশুর কান্না, হকারদের চিৎকার। যেন গাড়ি নয়, চলন্ত হাট। কে ঠেলছে আর ঠেলা খাচ্ছে, কোন ঠিক নেই।

একফোঁটা গোরা যেন একটা অসুর। এরটা তুলে দেয়, ওরটা এগিয়ে দেয়। শেষটায় চাল বহনকারীর দল গাড়ির ছাদে উঠতে আরম্ভ করে। প্রাণের আশঙ্কা, কিন্তু না হলে নয়।

গোরা যেন জাদুকরের মত ভেতরে জায়গা করছে। এ একটা লাথি মারে, ও একটা চড়। যা-ই করো, উপায় নেই। বেশি কিছু বললে গাঁক করে কামড়েও দিতে পারে। কে যেন বললে, 'এই হারামজাদা।'

গোরা বললে, 'কে তবে কলির গাধা?' বলেই সড়াৎ করে এক বেঞ্চির তলা থেকে আর এক বেঞ্চির তলায় চলে যায়। লোকজন চিৎকার করে ওঠে। কেউ বলে চোর, কেউ পকেটমার।

সে বলে, 'আজ্ঞে না, গোরাচাঁদ এস্‌মাল্‌গার।'

ছুটছে গাড়ি, আর প্রত্যেকটা স্টেশন থেকে উঠছে চালবহনকারীর দল। মেয়ে পুরুষ বাছবিচার নেই। এ ওর বুকে, ও এর মুখে। তবে সেটা ভাববার অবকাশ নেই।

এর মাঝেও আছে গোরাদের ছুটোছুটি। আর প্রত্যেকটা স্টেশনে নেমে সন্ধান করছে, সামনে বিপদ ওৎ পেতে আছে কিনা। আবার দেখা যাচ্ছে দল বেঁধে সব স্টেশনে প্রস্রাব করতে বসেছে।

তারপরে একটা আপগাড়ির সঙ্গে তাদের দেখা হতে শোনা গেল সামনের জংশনেই মোবাইল আর সিভিল সাপ্লাই রয়েছে। অমনি কেউ কেউ ব্যাগসুদ্ধ লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করে। যেন তাড়া খাওয়া ব্যাঙের দল ডোবায় পড়ছে, কিন্তু সে আর ক-জন। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ট্রেনের শিকল কাঠের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা। সবাই চিৎকার করে বলাবলি করছে ফিকিরের কথা। কিন্তু ফিকির নেই।

গোরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে শূন্যে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে। বিহ্বল শূন্য মন। মনে পড়ল, জেল! সেটা কিছু নয়। কিন্তু মূলধন! ভাই বোন আর মা! তারা কি খাবে কাল? কেমন করে তাকাবে মা ওই অসহ্য অপলক দুটো চোখে। হঠাৎ সে ব্যাগ নিয়ে দরজার দিকে এগোয়।

বন্ধুরা বলে, ঝাঁপ দিবি!'

'না।'

'তবে?'

সুবালা ছুটে আসে। 'কোথা যাচ্ছিস?'

'ছেড়ে দেও বিষ্ণুপিয়ে!' হাত ছাড়িয়ে দিয়ে পাদানিতে নেমে পড়ে গোরা। আর নয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তার চেয়েও কঠোরতর পরীক্ষা সামনে।

একগাড়ি লোককে অসহ্য কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে পা-দানির শেষ ধাপে নেমে গেল। নিমেষে হারানো পাথুরে খোয়ার স্তূপ যেন জমানো সিমেণ্ট। তিন হাত দূরে লাইনের বুক পিষে চাকা ঘুরছে ঘরঘর্ করে। আধ হাত নিচেই মাটি।

গোরার চোখ রক্তবর্ণ, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা মুখে ঘাম। হাতের নীল পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। চকিতে মুখ বাঁধা চালের ব্যাগ হাতের মধ্যে গলিয়ে পা-দানির শেষ ধাপে ধীরে ধীরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আর একটু একটু করে তার দেহটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল গাড়ির তলায়। আস্তে আস্তে উঠে গেল ঠিক চাকার উপরে দু'টা বাঁকানো রড্ ও সংক্ষিপ্ত রেলিং-এর মাঝখানে। চাকার দু-তিন ইঞ্চি উপরেই তার একটা লিকলিকে ঠ্যাং ঝুলছে। কোন রকমে একবার ছুঁতে পারলেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত বাঘের মতন টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে।

তারপরে যেন অত্যন্ত রাগে ও ঘৃণায় চলন্ত চাকাটার গায়ে সে বার বার থুথু ছিটিয়ে দিতে থাকে। গাড়ির উপরে হাজারো গেল গেল শব্দ, বন্ধুদের উৎকণ্ঠা সুবালার মৃত্যু যন্ত্রণা সব যেন কেমন স্তব্ধ আড়ষ্ট বিকল হয়ে গেল।

তারপর জংশন স্টেশনের উন্মত্ত তাণ্ডব। পুলিশ, মোবাইল কোর্ট, সিভিল সাপ্লাই গাড়িটাকে ঘিরে ধরে সবাইকে নামাতে থাকে। আর মার খিস্তি চিৎকার আর কান্না। ছড়িয়ে পড়ছে কারো চাল, ছিটকে পড়ছে মুখ থুবড়ে কেউ। মারো আর উতারো। পুলিশের লাঠিতে তৈরি হয় বেড়া। সেই বেষ্টনীর মধ্যে একদিকে মানুষের স্তূপ, আর এক দিকে চালের। চাল আর এস্‌মাল্‌গার।

গাড়ির ঘটা পড়ল। সুবালা রুদ্ধ নিশ্বাসে বুক চেপে আপন মনে বলল, 'গোরা ধরা পড়বে না, কখনো না।'

কিন্তু পড়েছে। একটা তীব্র হট্টগোল ও ধস্তাধস্তির মধ্যে সবাই দেখল এক-টুকরো ন্যাকড়ার মত তাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করছে।

লাঠির বেষ্টনীর মধ্যে সবাই বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখল, অফিসারের সামনে তাদের গোরা, তাদের হিরো এস্‌মাল্‌গার। কি বলছে অফিসার। কিন্তু গোরা নিশ্চুপ।

তারপর এল একটা সরু বেত, খুলে দেওয়া হল গোরার জামা প্যাণ্ট। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল চালের স্তূপে তার পনেরো সেরের ব্যাগ। শেষবারের জন্য অফিসার চিৎকার করে উঠল, 'আর কোনদিন করবি?' গোরা শক্ত, নির্বাক। কেমন করে বলবে। সেখানে যে ওরা রয়েছে, মা আর ভাইবোন। তার বোবা মা। পরমুহূর্তেই বেতের ঘায়ের সপাং সপাং শব্দ ওই মানুষের স্তূপটাকে, স্টেশনটাকে, সর্ব চরাচরকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিউরে তুলল। নেমে আসা রাত্রি যেন যন্ত্রণার কালিমা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

স্টেশনে আলো জলছে। যেন অন্ধকার এখানে অনেক নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে।

গোরা এসে দাঁড়াল সেই মানুষগুলোর কাছে। উলঙ্গ, সারা গায়ে চিতাবাঘের মত লম্বা দাগ, হাতে জামা আর প্যান্ট। কিন্তু চোখে জল নেই, নাক দিয়ে শুধু সিকনি বেরিয়ে পড়েছে, ঠোঁটের দুই কষে ফেনা। ছায়াটা পড়েছে যেন উলঙ্গ আদিম কিম্ভূতাকৃতি একটা ওত পাতা মানুষের।

অসহ্য যন্ত্রণায় যেন সুবালার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে গেল। ঠাণ্ডা পাথরে জোরে ঠোঁট দুটো চেপে সে কেঁপে কেঁপে উঠল। সেই লোকটা অকারণ গুন্‌গুন্‌ করছে,

'বৈরাগী না হইও নিমাই…'

গোরার শূন্য চোখে ভাসছে, সেই কারখানার রাবিশের জলার ধারে, অন্ধকার আকাশের তলায় দুটো দিশাহারা চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা। ঘরে ঘুমন্ত পুতুল, রুগ্ন একটা মানুষ, আর বাইরের অন্ধকারে বোবা মায়ের অপরিসীম তীব্র প্রতীক্ষা।

নররাক্ষস

নররাক্ষস! নররাক্ষস!...

পুরুষের গম্ভীর গলায় ভয় দেখানোর সুরে, হঠাৎ কথাগুলো ভেসে এল: 'নররাক্ষস! নররাক্ষস এসেছে! আগেই বলছি, হুঁশিয়ার! এখানে নররাক্ষস এসেছে!'...

মিনু—মিনতি, রেল কোয়ার্টারের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে, কেরোসিনের স্টোভে চা তৈরি করতে বসেছিল। মাঘ মাস, বেলা আটটা। তারক স্টেশন থেকে আধ ঘণ্টার ফাঁকে কোয়াটারে এসেছে। এ সময়ে কোন গাড়ি নেই। ভোর ছ'টায় গিয়ে এ সময়ে সে রোজই চা খেতে আসে। আজ চা খেতে এসে মিনতির অদূরেই বারান্দার রোদে বসে সে তিনদিনের বাসি দাড়ি কামাচ্ছিল।

মিনতির স্টোভে যখন কেটলিতে চায়ের জল টগ্‌বগিয়ে ফুটছিল, জল ঢালার মুখ দিয়ে ধোঁয়া ফুঁসছিল, ঢাকনাটা বাষ্পের ধাক্কায় ঝিনিঝিনি শব্দে কাঁপছিল, যখন মিনতি বুকের কাছ থেকে টান দিয়ে কাঁধের আঁচলটা টেনে নামাচ্ছিল কেটলি তুলবে বলে; এবং আর তারকের সাবানাক্ত গালে যখন চোখ ঝলসানো শাণিত ক্ষুরটা কচ্‌কচ্ শব্দে লেহন করছিল, ঠিক তখনই নররাক্ষসের আগমনের সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। পুরুষের গম্ভীর গলার ঘোষণার মধ্যে ঈষৎ উত্তেজনা মেশানো, বিলম্বিত স্বরে একটু নাটকীয়তা ছিল। নাটুকে নাটুকে গলার সংবাদ ঘোষিত হচ্ছিল: 'নররাক্ষস এসেছে! নররাক্ষস! গরু সামলান, ভেড়া সামলান! ছাগল সামলান, মুরগী সামলান, নিজেদেরও সামলান, আগেই বলছি। নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস!'...

এই দূর রাঢ় অঞ্চলে, দিগন্তবিস্তৃত সদ্য ধান কাটা মাঠের নিরালায় ছোট এক স্টেশন-কেন্দ্রিক দু-একটি দোকান, দুটি রেলকোয়ার্টার, অদূরেই গ্রাম, মাঘের সকাল-রৌদ্রে পিঠ পেতে, জাগতিক তাবৎ টানাপোড়েনের কথা বিস্মৃত হয়ে যখন ওম করছিল, পৃথিবীতে যখন টেলিগ্রাফের তারে ফিঙের কচিৎ ডাক, ধান কাটা মাঠে বনচড়াইদের ঝাঁকে ক্ষুধাতৃপ্ত দু-একটি গলার খুশির শিস্ ছাড়া আর কোন শব্দই ছিল না, তখন পুরুষ গলার গম্ভীর নাটুকে স্বর বেজে উঠল।

মিনতির কেটলি নামানো হল না। তারকের হাত অচল। মিনতির চোখ আর স্টোভ বা কেটলির দিকে নেই, দেয়ালে ঠেস দেওয়া পুরনো ভাঙা আরশিটাতেও তারকের আর দৃষ্টি নেই। মিনতির চোখ তারকের মুখের দিকে। উৎকর্ণ তারকের দৃষ্টি উঠোনের ওপরে। মিনতির বাসি মুখে, প্রথম যতখানি জল দেওয়া সম্ভব, দেওয়া হয়েছে, যদিও তাতে, গত সন্ধ্যার সিঁদুরের টিপ এখনো লেপে যাওয়া অস্পষ্টতায় দৃশ্যমান, রাত্রের খাওয়া পানের ছোপ এখনো ঠোঁটে।

জিজ্ঞাসায় ভুরু বাঁকা, কালো চোখ দুটিতে যেন সহসা বিস্মিত উত্তেজনার ছটায় ঝিলিক হানছে, ঠোঁট দুটি টেপা। পিঠে রোদ, বুকের ও কোলের কাছে জ্বলন্ত স্টোভ। স্বভাবতই সদর বন্ধ, স্বামী সান্নিধ্যের নিরালায়, রোদের ও আগুনের উত্তাপ আদায়ের প্রত্যাশায়, শাড়ি অগোছালো, জামার বোতাম খোলা। এখন স্বামীর কাছে আর গোপনতার ঢাকাঢাকি নেই, ঔদাস্যই সুন্দর, যেহেতু সন্তানেরা ও স্বামী সকলেই এই দেহকে ঘিরেই রকমে রকমে বিকশিত। হয়তো এই দূরে নিরিবিলি নিরুদ্বেগ সংসারে, খুশি স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে থাকবার সুযোগ ছাব্বিশ সাতাশে মিনতির স্বাস্থ্য দীপ্তি বর্তমান। যেমন ফলন্ত বনলতারা হয়, পুষ্ট পরিপূর্ণ উজ্জ্বল, আপন ফলভারে যে নত হয়েও বলিষ্ঠ সুন্দর। খোলা জামার ফাঁক দিয়ে বুকে যেখানে কয়েকটি রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে, যেন নখে বিঁধে রক্তপাত হয়ে জমে গিয়েছে, আসলে সেটা ছোট মেয়ে আড়াই বছরের খুকুর নখে লাগানো কুমকুমের দাগ। গতকাল সন্ধ্যায় যখন নিজের নখ রাঙিয়েছিল মিনতি, মেয়েকেও তখনই লাগিয়ে দিতে হয়েছিল এবং কোন্ ফাঁকে যেন গা খোলা বুকে লাগিয়ে দিয়েছিল, অথচ ওঠানো হয়নি। ভুরে শাড়ির আঁচল ধরে, কেটলির দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েও, উৎকর্ণ বিস্ময়ে নিশ্চল।

তারকের অবস্থাও তথৈবচ। হাড় চওড়া লম্বা শরীরটা অনড়। গায়ে নীল গরম কোটের বোতাম খোলা। তলায় জামা নেই, গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। অস্নাত চুল উস্কখুস্ক, পঁয়ত্রিশেই জুলফির কাছে কিছু কিছু রুপোলী রং ধরেছে। যদিচ একটি নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততা চোখে মুখে শরীরে নিবিড় হয়ে উঠেছে। উঠোনের দিকে দৃষ্টিতে তার বিস্ময়ের সঙ্গে যেন কোন এক সুদূরে হারিয়ে যাওয়ার আভাস। সে কারণে সে হতচকিত হয়ে মিনতির দিকে তাকায়নি, আপনাতে আপনি হারিয়েছে।

তারপরে সহসা যেন মিনতির দৃষ্টি তাকে সচেতন করল। সে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট খুশি ও বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল, 'নররাক্ষস এসেছে?'

সেই মুহূর্তেই কেটলির ফুটন্ত জল উত্তেজনার চরমে উপচে পড়ল, আর কেরোসিনের স্টোভের কয়েকটা শিখা নিভে গিয়ে ফোঁসফোঁস শব্দ করে, কালো ধোঁয়ার কটু গন্ধ ছড়াল। মিনতি ঝপ্ করে কেটলিটা ধরে নামাল। তারকের কথারই জবাব দিল তাড়াতাড়ি, 'তাই তো গো। কী ভীষণ যে চমকে উঠেছি না!'

তারক অবাক হেসে বলল, 'আমি তো কানে যেতেই চমকে উঠেছি, এ আবার কে রে বাবা!'

মিনতি বলল, 'উঃ, কত বছর বাদে কথাটা শুনলাম!'

বলে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল, দৃষ্টিতে একটি নিবিড়তা ফুটে উঠল, আবেশ যেন নেমে এল। এবং দুজনেই তারপরে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল।

তারক বলে উঠল, 'আশ্চর্য!'

মিনতি বলল, 'আমার খুব মজা লাগছে, জানো? ওই মেলাতলা থেকে বলছে তো, না?'

তারক বলল, 'তা ছাড়া আর কোত্থেকে বলবে। কাল থেকে তো মাঘের মেলা শুরু হয়েছে।'

গতকাল থেকে স্টেশনের ওপারে, রাধাকান্ত জীউর মাঠে, মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমানন্দ ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব শুরু হয়েছে। মাঘী পূর্ণিমা সেই তিথি। তার এখনো কয়েক দিন দেরি আছে। ভক্তরা উৎসব শুরু করে দেয় আগেই। সেই উপলক্ষে প্রতি বছরই মেলা। দিনে দিনে মেলা বড়ই হচ্ছে। খাবার আর মনোহারী দোকানের সঙ্গে আস্তে আস্তে নানান্ জাদু আর সার্কাসের দল আজকাল ভিড় করে। নররাক্ষসের আবির্ভাব এই বছরেই প্রথম। মাইকে সেই ঘোষণাটি চলছে। অন্তত গত চার বছরের মধ্যে নররাক্ষসের আবির্ভাব হয়নি, এটা তারক আর মিনতি জানে। চার বছর হল, তারক এই দূর নিরালা স্টেশনে অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন-মাস্টার হয়ে এসেছে। ছোট মেয়েটির জন্মও এখানেই হয়েছে। চার বছরের মধ্যে অনেক রকমের খেলা এসেছে, নররাক্ষস আসেনি।

একটু বিরতি দিয়ে, আবার সেই মোটা বিলম্বিত সুরের নাটুকে গলা ভেসে এল, 'নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস। ধরবে আর কাঁচা খাবে। হাঁউ!'...

বাঘের মত গর্জন করে উঠল মাইকে। মিনতি আর তারক, দুজনেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এই ঘোষণা শুনতে লাগল। আবার তাকাল দুজন দুজনের দিকে। মিনতির কালো চোখের তারায় যেন ঝিলিক হেনে উঠল, দৃষ্টি নিবিড়তর হল এবং দুজনেই আবার হেসে উঠল।

তারক বলে উঠল, 'আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে, সত্যি বলছি।

মিনতি যেন আচ্ছন্ন নিবিড় হাসি হেসে বলল, 'আর, আমার যে কত কথা মনে পড়ছে, উঃ!'

তার কথা শেষ হবার আগেই, তারক হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে আরশির দিকে ফিরে বলল, 'ওগো, আর নয়, আটটা বেজে গেল, তাড়াতাড়ি চা কর।'

সে গালে ক্ষুর চালাল। মিনতি চা তৈরিতে মনোযোগ দিল। কিন্তু তার মুখের অন্যমনস্ক হাসিটি গেল না। হাতের কাজ হচ্ছে নিতান্ত অভ্যাসে, কিন্তু মন দূরান্তে। অনেক কথা তার মনে পড়ছে। ওদিকে ঘর ঝাঁট দিয়ে বাউরি বউটি রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছ'বছরের বড় মেয়েটি, নাম রুণু, বাউরি বউয়ের পিছনে পিছনে ঘুরছে।

তাদেরও আলোচ্য বিষয় নররাক্ষস। রুণু জিজ্ঞেস করছে, বউ কখনো নররাক্ষস দেখেছে কি না। বউ জবাব দিচ্ছে, 'না গো খুকী দিদি, কখুনও দেখি নাই। আজ যেয়ে দেখতে লাগবে।' কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে, তাই নিঃ। তাদের আলোচনা থামল না।

মিনতি চায়ে দুধ মেশাতে মেশাতে, গালের ওপর, রুখু চুলের পাশ থেকে তারকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি গো, তোমার মেয়েই যে নররাক্ষস চেনে না।'

তারকও নিতান্ত অভ্যাসে ক্ষুর চালাচ্ছিল। সেও অন্যমনস্ক, মন যেন কোন্ দূরে উধাও। মিনতির কথার জবাবে শুধু হাসল। মিনতি চায়ের কাপটা তারকের দিকে এগিয়ে দিয়ে, ঠোঁট টিপে হেসে এক ঝলক আবার দেখে নিল। তারপরে বলল, 'এখন আর পারবে?'

তারক পোয়াভর ওজনের ফটকিরিটা জলে ভিজিয়ে গালে বোলাতে লাগল, হঠাৎ কোন জবাব দিল না। তার মুখেও হাসি, এবং হাসিটা তেমনি অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন। হাত থেকে ফটকিরির টুকরোটা নামিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের করেই সে মুখটা মুছে নিল। তারপরে বলল, 'দূর! আর ওসব হয় নাকি? এখন ভাবতেই পারি না।'

সে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল। মিনতির দিকে তাকাল। মিনতির দৃষ্টি তখন পাঁচিল টপকে দূরে নিবদ্ধ। তার অস্তিত্ব যেন আর এখানে নেই।

তারক বলল, 'তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, খাও।'

মিনতি যেন দূর থেকে মন নিয়ে ফিরে এল। প্রায় আদুরে গলায় ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'জুড়োক গে, আমার এখন চা খাবার মন নেই।'

বলেই, হেসে উঠে, চোখ উজ্জ্বল করে বলল, 'আজকাল সব কিছুই মাইকে বলে। সে সময়ে, আমাদের পাড়ায় কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে, খবরের কাগজের ওপর লিখে পোস্টার দেওয়া হয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, পোস্টারে কী লেখা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, "নররাক্ষসের খেলা, জীবন্ত পশু ভক্ষণ। কালাচাঁদবাবুর মাঠে, বিকেল পাঁচটায়। পুরো টিকেট দু-আনা, হাফ টিকেট এক আনা।" তাই লেখা ছিল না গো?'

তারক হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'আমার মামাতো ভাই বিশু ওগুলো লিখে লিখে দেয়ালে সেঁটে দিত। তোমার তো সব মনে আছে দেখছি?'

মিনতি ঘাড় বাঁকিয়ে, ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি বুঝি ভুলে গেছে সব?'

তারক হাসতে হাসতেই বলল, 'হ্যাঁ, ও আবার কেউ মনে করে বসে থাকে নাকি?'

মিনতির দুই চোখ বিস্মিত অভিমানে ভরে উঠল। সে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। তারক চায়ের কাপ নামিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে, বলে উঠল, 'আরে তা বলে কি আর সেই ইস্কুল মাস্টারের মেয়েটির কথা ভুলে গেছি, যে মেয়েটি নররাক্ষসকে একটুও ভয় করত না, বরং জিভ ভেংচে দিত?'

বলে, নিচু হয়ে আলগোছে মিনতির গালটা একটু টিপে দিয়ে, উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে দৌড় দিল। গলাবন্ধ গরম রেলকোটের বোতাম বন্ধ করতে করতে বলল, 'চলি, আপ গাড়ি আসবার সময় হল।'

তারকের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে, কোপ কটাক্ষে হাসতে গেল মিনতি,

কিন্তু মুখের অভিমান বিষণ্ণ বিধুরতাটুকু ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারল না। ও আস্তে আস্তে নিজের গালে হাত দিল, যেখানে তারক আলগোছে টিপে দিয়ে গেল। তারপরে ওর মনে হল, তারক মিছে কথা বলেনি। সত্যি ওর আর সে সব কথা মনে নেই। ন'বছর আগের সেই দিনগুলো। ওর অবহেলাভরে উচ্চারণের মতোই, সেই দিনগুলো বিস্মৃতির চির অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়ে, যেন সব কিছু চুকিয়ে বুকিয়ে, একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে বসে আছে। এখন একেবারে নিস্তরঙ্গ, এখন শুধুই অভ্যাস এই জীবনটা। প্রত্যহের অভ্যাস।

মিনতিও নিশ্চয় মনে করে বসে নেই সব সময়ে। কিন্তু ন বছর আগের সেই দিনগুলো আছে সব সময়ে। মনের তলে সে ঘুমিয়ে আছে, স্পর্শ পেলেই জেগে ওঠে। চমকে চমকে জেগে ওঠে আর চোখ বেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে একটি চেনা মুখ দেখতে গিয়ে, বারে বারেই একটি অচেনা মুখকে দেখতে পায়। চেনা শুধু মুখের অবয়বটি, আর সবই অচেনা। চোখের দৃষ্টি, হাসি, গলার স্বরও। সেই তারক আর নেই।

নিশ্চয় সেই মিনতিও আর নেই। হয়তো তারও অবয়বটিই মাত্র আছে, কিন্তু দৃষ্টি বদলে গিয়েছে, হাসি বদলে গিয়েছে, গলার স্বরও। তবু মনের তলার সেই ঘুমন্ত অনুভূতি যখন স্পর্শে জেগে ওঠে, তখন তার সেই মিনতি হতেই ইচ্ছে করে। তারকের সেই ইচ্ছেও যেন আর নেই। এখন সবকিছুই, এমনি নিরাবেগ হাতে, আলগোছে গাল টিপে দেওয়া। এরপরে আপ গাড়ি এলে, স্টেশনের কুলি, উপরি পাওনার গৌরব ঘাড়ে বয়ে নিয়ে এসে মাঠাকরুণের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

মিনতির সহসা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর তখনই আবার মাইকের শব্দ শোনা গেল, 'সাবধান! সাবধান! নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস! চুপিচুপি আসবেন, পয়সা নিয়ে আসবেন, বড়দের চার আনা, ছোটদের দু-আনা। হাতে পায়ে শেকল দিয়ে বাঁধা নররাক্ষস, বেলা দুটোয় দেখতে পাবেন। জ্যান্ত হাঁস-মুরগী-পায়রা ধরে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, জ্যান্ত পাঁঠার ঘাড় মটকে খায়! নর-রাক্ষস, নররাক্ষস!'—

মিনতি ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ করল, 'নররাক্ষস!' তার চোখের সামনে তখন ভাসছে, তাদের চব্বিশ পরগণার সেই শহরে, কালাচাঁদবাবুর মাঠে চট-ঘেরা জায়গা। স্টেজের ওপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা তারক, উজ্জ্বল রং তারক, চওড়া বুকটা তার টকটকে লাল। মুখটাও লাল, চোখগুলো পাকানো। গুটিয়ে পরা কাপড়ের নিচে পেশল উরু ও জঙ্ঘা, দড়ি দিয়ে বাঁধা বলিষ্ঠ হাত। দু'হাত বাড়িয়ে দাপাদাপি করছে, হুংকার ছাড়ছে, আর পায়ের কাছে বাঁধা মুরগী তুলে নিয়ে, ডানা ছিঁড়ে, বুক চিরে, রক্ত বের করে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে চিবুচ্ছে। মুরগীটা চিৎকার করে ককিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তারকের গালের দু-পাশে রক্ত বেয়ে পড়ছে। মিনতি আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে, ছোট বড়

সকলেরই চোখেমুখে একটা যেন আতঙ্কের ছায়া। তারকের হুংকার শুনলেই সব চমকে উঠছে। কিন্তু মিনতির প্রাণে কি একটু ভয় ছিল না? সংসারের সকল জটিলতার মতোই, মিনতির চোখে ঠোঁটের সেই মুগ্ধ হাসি! সবাই যখন ভয়ে জড়োসড়ো, তখন তার মনে হত, বেশ লাগছে বিশুদার পিসতুতো ভাইকে দেখতে!

পাড়ার বিশুদার পিসতুতো ভাই তারক, তারক ব্যানার্জী। মামার বাড়ি কতবারই তো বেড়াতে এসেছে। কিন্তু নররাক্ষসের খেলা কখনো দেখায়নি। তাই তেমনভাবে কখনো চোখে পড়েনি। ম্যাট্রিক পাস বেকার যুবক, চাকরির ধান্দাটাই আসল। নররাক্ষসের খেলা কোথা থেকে শিখে এসেছিল। আর সেইবারে এসে ছ'মাস ছিল বিশুদাদের বাড়িতে। তখন নররাক্ষসের খেলা বারো তেরো দিন ধরে রোজ হয়েছিল। মিনতিদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় বিশুদার বাড়ি। খেলা দেখার পরেই মিনতি বিশুদের বাড়ি যেত। নররাক্ষসের টানে নররাক্ষসটা যে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। হেসে বলত, 'নররাক্ষস দেখতে এসেছ? ভয় করে না?'

মিনতি ঠোঁট উল্টে জবাব দিত, 'নররাক্ষস না ছাই! দিব্যি তো খাচ্ছেন।'

তারক বলত, 'ও! দেখবে তবে?'

মিনতির বাঁকা ঠোঁটের ওপর, দৃষ্টিও তির্যক হয়ে উঠত। বলত, 'দেখান না কী দেখাবেন।'

বোঝা যেত, নররাক্ষসটার দু-হাত যেন মিনতির দিকে এগিয়ে আসার জন্তে থরথর করছে। চোখের তারায় ঘিরে আসত নিবিড়তা। মিনতির ওপর থেকে তার সম্মোহিত দৃষ্টি ফেরাতে পারত না।

আর মিনতি! মিনতিরও বুকের মধ্যে থরথরিয়ে কাঁপত না? তার সমস্ত শরীর যেন একটি ছিনিয়ে নেবার প্রতীক্ষায়, একটি পেশল বুকের আকর্ষণে একটি অসহায় আবেশে দুলে উঠত না? তারপর যখন দেখত, নররাক্ষসটার পা সত্যি বাঁধা, হাত বাঁধা, লোকলজ্জা আর সঙ্কোচের দড়িতে, শুধু চোখের তারায় অসহায় ব্যাকুলতা, তখন নিজের ইচ্ছেয় যেন ঠিক নয়, মিনতির জিহ্বা আপনি বেরিয়ে এসে, নাক কুঁচকে দেখিয়ে, দৌড়ে পালিয়ে যেত, এবং বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে নররাক্ষসের মুখখানি ভুলতে পারত না।

কেন? আশ্চর্য! নররাক্ষসটার অমন পশুপাখি ছিঁড়ে খাওয়া দেখেও আর সব মেয়েদের মতোই মিনতির গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠত না কেন? শিউরে উঠত না কেন? তারককে অন্ত সময় সুবেশ যুবকের বেশে দেখা যেত বলে, না ওর চোখের তারার নিবিড় ঘনতায়? মিনতির দিকে তাকিয়ে ওর সেই অসহ মুগ্ধতায়? কিন্তু তারক তো নররাক্ষস। ওর সেই রূপ দেখেও তো মিনতি যেন একটি আনন্দের উত্তেজনা বোধ করত। অথচ ও ছিল এক স্কুল মাস্টারের মেয়ে। বাবা ছিলেন নিরীহ ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, মা ছিলেন শান্ত। যে লোকটি দুর্জয়

নিষ্ঠুর হিংস্র দৃশ্যের অবতারণা করে, তার প্রতিই কে টেনেছিল ওকে? নররাক্ষসের খেলা দেখতে ওর বাবা মা কোনদিনই যাননি। মা বলতেন, 'মানুষ পশুর মতন কাণ্ড করবে, তাই আবার দেখতে যায় কেউ? ছি!' অথচ তাদেরই সন্তান সেই নররাক্ষসকে দেখে মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেছিল। কী একটা অনুভূতি যে মিনতিকে উষ্কার বেগে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আজও তার সঠিক ব্যাখ্যা জানা নেই ওর। কখনো মনে হত তারক কী সাংঘাতিক, কিন্তু কী সুন্দর! কখনো মনে হত, যে দাঁত দিয়ে ও জীবন্ত পশুপাখি ছেঁড়ে, সেই ঝকঝকে দাঁতেই তো মিনতির দিকে তাকিয়ে অপূর্ব হেসে, মন ভুলিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে মনে হত, তারক যদি ওই দাঁত দিয়ে আমাকে—আমাকে···। ভাবনাটা শেষ করতে পারত না। এক বিচিত্র শিহরণে, ওর সর্বাঙ্গে একটা আবেশ ঘনিয়ে আসত। কিন্তু তার মধ্যে কোন ভয় বা যাতনা ছিল না।

তারপরেই তো একদিন নররাক্ষসটার হাত পায়ের বাঁধন খুলে গিয়েছিল। এক সাঁঝ আঁধারে, বিশুদের দোতলার দালানে, সত্যি মিনতিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। যেন আছড়ে ফেলেছিল তার পেশল বুকে, আর দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে নররাক্ষসটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুখের ওপরে। আঃ। নররাক্ষসটা যেন ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছিল মিনতিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে মারতে চেয়েছিল নাকি?

তবু—তবু সেই যে এক প্রতীক্ষার থরথরানি ছিল মিনতির, সেই যে এক অসহায় আবেশ আবর্তিত হচ্ছিল, তারকের বাহুবেষ্টনের মধ্যে, একবার থমকে গিয়ে পরমুহূর্তেই সে যেন এক নামহীন সুধারসে ডুবে গিয়েছিল। অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল যেন। নররাক্ষসটার পেষণে, নিঃশ্বাস বড় হয়ে মরতেও যেন সুখ বোধ হচ্ছিল।

সেই সাঁঝ আঁধারের পর থেকে, কয়েকদিন ধরে শুধু সাঁঝ আঁধারের প্রতীক্ষাতেই দিনগুলো কাটত। বিশুদের পুরনো সেকেলে বাড়িতে লোক ছিল কম। দেখা সাক্ষাতের অসুবিধে ছিল না। কয়েকদিন পরেই, তারকের চুপিচুপি স্বরে উচ্চারিত হয়েছিল, 'চাকরির চিঠি পেয়েছি। আর তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের পাল্‌টি ঘর। কোথাও আটকায় না। প্রস্তাবটা করে ফেলি?'

'জানি নে' বলে পালিয়ে গিয়েছিল মিনতি। পরদিনই ঘটকালি করেছিলেন বিশুদার মা। কোন বাধা উপস্থিত হয়নি। মিনতির তখন পরিপূর্ণ আঠারো। বাবা মা নররাক্ষসের কাণ্ড দেখতে যাননি, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠেছিলেন। উদ্যোগী হয়ে তারকের বাবার কাছে ছুটেছিলেন মিনতির বাবা। আর তারক চাকরিতে যোগ দেবার আগেই, বিয়ে মিটে গিয়েছিল। পাড়ার বান্ধবীরা মিনতির দিকে তাকিয়ে, চোখ বড় বড় করে বলেছিল, 'শেষে নররাক্ষসী হলি?'

মিনতি তারকের বুকের ওপর পড়ে বলেছিল,—'তোমার নররাক্ষসের খেলায় কী হবে?'

তারক হেসে বলেছিল, 'কী আবার হবে। বন্ধুদের সঙ্গে একদিন বাজি ধরে জ্যান্ত মুরগী ছিঁড়ে, কাঁচা মাংস খানিকটা চিবিয়ে ফেলেছিলাম। সেই থেকে নররাক্ষস বনে গেছলাম। ওটা তো আমার পেশা নয়। বন্ধুরা জোর করে ধরলে, দেখাতে হয়।'

একটু থেমে, আবার বলেছিল, 'জানি তোমার বাবা মা পছন্দ করেন না। তোমার বাবা বলেছেন, ও খেলাটা যেন আমি আর কোথাও না দেখাতে যাই। আর যাবও না।'

মিনতি হতাশ বিস্ময়ে বলেছিল, 'কেন? বেশ তো লাগে। খেলা দেখাবে, তার আবার ভাল মন্দের কী আছে?'

তারকও অবাক হয়েছিল মিনতির কথা শুনে, তবু 'বেশ লাগাটাকে' বিশ্বাস করেনি। বলেছিল, 'চাকরি করে আর সময়ই বা পাব কোথায়? কে-ই বা দেখতে চাইছে নররাক্ষসের খেলা।'

তারক কোনদিন বুঝতে পারেনি, মিনতির মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। আর বিমর্ষ হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নিজে খুঁজে পায়নি মিনতি। তারপরে অফিসে বন্ধুদের তাগিদে, দু-একবার দেখিয়েছিল, বিয়ের প্রথম বছরে। আর নয়। এক সময়ে এসেছিল বদলির ধাক্কা। তিন ঘাটের জল খাবার পর, দূর রাঢ়ের এই স্টেশনে এসে আপাতত নোঙর বাঁধা হয়েছে।

কিন্তু নররাক্ষস? সে তো কবেই হারিয়ে গিয়েছে। আজ আবার এই কোন্ নররাক্ষস এল, কার বার্তা ঘোষণা হচ্ছে এই মাঘের সকালে।

অই মা, আপনকার চা যে কখুন জুড়িয়ে যেইলেন গ ঠাকরুণ, খাবেন নাই?

ঝি বাউরি বউয়ের কথায় চমকে উঠল মিনতি। তাই তো চা পড়ে রয়েছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অমন নেশার জিনিস, ঘুম থেকে উঠে মুখে না দিলে রাতের জড়তা কাটে না। তাই ভুলে বসে আছে সে। এখনো রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। চান করে রান্না বসাতে হবে। বারোটা না বাজতেই তো তারক এসে পড়বে। খেয়ে দেয়ে তিনটে পর্যন্ত ঘুম দেবে। আবার সাড়ে তিনটেয় ছুটবে স্টেশনে? তখন একটা গাড়ি আসবে।

মিনতি ঠাণ্ডা চা-ই খেল। চান করতে গেল, রান্নাও বসাল। স্টেশনের খালাসি এসে বাজার দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ সবই মন্থর। কেমন যেন গা টিস্‌টিস্ ভাব। কাজের মাঝে যতবার নররাক্ষসের আগমন ঘোষিত হল, ততবারই কান পেতে শুনল। তারপরে যখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিতে পারল, আজ বেলা ছুটোয় নররাক্ষসের খেলা দেখতে যাবে, তখন দশভুজা হয়ে উঠল। রান্না মিটল চোখের পলকে। রুণু আর খুকু, দুই মেয়েকে খাওয়ানো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারক এসে দেখল সব কিছু তৈরি।

তাকে খেতে দিয়েই মিনতি ঘোষণা করল, আজ দুপুরে সে নররাক্ষস দেখতে যাবে। খেতে খেতে তারকের প্রায় বিষম লাগার অবস্থা। বলল, 'এই দুপুরে?

আমি কিন্তু যেতে পারব না।'

নিপাট গৃহিণীটি আজ যেন কেমন অল্পবয়সী বালা হয়ে উঠেছে। মিনতি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'একদিন একটু না ঘুমোলে নয়, না? মেয়ে দুটোকে নিয়ে ওই মেলার ভিড়ে আমি সামলাতে পারব?'

তারক বলল, 'বউকে নিয়ে যাও না।'

অর্থাৎ ঝি-কে। মিনতি বলল, 'হ্যাঁ, হাঁদা বউটাকে নিয়ে কখনো তাই যাওয়া যায়? তুমি যাবে কিনা পরিষ্কার বলে দাও।'

মিনতির মুখ থমথমিয়ে উঠল। কালো চোখ দুটিতে দুর্জয় অভিমানের ঝিলিক। তারক আস্তে আস্তে মুখের গরাস গিলে, জল খেল। তারপর মুখ টিপে হেসে বলল, 'আর নররাক্ষস দেখে কী হবে। এক নররাক্ষসকে তো অনেকদিনই কাত করেছ।'

মিনতি ফোঁস করে উঠল, 'ফাজলামি করো না। যাবে কিনা বলে দাও।'

তারক লম্বা ঢেকুর তুলে বলল, 'আরে বাপু, বেলা দুটোয় তো? তার মধ্যে তো একটু গড়িয়ে নিতে পারব। আমাকে ডেকে দিও।'

নররাক্ষস, নররাক্ষস! জ্যান্ত পাঁঠা ছিঁড়ে খায়, জ্যান্ত পাখি চিবিয়ে খায়। ভয় পাবেন না, দেখে যান। চার আনা, দু-আনা, চার আনা, দু-আনা!...

মাইকে সেই গলাটাই চিৎকার করছে। সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে যেন কানে তালা লেগে যাচ্ছে। কাছাকাছি আরো নানান্ খেলার তাঁবু পড়েছে। ব্যাটারিওয়ালা মাইকে সবাই সবার প্রচারে গলা ফাটাচ্ছে। মেলা বেশ জমেছে। মিনতির ঠোঁটে যেন একটু শ্লেষের হাসি লেগেছিল, তবু দু-চোখে কৌতূহলের অন্ত নেই। তারকের কোলে খুকুকে দিয়ে, রুণুর হাত ধরে সে, নররাক্ষসের তাঁবুর গায়ে, রকমারি ছবি দেখল। নররাক্ষস জ্যান্ত পশুপাখি খাচ্ছে, মুখে বুকে রক্তের ছড়াছড়ি। সবাই যখন ড্যাবা ড্যাবা চোখে, হাঁ করে সেই ছবি দেখছে, মিনতির ঠোঁটে তখন বক্র হাসি। মনে মনে বলছে, 'ঢের দেখেছি!'

আর ঢের দেখা লোকটি তখন, মেয়ে কোলে করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকেছে টিকিট কাটবার জন্যে। হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলল, 'আরে মাস্টারমশাই, আপনি কোথায় টিকেট কাটতে যাচ্ছেন? ছি ছি ছি, রাধাকান্তর মেলায় ইস্টিশন মাস্টের পয়সা দিয়ে খেলা দেখবে, রাম্ রাম্। আসুন দেখি এদিকে।'

যে লোকটি মাইকের সামনে চিৎকার করছিল, সে নিজে এগিয়ে এসে নমস্কার করে আহ্বান করল, 'আসুন সার আসুন। আমাদের না চিনিয়ে দিলে চিনব কী করে বলুন।'

তারক খুশি বিব্রত মুখে একবার মিনতির দিকে তাকাল। তারপর হাসতে হাসতে ভিতরে গেল। একেবারে স্টেজের সামনে তাদের বসতে দিল। পর্দা ঢাকা স্টেজ। মিনতির সমস্ত কৌতূহল ক্রমে একটা উত্তেজিত কেন্দ্রে এসে সূচ্যগ্র হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে পর্দাটা দুলে উঠলে, তার বুকের মধ্যে ধকধকিয়ে

উঠছে। এই বুঝি উঠল!...ঝুনু যে কী বকবক করছে, তার কানে যাচ্ছে না। তারক যে ছোট মেয়েটাকে নিয়ে বেসামাল হচ্ছে সেদিকেও তার খেয়াল নেই বরং বেসামাল লোকটাকেই সে জিজ্ঞেস করছে, 'এদের শুরু হবে কখন?'

তারক জবাব দিয়েছে, 'কী জানি। আজকাল আবার কী কায়দা হয়েছে, কে জানে।'

আসলে তাঁবুর ভিতরে জনতার স্থান পূর্ণ না হলে, খেলা শুরু করা যায় না। এবং তাই হল। যখন আর তিল ধারণের জায়গা রইল না, যারা আগে ঢুকেছে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ভেঙে পড়বার উপক্রম হল তখন হঠাৎ স্টেজের ভিতর থেকে গর্জন শোনা গেল। গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা উঠল। অন্ধকার মঞ্চ। কিছুই দেখা যায় না। কেবল দাপাদাপি আর গর্জন শোনা যাচ্ছে তার পরেই হঠাৎ এক কোণে একটা আলোর রেখা ফুটে উঠল, আর সেই আলোয় দেখা গেল, একটা পেশল শরীর ঝাঁকড়া-চুলো ভয়ঙ্কর দর্শন লোক হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে।

গোটা তাঁবুর লোকগুলো যেন রুদ্ধশ্বাস। একটা পিন পড়লেও শব্দ হয় বুঝি। নররাক্ষসকে দেখতে পাওয়া গেছে! নররাক্ষস! কিন্তু মিনতি উত্তেজিত মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে, এ ঠিক তারকদের সেই খেলার মতো নয়। এখানে অভিনয় আছে, মঞ্চসজ্জা আছে।

হঠাৎ নররাক্ষস চিৎকার করে জনতার দিকে ছুটে আসতে চাইল। আর তখনই দেখা গেল, তার হাত পা বাঁধা। সে আসতে পারছে না, তাই আরো জোরে চিৎকার করছে। সেই সময় একটা গলার স্বর শোনা গেল, 'কী রে রাক্ষস, তোর খিদে পেয়েছে?'

নররাক্ষস' চিৎকার করে সম্মতি জানাতেই একটি জ্যান্ত মুরগী এসে তার হাতের সামনে পড়ল। মুরগীটা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু মুহূর্তে তাকে ছিঁড়ে চামড়া ছাড়িয়ে লাল দগদগে মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল রাক্ষস। আর সেই সঙ্গেই গর্জন।

এই খেলা শেষ হতেই পর্দা নেমে এল। এরপর দু-নম্বর খেলা। মিনতি তাকাল তারকের দিকে।

তারক হেসে বলল, 'কায়দাকানুন খুব করেছে।'

মিনতি নিচু গলায় বলল, 'তুমি এখন পারবে?'

তারক বলল, 'তা কী জানি। চেষ্টা করলে হতে পারে। কিন্তু নররাক্ষসটির মুখ যেন একটু চেনা লাগল। মুখে রং মেখেছে বলে বুঝতে পারলাম না।'

মিনতি অবাক কৌতূহলে বলল, 'চেনা নাকি?'

তারক বলল, 'মনে হল যেন।'

মিনতি বলে উঠল, 'তাহলে বেশ হয়!'

তারক মুখ নামিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'তা হলে আর একটাকে কাত করবে?'

পিনাকী নিচু হয়ে মিনতিকে প্রণাম করতে গেল। মিনতি যেন লজ্জায় কাঁটা হয়ে উঠল। তার মুখ আরক্ত, চোখে সলজ্জ কৌতুকের হাসি। দু-হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'না না, ও কি!'

ঈষৎ নিচু হতে গিয়ে তার ঘোমটা খসে গেল, বিনুনি দেখা গেল। তুলে দেবার কথা তার মনে এল না।

পিনাকী বলল, 'তা বললে কি হয় বউদি? তারকদার বউ আপনি। বউভাতে পরিবেশন করেছিলাম সে কথা ভুলে গেছেন।'

তারক বলে উঠল, 'তার ওপরে আবার নররাক্ষস দাদার বউ!'

বলেই, মিনতির বাধা ডিঙিয়ে ঝপ্ করে পিনাকী একবার পা স্পর্শ করে নিল। তারপরে দু-একটি নিতান্ত জীবনধারণের কথাবার্তা, মেলার ব্যবসার হালচাল ইত্যাদি কথাবার্তা বলে, বিদায় নেবার মুহূর্তে মিনতি বলে উঠল, 'সারাদিন তো আর খেলা দেখান না, যখন সময় পাবেন, চলে আসবেন আমাদের বাসায়।'

পিনাকী বলল, 'যাব বৈ কি, এসেছি যখন নিশ্চয়ই যাব।'

তারক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আসা চাই কিন্তু। সত্যিই তো, সারাদিন এই গুমসো তাঁবুর মধ্যে বসে করবেই কী। সময় পেলেই চলে আসবে।'

মিনতি ইতিমধ্যে তাকিয়ে দেখছিল পিনাকীকে। রংটা তারকের মতো ফর্সা নয়, তবে কালোও নয়। চোখ দুটি বড় আছে, চুলগুলো কোঁকড়ানো। এই বয়সে তারকের শরীরও পেশল শক্ত ছিল। কিন্তু যেন ঠিক পিনাকীর মতো এতটা শক্ত, এতটা ভাল বাঁধুনি ছিল না।

যতবার চোখাচোখি হল, ততবারই মিনতি লক্ষ্য করল, পিনাকীর দৃষ্টি চকিত, নিবিড় কৌতুকে ঝলকাচ্ছে। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি চিনতে ভুল হয় না, দৃষ্টির ঠিকানাটাও অচেনা নয়। সব ডাকঘরের হদিস তো এই শরীরেই। কিন্তু কেন, মিনতি তো এখন আর সেই আঠারো বছরের মেয়ে নয়। পিনাকী সেই নররাক্ষসও না। তবে—তবু—তবে, বুকের মধ্যে একটা পুরনো তাল কেন বেজে উঠছে। এখানকার এই জীবনের তালের সঙ্গে যে এ বড় বেতালের মতো বাজছে। কেন বাজে? কোন তালটাই যে ঠিক ভাতে শোনা যাচ্ছে না। বরং অস্বস্তি।

বিদায় নেবার আগে আর একবার, মুখ ফিরিয়ে মিনতি বলল, 'আসবেন কিন্তু।'

পিনাকী হেসে বলল, 'তখন তাড়াবেন না যেন।'

মিনতি আর একবার তাকিয়ে ভ্রূকুটি হেনে হাসল।

নররাক্ষস এল। পরদিন বেলা দশটাতেই এল। উঠোনে হাঁক শোনা গেল 'বউদি, নররাক্ষস এসেছে, চা দিন।'

মিনতির তখন উথলানো ভাতের হাঁড়িতে হাতা ঢুকেছে। গলা শুনেই চমকে

উঠে, আর একটু হলে হাঁড়ি উল্টে পড়ে মরার অবস্থা হয়েছিল আর কী। আর দেখবার দরকার হল না। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, উপুড় করে দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল সে। দু-চোখে লজ্জিত কৌতুকাবেশ। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আসুন।'

এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসন পেতে দিল। একটু যেন বেসামালই হয়ে উঠল মিনতি। পিনাকীর দিকে তাকাতে গিয়ে, ব্রীড়াভার একটু বেশীই হল। মুখে আগুনের আঁচের ছোঁয়া ছিল, তার ওপরেও ঈষৎ রক্তাভা লেগে গেল। রোদ চলকানো জলের মতো, চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

নররাক্ষসের চোখের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। বউদির দিকে তাকিয়ে, গতকালের মোহটাই আর একটু রং চড়িয়েছে যেন। অর্ধেক আসনে, অর্ধেক মাটিতে বসে বলল, 'দেখুন, ঠিক এসে পড়েছি। ভয় পাবেন না যেন।'

অমনি তারকের পুরনো কথা মনে পড়ে গেল, 'নররাক্ষস দেখতে এসেছ? ভয় করে না?'

মিনতি বলেছিল, 'নররাক্ষস না ছাই! দিব্যি তো চা খাচ্ছেন!'

মিনতি বলল, 'নররাক্ষস নিয়ে ঘর করি, আমার কি ভয় আছে? বসুন, চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।'

মিনতি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। চলতে গিয়ে শরীর যেন একটু বেশী হিল্লোলিত হয়ে উঠল। ঘোমটা তো কখনই খসেছে। স্নানের পর চুল এখন খোলা, তৈলবর্জিত। দেহ হিল্লোলে কোমরের কাছে খোলা চুল ছপছপিয়ে উঠল।

পিনাকী বলল, 'কিন্তু বউদি, আপনার নররাক্ষস এখন শুধু নর হয়ে গেছে, রাক্ষস আর নেই। আমি কিন্তু এখনো পুরোপুরি রাক্ষস।'

কেটলিতে কাপ মেপে জল ঢালতে গিয়ে, মিনতির হাতটা যেন কেঁপে গেল। বুকের মধ্যে দুবার ধক্‌ধক্ করে উঠল। তবু জবাব দিল, 'তা হতে পারে। তবু এক সময় তো পুরোপুরি রাক্ষস ছিল।'

পিনাকী হেসে বলল, 'তা বটে। তারকদা কি এখন ডিউটিতে?'

উনুনে কেটলি বসিয়ে জবাব দিল মিনতি, 'হ্যাঁ, নরের কাজে।'

'আর বাচ্চারা কোথায়?'

'ঝিয়ের সঙ্গে বাইরে কোথাও বসে খেলা করছে হয়তো।'

মিনতি রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। পিনাকী রান্নাঘরের দিকেই তাকিয়েছিল। মিনতির দেখা পেয়ে, মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন দেখলেন কাল বলুন।'

মিনতি ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর। আপনার দাদা আপনার মতো কলাকৌশল করতেন না।'

পিনাকী বলল, 'কী করব বলুন, এখন কলাকৌশল না করলে কেউ ভোলে না। সোজা জিনিস কেউ চায় না।'

মিনতি বলে উঠল, 'তাতে জমে ভাল।'

কথাটা বলে ফেলেই, আরক্ত হয়ে উঠল মিনতি। পিনাকীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, লজ্জাবেশে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল সে। আড়ষ্ট হয়ে, দু-হাত কোলের কাছে জড়ো করে দাঁড়িয়ে রইল। পিনাকীরও কয়েক মুহূর্ত কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। একটু পরে তার নিচু উচ্ছ্বসিত গলা শোনা গেল, 'কথাটা খুব মোক্ষম বলেছেন বউদি।'

একলা ঘরে মিনতির লজ্জাটা আরও বেড়ে গেল। সে হঠাৎ জিভ কেটে, অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'ছিঃ!' ইতিমধ্যে কেটলির জলে আওয়াজ দিয়েছে। দেখতে দেখতে, নলের মুখে ধোঁয়া বেরিয়ে এল। আঁচল দিয়ে কেটলি নামিয়ে চায়ের পাতা ছেড়ে দিল। পিনাকীর সামনে দিয়েই অন্য ঘরে গেল, কিন্তু তাকাল না। সন্দেশ ছিল ঘরে। তাই দুটি নিয়ে আবার ফিরে গেল। আর মিনতি অনুভব করল, নয়া নররাক্ষসটা বউদির দিক থেকে একবারও চোখ ফেরাতে পারছে না। দৃষ্টির বেড়িতে যেন বাঁধতে চাইছে। ন বছর আগে একজন এমনি করেই বেঁধেছিল। দৃষ্টি দিয়ে বেঁধে বেঁধে, এক সাঁঝ আঁধারে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল।

ভাবতেই, শরীরটা যেন কেঁপে গেল একবার। চায়ের জল ছাঁকতে গিয়ে হাত নড়ে লিকার চল্‌কে গেল। নিজেকে আর একবার বলল, 'ছিঃ! আমি কি আর সেই আঠারো বছরের মেয়েটি আছি নাকি? মনটা যেন কি ছাই!'

চা আর সন্দেশ পরিবেশন করল সে পিনাকীকে। পিনাকী বলল, 'আঃ, তবু একটু ঘরের খাবার খেয়ে বাঁচব। আর বউদির হাতের চা।'

মিনতি তখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বলল, 'কেন নিজের নররাক্ষসীটিকে কোথায় রেখে এসেছেন?'

পিনাকী সন্দেশে কামড় দিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'নররাক্ষসী? সে আবার কে?'

'কেন, বউ?'

পিনাকী হোহো করে হেসে উঠে বলল, 'মেলায় মেলায় ঘুরে বউ জোটাবার আর সময় পেলাম কোথায়?'

কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল পিনাকীর। মিনতি বলল, 'কেন, আপনার দাদা তো খেলা দেখাতে দেখাতেই বউ জুটিয়েছিলেন।'

পিনাকী বলল, 'আমার কপাল মন্দ বউদি। এতদিন বাদে এই দূর দেশের মেলায় এসে একটি বৌদি ছাড়া আর তো কিছু জুটল না।'

মিনতি মনে মনে বলল, 'ফাজিল!' কিন্তু চোখের কালো তারায় ঝিলিক হেনে গেল। মুখের রক্তাভা গাঢ় হল। যেন মুখ ফিরিয়ে সরে যেতে উদ্যত হয়ে বলল, 'বউদি দিয়ে তো আর বউয়ের সাধ মিটবে না।'

বলেই বুকের মধ্যে অসম্ভব ধক্‌ধক্‌ করতে লাগল মিনতির। কিন্তু পিনাকীর কোন জবাব পাওয়া গেল না। মিনতি ফিরে তাকাল। তাকিয়ে আরক্ত লজ্জায়

ও দুর্বোধ্য ভয়ে যেন চমকে উঠল। দেখল, পিনাকীর চোখে নিবিড় আবেশ। দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ।

হাসতে হাসতেই যদিও মিনতি মুখ ফিরিয়ে নিল, তবু একদা, ছিনিয়ে নেবার প্রতীক্ষায় থরথরানি যেন তাকে আজ বিহ্বল করে তুলল। অথচ একটা ভয় তাকে রান্নাঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

পিনাকী বলল, 'বউদি দিয়ে বউয়ের সাধ মেটে না জানি—।'

কথাটা সে শেষ করল না। মিনতি আবার ফিরে তাকাল। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ?'

পিনাকী মিনতির চোখের দিকে তাকিয়ে, চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিল। তারপরে বলল, 'স্বাদ জানতে তো ইচ্ছে করে।'

মিনতির গায়ের মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। মুখের হাসিটা বজায় রেখেই সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ঢুকে দু হাত দিয়ে নিজের রক্তাভ মুখটি চেপে ধরল। মনে মনে প্রায় ঠোঁট ফুলিয়েই বলল, 'অসভ্য !' কিন্তু সাতাশের দেহে একি আঠারোর ঘূর্ণি ! মিনতির মৃত্তিকা যে কাঁপে। দেহে যে প্লাবনের উচ্ছ্বাস উপচে পড়তে চায়।

কিছুক্ষণ পরে পিনাকীর গলা আবার শোনা গেল, 'কই বউদি, রাগ-টাগ করলেন নাকি ?'

রাগ করার সাধ্য কোথায় মিনতির। সে যে নিজেকে নিয়েই বিড়ম্বিত। নিজের তালবেতালেই সে যে আলুথালু। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে, সামনে এসে অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'রাগ করব কেন ?'

পিনাকী যেন স্বস্তি পেয়ে বলল, 'না করলেই বাঁচি।' ঘর ভুলে গেছি - অনেকদিন—।' কথা শেষ না করে সে উঠল। এবার মিনতির বিস্মিত ব্যাকুল হবার পালা। বলল, 'কোথায় চললেন ?'

পিনাকী বলল, 'যাই, আবার কাল আসব। নররাক্ষসের খাবার যোগাড় করতে হবে তো।'

মিনতি বলল, 'এখানে খেয়ে গেলেই তো হত।'

'কাঙালকে কেন আর শাকের ক্ষেত দেখাচ্ছেন।'

'শাকের অভাব নেই বলেই।'

যা বলতে চায় না, তাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে বেরিয়ে আসে মিনতির মুখ দিয়ে। চোখাচোখি করে হেসে উঠল দুজনেই।

পিনাকী বলল, 'জানা রইল, আসব।'

'নইলে রাগ করব।'

ঠোঁট টিপে হাসল মিনতি।

পিনাকী বলল, 'আর যদি মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসি তখন যেন রাগ করবেন না।'

পিনাকী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিনতিও উঠোনে নেমে এল। পিনাকী আবার বলল, 'আপনার যখন ভাল লেগেছে, তখন খেলা দেখার নেমন্তন্ন আপনার রোজ রইল।'

মিনতি বলল, 'সেই তো এক খেলা।'

পিনাকী বলে উঠল, 'মানুষ খাওয়াব খেলাটা আর কেমন করে দেখাব বলুন। সেটা বেআইনি!'

বলে মিনতির প্রতি কটাক্ষ হেনে, পিনাকী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। মিনতি খোলা দরজার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দু-চোখে আবেশের স্থিরতা। বুকে যেন প্লাবনের ছলাৎ ছলাৎ।

দূরের উঁচু নিচুতে যখন পিনাকীর মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন সহসা বুকের ওপর হাত রেখে মিনতি চুপিচুপি স্বরে বলে উঠল, 'কোথায় চলে যাচ্ছি আমি, কোথায় চলে যাচ্ছি।'...

দুপুরে তারক এল বকবক করতে করতে, 'কুগ্রহ লেগেছে পেছনে, বুঝলে মিনু?'

মিনতি আজ এখনো রান্নাঘরে। সময় তার কোন্‌খান দিয়ে কখন চলে গিয়েছে টের পায়নি। রান্না নামেনি এখনো। কিন্তু তারকের কথা শুনে, বুকের ভিতরটা তার চমকে উঠল। বলল, 'কী হয়েছে?'

তারক রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হল। হাতে একটি কাগজ। বলল, 'আর বল কেন ঝকমারির কথা। কলকাতায় হেড অফিসের ডাক, কালকেই পৌঁছুতে হবে রাত্রে, পরশু হাজিরা।

সংবাদটা শুনে, মিনতি সহসা কোন কথা বলতে পারল না। ওর প্রাণের ভিতরটা যেন, আবর্তিত হয়ে, একটা বাধাবন্ধহীন মুক্তির বেগে ছুট দিতে চাইল। আর একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ঘোর ওর ভিতরে চুপি চুপি বলে উঠল এ কিসের ইঙ্গিত! কিসের! · চোখের সামনে পিনাকীর ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি মুখটি ভেসে উঠল।

তারক তখনো বলে চলেছে, 'তার মানে বুঝলে তো, আবার কুগ্রহ। আবার অন্য কোন ঘাটের জল খাওয়াবে বাপু, একেবারে অর্ডার দিয়ে দিলেই তো হয়।'

বলতে বলতে সে হঠাৎ থামল। মিনতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হল তোমার? কি ভাবছ?'

মিনতি চমকে উঠল একটু। মুখখানি চকিত গম্ভীর করে বলল, 'কী আবার হবে। তোমার চাকরির ঝকমারিটা দেখছি।'

তারক অসহায় হয়ে বলল, 'কী করব বল, কাল যেতেই হবে সন্ধের গাড়িতে। পরশু রাত্রের গাড়িতেই আবার ফিরে আসব আমি। বাউরি বউটা বাড়িতে থাকবে, খালাসীটা বারান্দায় শোবে এসে রাত্রে। দুটো রাত কাটিয়ে দিতে পারবে না?'

মিনতির বুকের মধ্যে যেন একটা দুঃসহ ধকধকানি। কিন্তু প্রায় অভিমানের সুরে বলল, 'জানিনে যাও। কাজ ছাড়া আর কীই বা করছ? ভাল লাগে না।'

মিনতি বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে। তারক আবার অসহায়ভাবে বলল, 'কী করি বল, কিন্তু তোমার রান্না এখনো নামেনি?'

মিনতি অন্য ঘর থেকে বলল, 'কী করে নামবে? তোমার নররাক্ষস ভাইটি এসে এতক্ষণ বকবক করে গেলেন।'

তারক বলে উঠল, 'পিনাকী তো? ও তো এখন স্টেশনেও গেছল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মিনতি শোবার ঘরের জানলার গরাদে বুক চেপে, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। মেলাতলা থেকে মাইক তখন ঘোষণা করছে, 'নররাক্ষস এসেছে, নররাক্ষস। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!'...

পরদিন বেলা দশটায় আবার এল নররাক্ষস। তারকের কলকাতা যাওয়ার বিষয় বলাবলি করতে করতে, পিনাকী এক সময় বলে উঠল, 'বলেন তো রাতে এসে পাহারা দিতে পারি।'

মিনতি আরক্ত মুখে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'নররাক্ষসের পাহারা? ভরসা আছে কিছু?'

'কিসের ভরসা চান?'

মিনতি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'বুঝে নিন।'

পিনাকী এক মুহূর্ত মিনতির চোখের দিকে তাকিয়ে, বলে উঠল, 'বুঝেই নিলাম।'

মিনতি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে, চকিতে একবার পিনাকীকে দেখে নিল। বলল, 'তা হলে আসবেন।'

বলতে বলতে মিনতি রান্নাঘরে গেল। তার যেন নিঃশ্বাস আটকে এসেছিল। যেমন ন' বছর আগে তারকের এক একটা কথায় আসত।

কিছুক্ষণ পর পিনাকীর গলা আবার শোনা গেল, 'একটা সত্যি কথা বলব বউদি?'

'বলুন।'

'আপনার বউভাতের সময় যে-রকম চেহারা দেখেছিলাম, এখনো সে-রকমটিই আছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

মিনতির যেন নেশা লাগল, একটা মাতালের আবেশ তার সর্বাঙ্গে। সে যে সেই মিনতিই আছে, সেই পূর্ণ আঠারো বছরের মিনতি। নইলে আজ সকল দিক থেকে মনে প্রাণে ভাষায় ভঙ্গিতে সেই মেয়েটি তার মধ্যে উদয়

হচ্ছে কেন।

হঠাৎ দরজায় ছায়া দেখে সে চমকে উঠল। দেখল, রান্নাঘরের দরজায় পিনাকী। মিনতির মনে হল, সেই ছিনিয়ে নেবার প্রতীক্ষা থরথর করছে তার বুকে। পিনাকীর দিকে তাকিয়ে তার মাতাল চোখ যেন ভীরু হয়ে উঠল সহসা।

কিন্তু পিনাকী গাঢ় নিচু স্বরে বলল, 'যাচ্ছি।'

পিনাকী ফিরে যায় দেখে মিনতি যেন এক অপ্রতিরোধ্য বেগে এগিয়ে এল। নিজের থেকেই বলে উঠল, 'পাহারার কথা মনে আছে তো?'

পিনাকী বলল, 'সেই কথা মনে রেখেই তো এখন তাড়াতাড়ি যাচ্ছি।'

'তা হলে রাত্রের খাওয়াটাও যেন এখানেই হয়।'

পিনাকী বলল, 'তা হলে অনেক ভাগ্য, বহুদিন বাদে কাঁচা মাংসের বদলে নররাক্ষসের দুটি ঘরের অন্ন জুটবে।'

পিনাকী চলে যেতেই মিনতি শোবার ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। তার রক্তধারায় একটা উন্মত্ত কলরোল বাজছে। বুক চেপেও সে শান্ত করতে পারছে না।

রাত্রি প্রায় বারোটা। ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলেছে প্রায় ছ্যাকরা গাড়ির মতো। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তারক জড়োসড়ো হয়ে, গুটিয়ে শুয়ে রয়েছে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। মাথাটা তার মিনতির বিছিয়ে রাখা কোলের ওপর। উল্টো দিকের গদিতে খুকু আর রুণু ঘুমোচ্ছে।

কামরায় আর কেউ নেই। গাড়িটা এমনিতেই প্রায় ফাঁকা যায়। সেকেণ্ড ক্লাস একেবারেই ফাঁকা থাকে। তারক কাত হয়ে শুয়ে আছে। ক্লান্ত, কপালের রেখাগুলো গাঢ় হয়ে উঠেছে। মিনতি দেখছে। তার একটি হাত তারকের কাঁধের ওপর। আর একটি হাত গাড়ির জানলায়। মিনতি তারকের ঘুমন্ত মুখের দিকে দেখছে, কিন্তু চোখে যেন ঘুম ঘুম ভাব। সেও বড় ক্লান্ত, যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। দুঃসহ যুদ্ধ, আঠারো বছরে ফিরে গিয়ে, আবার সাতাশে প্রত্যাবর্তন। প্রাণান্তকর যুদ্ধ। বিকেলের শেষ মুহূর্তে, তারকের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে গিয়ে দুর্জয় হয়ে উঠেছিল সে। থাকতে পারবে না, তারককে ছেড়ে এ রাত সে কিছুতেই কোথাও থাকতে পারবে না।...সব নররাক্ষসই যে আসলে নর হয়ে ঘর বাঁধতে চায়! একটি ঘর, একটু নিবিড় করে, ঠিক এই মানুষটার মতোই! পিনাকীর স্বপ্নও যে, একদা তারক হব। সব, সব পিনাকীরই সেই স্বপ্ন। তবে—ন' বছর ধরে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, সুখে দুঃখে যে মানুষটি মিনতিতে একান্ত হয়ে আছে, তাকে কেন ফাঁকি দেবে সে।

সে যেন দেখতে পেল, নররাক্ষসটা রেল কোয়ার্টারের অন্ধকার বন্ধ দরজার কাছে এসে ফুঁসছে। দুঃখ, ঘরের অন্ন তাকে দিতে পারল না মিনতি। দিতে

গেলে, জীবনের একটা পুনরাবৃত্তির পাপ তাকে করতে হত। পুনরাবৃত্তিতে কী লাভ। পিনাকী যেন তারকের মতোই নিজের মিনতিকে সংগ্রহ করে নেয়।

তারকের দিকে তাকিয়ে, সহসা মিনতির বুকটা টনটন করে উঠল। জানালা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এসে তারকের গালের ওপর রাখল সে।

তারক বোধহয় ঘুমোয়নি। সে তার গালের ওপর রাখা মিনতির হাতের ওপর নিজের একটি হাত রাখল। একটু চাপ দিল, গভীর নিঃশ্বাস ফেলল।

দুলে বাড়ির ভাত

সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা থমথমে ভাব।

বাড়ির কর্তা এবং গিন্নি, পরস্পর প্রায় মুখোমুখি হয়ে বসে আছেন। বড় মেয়ে, প্রায় বছর ত্রিশ বয়স হবে, বাপের বাড়িতেই বারো মাস থাকে। বিধবা নয়, বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ পনর বয়সে, স্বামী তাকে নিয়ে ঘর করেনি। তার নাম নির্মলা, সবাই নিমি বলে ডাকে।

নিমি, সেই ঘরেই, দরজার কাছে বসে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে এমনভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন এইমাত্র কোন ভয়ংকর দুর্ঘটনার খবর শুনে, ভয়ে বিস্ময়ে ব্যথায় একেবারে পাথরের মত হয়ে গিয়েছে।

সেই ঘরেরই দরজার কাছ থেকে দেখা যায়, খোলা উঠোনের ওপারে, ঘরের সামনে যে খড়ের চালে ঢাকা জায়গা রয়েছে, সেটাই রান্নাঘর। সেখানে কাঠের উনুনে, আগুন জলছে। আগুনের থেকেও ধোঁয়াই বেশী। এ সময়ে শুকনো কাঠ-কুটোর বড় অভাব। ভাদ্র মাস, সবই ভেজা ভেজা, স্যাতা স্যাতা। তা-ই, কাঠের জালে ধোঁয়া বেশী।

সেখানে উনুনের ওপরে একটা বড় হাঁড়ি। হাঁড়ির মুখ খোলা, তা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে না। কারণ, অমি, যার পুরো নাম অমলা, যার বয়স বছর আঠারোর বেশী না এখনো আইবুড়ো, ও এইমাত্র একটা আড়াই কে. জি ওজনের ডিঙলে টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে দিয়েছে। হাঁড়িতে জল আছে, ডিঙলে সেদ্ধ হবে। কুমড়োকেই বর্ধমানের লোকেরা ডিঙলে বলে।

অমি বসে আছে, হাঁটুর ওপরে হাত রেখে, হাতের ওপরে গাল চেপে, উঠোনের মাঝখানে তাকিয়ে আছে। ওর বড় বড় কালো চোখ দুটির চাহনিও প্রায় সেইরকম। যেন দুঃখে ব্যথায় হতাশায় কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন খুব শোক পেয়েছে। ওর খোলা চুলগুলো কাঁধের এক পাশ দিয়ে, পিঠে ছড়ানো। উঠোনের মাঝখান থেকে দৃষ্টি তুলতে গেলে, পাছে কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, এটাও যেন ওর একটা ভয়।

নিমি অমি, দুই বোন। দু'জনে দেখতে প্রায় একরকমই। তবে অমির এখনো বয়স কম, রঙটাও একটু বেশী ফরসা। তা-ই ওকে দেখলে, প্রায় সুন্দরী বলতে ইচ্ছা করে। ওর বয়সে হয়তো নিমিও এরকমই ছিল। নিমির চোখ দুটি, এমনিতে দেখে মনে হয়, ওর চাহনি বোধহয় ছোট বোনের থেকেও সুন্দর ছিল। কেন না, নিমির চোখ কেবল বড় আর কালো না, টানা টানা।

কর্তার বিড়িটা অনেকক্ষণ নিভে গিয়েছে! সেটা উনি দুআঙুলের ফাঁকে ধরে আছেন। পরনে একখানি খেটে ময়লা ধুতি, আদুড় গায়ে পৈতাটি এলিয়ে রয়েছে। আর চক্রবর্তী গৃহিণী লাল পাড় খাটো শাড়ি জড়িয়ে আছেন। চোখে মোটা

কাচের চশমা। তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নেই, মাটির দেওয়ালের দিকে যেন দিশেহারা হয়ে চেয়ে আছেন। চক্রবর্তী মশায়ের চোখের ভাব অনেকটা ভাবলেশহীন।

কদিন ধরে অনবরতই প্রায় বৃষ্টি হয়েছে। আজ রোদটা খুবই চড়া। কথায় বলে ভাদ্রের রোদ আর আশ্বিনের ওষ, বড় খারাপ। উঠোনের ওপর, পিছনের বাঁশঝাড়ের খানিকটা ছায়া পড়েছে খিড়কির কাছ ঘেঁষে। রান্নাঘরের চালের-ওপর দিয়ে, উঠোনের প্রায় মাঝখানে একটা তাল গাছের ছায়া এসে পড়েছে।

পিছনে, বাঁশঝাড়ের পাশেই পুকুর। দেখা যায় না, কিন্তু খুব কাছে বলে, জলে কাপড় কাচার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ে কিংবা, কাছাকাছি কোথাও একটা ঘুঘু, টানা সুরে ডেকেই চলেছে। ডাকটা এমনিই, শুনলেই মনে হয়, কেউ যেন ডেকে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। আবার এর মধ্যেই, চালের উপর, কাক খড় নিয়ে টানাটানি করছে, তাও শোনা যায়

এ সময়েই, যে-ঘরে কর্তা গিন্নি ও মেয়ে বসে আছে, তার পাশের ঘর থেকে একটি শিশুর অর্ধস্ফুট কান্না একবার শোনা যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়।

সেই শব্দেই যেন কর্তার চোখের পলক পড়ে। নিভে যাওয়া বিড়িটাকে আঙুলের টোকা দিলেন ছাই ঝাড়াবার জন্যে। এর আগেও অনেকবারই দিয়েছেন, ওতে আর ছাই নেই। তিনি নিমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথাটা সব্বাইয়ের আগে কে বললে?'

নিমি মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, 'মিশ্রগিন্নি।'

'সে বুড়িকে কে বললে?'

'তা কিছু বলেনি।'

কর্তা এবার গিন্নির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?'

গিন্নিও মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'মুখুজ্জে মাস্টারের বউয়ের কাছ থেকে।'

চক্রবর্তী তাঁর দাঁতহীন মাড়ি চাপলেন। আরো গভীর দুশ্চিন্তায় চোখ দুটো একবার বড় করলেন, আর একবার ছোট করলেন। কপালে রেখাগুলো, এঁকেবেঁকে স্থির হয়ে রইল। যেন অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলেন, তারপরে হঠাৎ নিঃশ্বাস ঝেড়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে গোটা গাঁয়েই জানাজানি হয়ে গেছে?'

সেকথার জবাব কেউ দিল না। চক্রবর্তী উঠে, রান্নাঘরের উনোনের কাছে গেলেন। জ্বলন্ত কাঠ তুলে কোনরকমে পোড়া বিড়িটা ধরিয়ে, ফিরে এলেন আবার। আসতে গিয়ে, পাশের ঘরের দিকে তাকালেন একবার। সেখান থেকেই শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। ঘরটার দরজা খোলা। বিছানা তক্তপোশ দেখা যায়। আর-কিছু না। তিনি আবার ঘরে এসে ঢুকলেন, বিড়ি টানলেন কয়েকবার তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমি শুনেছে কার কাছ থেকে?'

নিমি জবাব দিল, 'ও বাড়ির রেণুর কাছ থেকে।'

রেণু, চক্রবর্তীমশায়ের ছোট ভাইয়ের মেয়ে। পাশাপাশি বাড়ি। চক্রবর্তী বললেন, 'হুম্‌ ঘরের শত্তুর বিভীষণ, ওরা তো আরো বেশী করে বলবে, গোটা গাঁয়ে রটাবে।'

গিন্নি বললেন, 'বাকী রেখেছে নাকি।'

চক্রবর্তী দেখলেন, বিড়ির ঘুনসিসুদ্ধ পুড়ে গিয়েছে, নিভেও গিয়েছে। সেটাকে দুই আঙুলে টিপতে টিপতে, তিনি আবার বললেন, 'না—মানে, আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, কথা দশ কান হল কী করে। ঘটনা যখন চুপি-সাড়েই ঘটেছে, তখন জানাজানিটা হল কেমন করে।'

নিমি বলল, 'তুমি যেন একতরো এমন কথা বল। কথাটা কে ফাঁস করেছে, তা আবার কেউ বলে নাকি।'

কর্তা বললেন, 'তা'লে গোবরা হারামজাদা, নয় তো ওর মাগীটাই ফাঁস করেছে।'

গিন্নি মোটা কাচের ভিতর থেকে চোখ পাকিয়ে, প্রায় ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে কথা কয়ো না। মিছিমিছি ওদের গালিগালাজ করা কেন। ওদের কি দায় কেঁদে গেছে, পাড়ার লোককে ডেকে বলবার।'

'কিন্তু ঘটনাটা তো ওদের বাড়িতেই ঘটেছে, না কী?'

'ঘটলেই বা। ওরা নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করবে, আবার নিজেরাই কখনো ফাঁস করে?'

'তা করতে পারে। ভাবলে হয়তো, একবার কালী চক্কোত্তির পেছনে কাটি দেওয়া যাক।'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু।'

গিন্নি আবার ফুঁসে উঠলেন। বললেন, 'গোবরার বউ মন্দোদরিকে আমার ভালই জানা আছে। ও কখনো অমন কাজ করবে না।'

নিমি সায় দিয়ে বলল, 'আমারও তাই বিশ্বাস। ও যা মেয়ে, তাতে ওর মুখ থেকে কেউ কথা বের করতে পারবে না।'

চক্রবর্তী মুখখানি বিকৃত করে বললেন, 'হ্যাঁ, সে সব আমার জানা আছে। মাগী মদ গিলে যে কাণ্ড করে—।'

গিন্নি আবার মুখ ঝাবাড়ি দিলেন। বললেন, 'তা সে তার নিজের ঘরে। ভাতারের সঙ্গে বসে যা খুশি তাই করুক, কারুর ভিটের পাড়ায় গিয়ে, অন্যের সঙ্গে ঝ্যালা করেনি তো।'

'হয়তো, সেই মুখেই কথা বেরিয়ে গেছে, কেউ শুনতে পেয়েছে।'

এবার গিন্নি নিমিকে সাক্ষী মানেন। বললেন, 'শুনছিস তো, তোর বাপের হাড় জ্বালানে কথা শুনেছিস? এখন ওই ছুঁড়িটার সব দোষ হল। তবু একবার বলবে না, এমন কেলেঙ্কারি হল কেন। কেন, এখন গিয়ে সেই পটেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করতে পার না, সে অমন কাজ করলে কী করে?'

কর্তা বললেন, 'পটেশ্বরী না রাক্কুসি। অত বড় মন্বন্তর গেল যুদ্ধের সময়, তখনো তো এ বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটেনি।'

নিমি বলল, 'আহা, তখন কি তোমার এমন চার টাকা সের চাল হয়েছিল?

'তা না হোক, তবু সেবারে কলকাতায় হাজার হাজার লোক মরেছিল। আমাদের বর্ধমান জেলায় কিছু হয়নি বটে, কিন্তু এবার আর কটা লোকের মরার খবর শোনা যাচ্ছে। সেবারের মতন কিছুই না, তবু আমার বাড়িতে, কালী চক্কোত্তির বাড়িতে, এমন কেলেঙ্কারি! বংশে এত বড় কলঙ্ক?'

বলতে বলতেই কর্তা হঠাৎ রুদ্র হয়ে উঠলেন। দু পাক ঘুরে, প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'রাক্কুসিকে আজ কেটে দুখান করব আমি।'

বলে, দরজার দিকে এগোতেই, নিমি বাবার হাত চেপে ধরল। বলল, এখন কিছু করতে যেও না।'

'না, আমাকে ছেড়ে দে, একবার হা মুখ আমি চিরে দেখি, কত বড় সেটা।'

নিমি আরো জোরে চেপে ধরে বলল, 'না, এখন তুমি কিছুই বলবে না বেন্দা আসুক, তারপরে যা বলার বলো। যার জিনিস সে-ই তার ব্যবস্থা করবে।'

চক্রবর্তী থেমে যান। কথাটা ভাববার মত মনে হল তাঁর। হ্যাঁ, বৃন্দাবন আসুক, তারপরেই কথাটা তোলা যাবে। ইতিমধ্যে বাড়ির পিছন থেকে, ছাগলের ডাক শুনে, নিমি চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'যাই সোনা, যাচ্ছি।'

নিমি উঠতে উঠতে আবার বাবাকে বলে, 'মাথা গরম করো না। সত্যি মিথ্যে বলেও একটা কথা আছে তো। আগে আসল লোকের কাছ থেকে সব শোনা যাক, তারপরে যা করবার করা যাবে। মা কী বল?'

গিন্নি বলে, 'তা অবিশ্যি ঠিক। তবে, যা রটে, তা বটে। একটা কিছু কেলেঙ্কারি নিশ্চয়ই কারুর চোখে পড়েছে বা প্রমাণ পেয়েছে।' তা না হলে কি আর সাহস করে বলতে পারে।'

গিন্নি নিমির দিকে তাকালেন। নিমিও মায়ের দিকে তাকাল। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখে চেয়ে রইল। তারপরে নিমি ভুরু কুঁচকে, অনেকটা যেন আপন মনেই বলল, 'কিন্তু, আমি বলি, যদি ঘটেই থাকে কিছু, জানাজানি হল কেমন করে?'

বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। বাপের সংসারে তার নিজের আয় বলতে ছাগল। গোটাকয়েক ছাগল আছে, বাচ্চা বিক্রি করে কিছু হয়। শহরের মাংস-ওয়ালাদের লোকেরা এসে চড়া দামেই কিনে নিয়ে যায়। গোবরা দুলে পাঁঠাকে খাসী করতে জানে, করেও দেয়। খাসীর দামই বেশী।

তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেখে, অমিও পিছু পিছু যায়। খিড়কি দিয়ে, দুজনেই বাড়ির বাইরে যায়। পুকুরঘাটে তখন আর কেউ নেই। ঘাটে এক ফোঁটা ছায়া নেই, ভাদ্রের মাংস গলানো রোদ সেখানে। পুকুরের ওপারে বাঁশঝাড়ে ঘুঘুটা তেমনি ডেকেই চলেছে। বাঁশঝাড়ের ওপারে দুটো পুরনো ভাঙা

মন্দির। তার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের বাইরে। চারদিকে ভাদ্রের রোদ ঠা-ঠা করছে।

পুকুরের এক পাশে, গ্রামের অন্য দিকে যাবার রাস্তা। দুটো অশ্বত্থ গাছ রাস্তার ধারে। সেই ছায়াতেই নিমির ছাগল বাঁধা রয়েছে। কিন্তু একটি ছাগলের গায়ে এখন আর ছায়া নেই। সে একেবারে রোদে। তাই ডাকাডাকি করছিল।

ঘোর দুপুরে রাস্তাটাও ফাঁকা। নিমি গাছতলায় গিয়ে ছাগলটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাঁধে। কাছে পিঠে যেখানে ঘাস আছে, সেরকম জায়গাতেই বাঁধে। তারপরে অমি এসে—ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কী বলছিল দিদি, মারবে?'

নিমি বলল, 'তা ওরকম ক্ষেপে গেলে, গায়ে হাত তোলা আর আশ্চর্যের কী?'

'কিন্তু ছাখ্ দিদি, আমি বুঝতে পারি না, সত্যি বলছি বৌদির খুব খারাপ কাজ হয়েছে কি এটা?'

নিমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'বলিস কি অমি, ছি ছি ছি! ওই জন্যে তোকে আমি বেরুতে বারণ করি। তুই কোন্ দিন কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকবি।'

'কেন, আমি আবার কী কাণ্ড করব?'

'করবি একটা কেলেঙ্কারি কিছু! তোর যখন এটা খারাপ মনে হচ্ছে না, তুই কোন্ দিন হয়তো মুসলমান বিয়ে করে বসবি।'

'তোর মুখে আগুন। তুই একটা মুখপোড়া দিদি।'

নিমি হেসে ফেলে। বলে, 'অমি শোন্। হ্যাঁরে, ডিঙ্লে সেদ্ধ যে চাপালি, মাখবি কী দিয়ে? তেল আছে একটুও?'

'দু পলা মতন আছে।'

'আর চাল?'

'দেড় কৌটো।'

'ছ'জনের জন্যে?'

'তাইতো কথা হল, ডিঙ্লে খাওয়া হবে ভাতের টাকনা দিয়ে।' বলতে বলতে অমির শুকনো ঠোঁট দুটো কী রকম কেঁপে যায়। ডাগর চোখ দুটো টলটলিয়ে ওঠে।

নিমির মুখখানিও অন্ধকার হয়ে ওঠে, চোখ ছলছলিয়ে যায়। বোনের পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'কাঁদিস না। এ বছরটাই এত বেশী কষ্ট।'

অমি বলল, 'বাবা তো এক বিঘে জমি এ সময় বিক্রী করে দিতে পারে। দেড় দু হাজার টাকা তো পাওয়া যাবে।'

'ওকি বলছিস্ অমি! মাত্তর তো সাত বিঘে জমি আমাদের। তাতেই কয়েক মাসের চালটা হয়। তার ওপরে তোর বিয়ে আছে, তখন কোন্ না বিঘে দুয়েক বিক্রি করতে হবে।'

'ছাই, অমন বিয়ে আমার দরকার নেই।'

বলতে বলতে বাড়ি ফিরে যায়। নিমি সেদিকে চেয়ে মনে মনে বলে, 'ছাই নয়রে অমি। ঘরে দুটো খাবার আছে, এমন লোকের সঙ্গে যদি বিয়েটা হয়, তা হলে সেটা বিয়ের থেকে বড় হবে।'…

একথা নিমি মনে মনে বলে। তবু অশ্বত্থের তলায়, একলা দাঁড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। টলটলানো জলে, ভাদ্রের রোদে-পোড়া চরাচর কাঁপতে থাকে।

কিন্তু এসব কোন ঘটনা নয়। বাড়ির থমথমানি একটুও কাটল না। বাবা মা দু মেয়ে ডিঙুলে সেদ্ধ নিয়ে যখন বসল, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। পাশের ঘরে আরো একজন আছে, যার পাপে বাড়িতে আজ কুগ্রহ লেগেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে অমি একবার ডেকেছিল, 'বউদি, খেতে এস।'

ঘরের ভিতর থেকে জবাব এসেছে, 'তোমরা খেয়ে নাও, আমি খাব না।'

তৎক্ষণাৎ চক্রবর্তী চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করছে না, কালামুখী।'

নিমি তখন আবার বলেছে, 'থাক বাবা, এখন কিছু বলো না, বেন্দা আসুক, তারপরে।'

তখন আর একবার শিশুর কান্না শোনা গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার চুপ হয়ে গিয়েছিল।

সকলেই ডিঙুলে সেদ্ধ খেয়েছিল ভাতের বদলে। তাতে ক্ষুধা হয়তো মিটেছে, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়েছে। একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং দুঃখ, সকলের বুকের মধ্যে রুষে রুষে উঠেছে। সবাই একমুঠো করে ভাত খেয়েছে, ঠিক এক মুঠো বলতে যা বোঝায়। তার পরিণামে, সকলেরই বিতৃষ্ণা ঘৃণা, একজনের ওপরেই গিয়ে পড়েছিল। একমাত্র অমি ছাড়া।

হয়তো, অমির এখনো যৌবন আছে। যে যৌবনকে পবিত্র বলা হয়েছে। বিশ্বসংসারে যৌবনের মত শুদ্ধ কী আছে। যৌবন যেমন ঘৃণার আগুনে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি সর্বংসহা পৃথিবীর মত সবকিছু ক্ষমাও করতে পারে।

যে মানুষটিকে ঘিরে, যে মানুষটির আচরণকে কেন্দ্র করে গোটা বাড়ি থম্‌থম্ করছে, ফুলছে, ফুঁসছে তার ওপরে সে কিছুতেই রাগ করতে পারছে না।

প্রায় বিকাল ঘেঁষে, বৃন্দাবন বাড়ি ফিরল। বলা চলে, একটি কঙ্কাল জামা-কাপড় পরে বাড়ি ফিরল। সে জামাকাপড়ের দশাও সেই রকম। নানা জায়গায় তালি, ময়লা। এসেই ডাক দিল, 'মা!'

কোন সাড়া পেল না সে। অথচ দেখল, প্রত্যেকটি ঘরেরই দরজা খোলা। হাতে তার একটি ছোট ঝোলা। বড় নয়। খুব ছোট একটি ঝোলা, কিন্তু সেটিকে সে বুকে ধরে আছে।

কোন ঘর থেকেই কেউ এল না দেখে, সে আবার ডাকল, ‘দিদি, দিদি কোথায় গেলিবে।’

তখনো কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বৃন্দাবন রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, অমি সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করল, ‘কীরে অমি, কেউ বাড়ি নেই? ছাত্রের বাড়ি থেকে আজ দু'কিলো চাল নিয়ে এলাম মাইরি। আর বাড়িতে কারুর কোন পাত্তা নেই?’

অমি একবার ঝোলাটার দিকে তাকাল। তারপরে বাবার ঘরের দিকে। দেখে, বৃন্দাবনের সন্দেহ হল। কোথায় একটা কী গোলমাল ঘটেছে। সে উঠোনের আর একপাশে গিয়ে, উঁকি মেরে দেখল, বাবার ঘরে কে আছে। দেখল, সেখানে বাবা, মা দিদি, সবাই রয়েছে। সে সেই ঘরের দিকে গেল। দাওয়ার ওপর উঠে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কী গো, তোমরা সব এমনি করে বসে আছ কেন? কোন বিপদ আপদ হয়েছে নাকি?’

কেউ কোন জবাব দিল না। কেবল কালীনাথ চক্রবর্তী বললেন, ‘তুমি গায়ক মানুষ, যাত্রার দলের অ্যাক্টর। তা ছাত্রদের সব শোখানো হল?’

বৃন্দাবনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। বললো, ‘ত্যাখ বাবা, বাজে কথাটি কয়ো না। তোমার তো সে মুরোদও নেই। তোমার বাপ কী রেখে গেছল, তার ওপর আজও চালিয়ে যাচ্ছ। আমাকে তো তবু কিছু ছেলে মানে। পেটে স্লা ইঁদুরে ডন মারছে, তবু যাহোক, তাদের সঙ্গে থেকে, কিছু একটা শিখিয়ে পড়িয়ে কিছু চাল যোগাড় করে এনেছি। এখন মেলা ক্যাঁচ ক্যাঁচ না করে বল দিকিনি কী ঘটেছে?’

তবুও কেউ কিছু বলতে চায় না। মা কাঁদতে লাগলো। নিমিরও প্রায় সেই দশা। বৃন্দাবন তখন একটু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে উঠলো। সে প্রায় ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, ‘বাবা বলছ না কেন, কী ঘটেছে? আর এমন দগ্ধে মেরো না। শিবানী আর ওর ছেলেটা ভালো আছে তো?’

তখন চক্রবর্তী বললেন, ‘তোমার শিবানীকে ডেকেই তা জিজ্ঞেস কর না।’

বৃন্দাবন আরো ভাবিত হয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, ‘কী হয়েছে?’

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, চক্রবর্তীই শেষ পর্যন্ত নিজের মুখে বললেন, সমস্ত কথা। জানালেন, তাঁর পুত্রবধূ বৃন্দাবনের স্ত্রী, গোবরা দুলের বাড়িতে পরশু দিন ভাত খেয়েছে। দুলে বাড়ির ভাত, বামুনের বউয়ের পেটে! ছি ছি ছি, তার আগে, অমন ব্যাটার বউ কেন, শ্বশুর শাশুড়ি ননদ স্বামী পুত্রের মুখে বিষ তুলে দিয়ে যায়নি। গাঁয়ে যে আর টেকা যাবে না।

বৃন্দাবন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ডাক দিল, ‘অমি তোর বউদিকে এ ঘরে ডাক তো একবার।’

নিমি বলে উঠলো, ‘কেন বাপু ঝামেলা বাড়ানো। ঘরে গিয়েই কথা বল না।’

তার আগেই অমি গিয়ে ডাকলো। বৃন্দাবনের স্ত্রী শিবানী এসে

দাঁড়ালো। মাথায় খানিকটা ঘোমটা। তবু মুখখানি পরিষ্কার দেখা যায়। সকালবেলা পুকুরে চান করে, সিঁদুরের টিপ পরেছিল। সেটা এখন অনেকখানি গলে গিয়েছে, তবু টের পাওয়া যায়। একটা ঢলঢলে সেমিজের ওপর জ্যালজেলে একটা লালপাড় শাড়ি। উপবাসে শুকনো মুখ, বড় চোখ দুটি আরো বড় দেখাচ্ছে। শরীর ভাঙনের মুখে, তবু মনে হয়, একটি মিষ্টি মুখ, ডাগর চোখ বউ এসে দাঁড়ালো।

বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে বউ, তুই গোবরা দুলের বাড়ি ভাত খেয়েছিস পরশু?'

বউ একটু চুপ করে থেকে বললো, 'খেয়েছি।'

'কেন?'

'মন্দোদরী খেতে বললো, বড্ড খিদে পেয়েছিল। ছেলেটার গলা শুকনো, বুকে একটু দুধ আসছিল না।'

সরল, সহজ জবাব। তবু বৃন্দাবন বললো, 'তা বলে তুই দুলে বাড়ির ভাত খাবি? গাঁয়ে টিকব কেমন করে।'

শিবানী মাথা নিচু করেছিল। তেমনি ভাবেই বললো, 'মন্দোদরী বললে কি না, 'তোমার লজ্জা কী বউদি, তোমার শাশুড়ী, বড় ননদ সবাই আমার ঘরে লুকিয়ে ভাত খেয়ে যায়। তুমি না হয় ছেলেটার জন্যে দু'টা খাবে। মিনসে যোগাড় করতে পারে, তাই বলছি, নইলে—।'

শিবানী কথা শেষ করতে পারে না, চোখে জল এসে পড়ে, কথা বন্ধ হয়ে যায়।

নিমি একবার চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'মা!'

কিন্তু মায়ের কাছ থেকে কোন জবাব আসে না। তিনি মাটিতেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল, ফুলছিল। নিমিও হঠাৎ সরে গিয়ে, মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে। ওরও শরীরটা ফুলতে থাকে কাঁপতে থাকে।

চক্রবর্তী অবাক চোখে স্ত্রী আর কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় অমি চুপ করে বসে আছে, মাথা নিচু। ওর চোখেও জল।

শিবানী সেই যে মাথা নিচু করেছে, আর তোলেনি।

বৃন্দাবন বউয়ের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'চল্ ঘরে যাই। চাল এনেছি, রান্না কর আজকের রাতটার মত হোক, আবার দেখা যাবে।'

বউ তবু দাঁড়িয়ে থাকে। তখন বউয়ের শরীরটাও ফুলে ফুলে উঠছে।

বৃন্দাবন বললো, 'অমন করিস না মায়ের ভাগী আমার বাবা, তোর ভাগী আমি। দুলেদের আমি চিনি। ওদের ভাত আমাদের থেকে খারাপ না। ওদের একটাই দোষ, ওরা দুলে। চল্।'

বউকে সে হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

'ক'টা লাও আসবে বাবু ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কৈলাস।

'দশটা।' জবাব এল আড়তের চালাঘর থেকে।

সবুজ শাড়ি-পরা কামিনটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কী ?'

আবার জবাব এল বিরক্তিভরে—'বললাম তো, সাত নৌকো বালি আর তিন নৌকো টালি।'

অমনি সবুজ আর লাল শাড়ি-পরা দুটি কামিন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে সরু গলায় গেয়ে উঠল।

ওই আসে গো ওই আসে লা'য়ে ভরা টালি
ঘরে আমার ছা ধুমোয়
মিন্‌সে পড়ে শুঁড়িখানায়
বেলা না যেতে আমি লাও করব খালি ॥

মেয়ে ছিল জনা-পাঁচেক, পুরুষ ছিল পনের জন। পুরুষদের ভেতর থেকে কয়েকজন হাততালি দিয়ে উঠল বাহবা বলে। মেয়েরা হেসে উঠল সব খিল-খিল করে।

হঠাৎ প্রৌঢ় ভোলা দাঁড়িয়ে উঠে, এক হাত কোমরে আর এক হাত কানে দিয়ে জোর গলায় উঠল গেয়ে :

মিছে কথা ক'স্‌নি লো বউ মিছে কথা ক'স্‌নি।
কাল সন্‌ঝেয় এ পোড়া চোখে শুঁড়িখানা দেখিনি ॥
দিন খেটে, ছা' নিয়ে তুই মোর পাশে রাত কাটালি।
কুড়ে বউ ও কুড়ে বউ, তুই মিছে দোষে দুষলি ॥

মেয়ে-পুরুষের মিলিত গলায় একখানা হাসি হুল্লোড়ের ঢেউ বয়ে যায়। মুহূর্তে যেন জমকে ওঠে সকালবেলার গঙ্গার ধার।

সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। ভাঁটা-পড়া গলাও লাল জলে লেগেছে বৈশাখী রোদের ধার। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা চকচক করে রোদে। ভাঁটায় জল নেমে পলি পড়েছে ধারে ধারে। কাঁকড়ার বাচ্চা কুড়োচ্ছে খাবার জন্য কতকগুলো হা-ভাতে ছেলে।

ওপারে চটকল দেখা যায় একটা। এপারেও চটকল উত্তরে-দক্ষিণে। মাঝ-খানে আড়ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বালি ও টালির ভাঙা টুকরো ছড়ানো উঁচু পাড়। দু-তিনটি ছোট-বড় ঝাড়া গাছ। গাছের গা ও অবশিষ্ট পাতাগুলো ধুলোয় ভরা। জায়গাটা উঁচু-নিচু, তাই লরি দুটো খানিকটা দূরে পিছনের মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লরি দুটো এসেছে মাল তুলে নিয়ে যেতে।

আর নৌকো থেকে মাল খালাস করার জন্য এসেছে এই মানুষগুলো। এরা দিনমজুর কিন্তু অনিশ্চিত, এদের দিনের দিন মজুরি পাওয়া, কেন না, এসব আড়তে কখনো একসঙ্গে দু'তিন দিনের কাজ থাকে না। মাল আনা আর দেওয়ার একটি কেন্দ্র মাত্র। তাই এরা ফেরে রোজ কাজের সন্ধানে, আড়তে, ইঁট পোড়ানো কলে, বাড়ি ঘর তৈরি কনট্রাকটরের কার্মে, কাঠ-সুরকির গোলায়। কাছে কখনো, কখনো দূরে! ওদের রোজ মজুরের নির্দিষ্ট মহল্লায় কোন কোন সময় আপনা থেকে ডাক আসে।

কিন্তু যেদিনটা ওরা কাজ পায় না সেদিনটা ওদের অভিশপ্ত। এ ছন্নছাড়া আয়ের মতো জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশী হোক কোন বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা আছে পেট। তবে এ জীবনে পেটটাকেও গোঁজামিল দিতে শিখেছে ওরা। ঘরও নেই, বারও নেই, জীবনের রঙ্গ অঙ্গ সবটাই এখানে। এখানটায় ফাঁক গেলে সব আঁধার। আঁধারের সব কুরূপ না ওৎ পেতে আছে ওদের চারধারে। তাই হাতে যেদিন কাজ থাকে, সেদিন মূর্তিমান আনন্দ। বন্ধনহীন মন, তোলপাড় হৃদয়, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ নয়, যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ আশ।

হৈ হৈ হৈ, ঐ আসে গো ঐ।
কী কী কী ? গোরা সায়েবের ঝি!

আগের গানের প্রসঙ্গ পাল্টে জোয়ান মদন গেয়ে উঠল চেঁচিয়ে কানে আঙুল দিয়ে।

গোরার বেটির মেজাজ চড়া, কাজের হদিস বড় কড়া
বউ লো বউ, কাজে হাত লাগা—

সুরের শেষে টান দিয়ে সে একটু বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মেয়েদের দিকে। এরপর মেয়েদের সুর ধরার কথা।

কিন্তু দেখা গেল মেয়েরা নারাজ। টিপে টিপে হেসে তারা মাথা নাড়ল। মুখ ফিরিয়ে বসল কেউ নিরুৎসাহে গা এলিয়ে। পথে আসতে কুড়িয়ে পাওয়া, খোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়া ঢেকে দিল ঘোমটা তুলে। যেন গানের তালে ফাঁক দিতে গিয়ে সুর থেমে গেছে। সেই ফাঁকে ভাঁটা ঠেলে জোয়ার এসে পড়ল গঙ্গার বুকে! এল নিঃশব্দে চোরা ধাপের তলে তলে! শুধু হাওয়া আসে যেন কোত্থেকে ধেয়ে। আসে চটকলের জেটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে, ক্রেইনের মাথায় লাল ন্যাকড়ায় ফালি উড়িয়ে এপারে ওপারে আগুনের মত কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে।

হা-ভাতে ছেলেগুলো মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোয়ারের জলে। স্টীমলঞ্চ একটা টেনে নিয়ে চলেছে বিরাট গাধাবোট দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

লরির ড্রাইভার এসে দাঁড়াল দলটার সামনে।—সে এদের পরিচিত গুণী বন্ধু। অতবড় একটা গাড়িকে সে খুটকুট মেশিন নেড়ে বোঁ বোঁ করে

চালিয়ে নিয়ে যায়, গায়ে পরে সাহেবী কুর্তা, ফোঁকে সিগারেট, তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা গৌরবান্বিত।

বুড়ো গোবর তার ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল, 'বোসে, পড় ওস্তাদ।

মেয়েদের দিকে একবার চোরাচোখে কটাক্ষ করে কানাই বলল, 'গানই থেমে গেল তো, আর বসব কি সর্দার।'

গোবর সর্দার নয়, কিন্তু সামনে প্রায় তাই। অনেক বয়স ও বহু ঝড়ে ঝাপটায় তার ভাঙাচোরা মুখটার মোটা গোঁফের মধ্যে লুকানো তিক্ত অথচ উদার হাসির ধারে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে আছে। বয়সের চেয়েও শক্ত মোটা গলায় বলল সে, 'ওস্তাদ, তুনিয়াতে কিছুর থেমে থাকবার যো নেই।'

'যো নেই তো থামলে কেন?' কানাই আবার কটাক্ষ করল মেয়েদের দিকে।

'মুখে থেমেছে, মনে থামেনি। শুধোও ওদের।' বলে সে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কিরে শ্যামা গান থেমে গেছে?'

সবুজ শাড়ি-পরা শ্যামা তেমনি মুখ টিপে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ, না।

কিন্তু মদন না মানবে কেন। সে নিজের পাছায় চাপড় মেরে বলল, 'আমি বলছি থেমে গেছে নইলে গলা কেন দিচ্ছে না!'

'আরে জানলে তো!' ভোলা বলল মুখ বেঁকিয়ে, 'মাগীরা আবার গাইতে জানে কবে?'

আর একজন বলল, 'আয় শালা আমরাই গাই, ওদের বাদ দে।'

গাইয়ে মরদের দলটা বসল এক জোট হয়ে।

অমনি কামিনী বুড়ি দাঁড়িয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, 'মাগীরা গাইতে জানে না, জানিস তোরা মরদরা। ঘ্যাতো মদগাঁজাখেকো হেঁড়ে গলায়, আহা কি বাহার!'

বলে কোমরে হাত দিয়ে মাজা তুলিয়ে ভেংচে উঠল,

হৈ হৈ হৈ তোদের মরণ আসে ঐ।

একটা রোল পড়ে গেল দমফাটা হাসির। মেয়েদের ঢলে পড়া হাসি যেন জ্বালিয়ে দিল গাইয়েদের। মনে হয়, আধা ল্যাংটো খালি-গা মানুষগুলো যেন এক মহাখুশীর মজলিস বসিয়েছে গঙ্গার ধারে।

আড়তের বাবু গঙ্গামুখো হয়ে গদীতে বসে হরিনামের মালা জপছিলেন। জপের মাঝে গণ্ডগোল হওয়ায়, দাঁতহীন মাড়ি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'জানোয়ারের দল।'—

আড়তের বাঁধা কুলিটা বসেছিল দরজার কাছে, বেগড়ানো মুখে। সে কুলি বটে, কিন্তু বাঁধা কাজের মানুষ। সেই আভিজাত্য বোধেই দিনমজুরগুলোর

কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে বসেছে। বাবুর গালাগালটা শুনে সেও ঠোঁট উল্টে বলল, 'শালা লুচ্চা লাফাঙ্গার দল।'

কামিনী তখনো বসেনি। সে গাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলল, 'এত জানিস তো, আগের গীতটা ছেড়ে কেন দিলিরে?'

ও। তাও তো বটে। আগের গানটা যে থেমে গেছে মেয়েদের জবাবের মুখে এসে। আসলে ভোলা বা মদন আগের গানটার সব জানে না।

গোবর চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে সেইটেই শুরু করে দেও, নেতিয়ে গেল।'

মুহূর্তে শ্যামার সঙ্গে লাল শাড়ির গলা মিশে সুরের ঢেউ তুলল,

মিছে কথা ক'য়োনি, মিছে ভয় করিনি,
তেমনি বাপের ঝি আমি লই হে
চোখে বালি, মাথায় টালি, সারাদিন হাড় কালি
তুমি যে নেশায় ভোম্ গাছতলায় শুয়ে হে।

হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরতিতে সবাই স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল তালে তালে ঝাঁকানো ও হাততালি।

শ্যামা একটা বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, হায়!··· হায়!···আর লাল শাড়ি সরু গলায় টেনে টেনে যেন বহু দূর থেকে গেয়ে উঠল,

খেটে-খুটে শরীল অবশ, তবু তোমায় তুলি ঘাড়ে,
বলগো সব জনে জনে, একলা মেয়ে, কেমনে যাই ঘরে।

বিবাদ ভুলে গেছে গাইয়ে দল। মনে হয় এখানে সকলের বুকই বুঝি দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছে অভাগী কামিন বউয়ের বিলাপে।

কার গোঙানো গলার স্বর ভেসে এল, 'আমরা বেইমান।'

এবার উঠল সেরা গাইয়ে কৈলাস। তাকে সবাই বলে শুধু। আসলে সে বাউল-বৈরাগী। তার নেই ঘরে বউ ছেলে। তার ডেরা ঘরে ঘরে। দিন-মজুরের জীবনের আড়ালে তার মনের অনেকখানিই গেরুয়া রং-এ ছোপানো।

আর এ গেরুয়া রং-এরই ছোপ খানিক খানিক দাগ ধরিয়ে দিয়েছে এই চোখ-ধাঁধানো লাল শাড়িতে ঢাকা মনের মধ্যে। লাল শাড়ির ঘর খালি। ভরা বয়সে এ জীবনের ভারের ভয়ে পলাতক তার সোয়ামী। আছে শুধু শাশুড়ী ওই কামিনী বুড়ি। কিন্তু তার শাশুড়ী, 'সবার বেলায় দড়োগড়ো, বউয়ের বেলায় বড় দড়ো।' তাই বস্ত্র আঁটুনির ফস্কা গেরোর মত গেরুয়ার ছোপ তার মনের অতলে। কি যেন খোঁজে তার বিবাগীমন। কৈলাসকে দাঁড়াতে দেখে হাসির ঝিলিক ফোটে তার কাজল চোখে হাজার কথা ঠোঁটের কোণে। এইটুকু কামিনী বুড়ি। টের পেলে আর রক্ষে নেই। তবু কৈলাস এক অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখিয়ে গেয়ে উঠল,

মোরে ধিক ধিক ধিক, মন যে আমার বশ মানে না,
আমার ভাঙা ঘর, খালি পেট, তবু যে যাই শুঁড়িখানা।
আমার ছাইয়ের শুকনো মুখ, বউয়ের আমার শুকনো বুক,
আমি দেশ হ'তে দেশান্তরে, আড়ত গোলায় খুঁজি সুখ,

কৈলাসের গানের রেশ শেষ হবার আগেই, ফুঁপিয়ে কান্নার ভঙ্গীতে দ্রুত তালে আবার গেয়ে উঠল, শ্যামা ও লাল শাড়ি,

বাবু সাহেব সাহেব গো, পেট ভরেনি,
কাজ করিয়ে প'সা দেও, ক্ষুধা মরেনি।
দেখ আমার শুকনো বুক, ছায়ের তোষ মেটেনি,
বয়স কালের শরীলে মোর রং লাগেনি।

বৈশাখের খর হাওয়ায় সে গানের সুর ভেসে যায় মাঠ ভেঙে শহরে গাঁয়ে গঙ্গার ছল্‌ছল্‌ তালে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপার ওপার। এ-গানেরই সুরে তালে দোলে আড়তের ন্যাড়া আর দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দোলে মাথা আকাশের।

গাইয়ে-দলের আর আফসোস নেই। নেংটি-পরা খালি গা রং-বেরং-এর মানুষগুলো শূন্যদৃষ্টিতে বসে থাকে চুপচাপ। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন স্তূপাকার করা রয়েছে কতকগুলো বেঢপ মাল। গানের গুঞ্জন এখন তাদের হৃদয়ে ঠিক ঠিক তালে। এ তো শুধু গান নয়: ঘরে বাইরে তাদের মাথা কোটার কাহিনী।

কামিনী বুড়ি কী যেন বিড়বিড় করে গঙ্গার দূর বুকে তাকিয়ে। বুড়ি দীর্ঘদিনের ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি তোলপাড় করে মনে। তার সদাসতর্ক চোখে দেখতে ভুলে যায়, কেমন করে তার বউ ঘাম মোছার আড়ে এক নজরে তাকিয়ে থাকে কৈলাসের দিকে।

কৈলাসও তাকিয়ে থাকে, কিন্তু সে চোখে সেই প্রেমের বিহ্বলতা আছে কিসের অনুসন্ধিৎসা। কেননা, সে যে বলে, ভিত নেই, নেই তার ঘর, নোনা ইঁটে আবার পলেস্তারী। ধু-র শালা। অমন ঘর চাস না কৈলাস যত ছ্যাঁচড়া জীবনের পাপ। ওটা ভেঙে ফেল।

বুঝি সেই ভেঙে ফেলারই হদিস খোঁজে সে লাল শাড়ির চোখে। খেদ কেমন করে কাটবে শরীরে রং না লাগার।

গোবরের ভাচাচোরা মুখটা কালো, মাটির ড্যালার মত ধসধসে হয়ে ওঠে। বলে কানাই ড্রাইভারকে, 'ওস্তাদ, এখন যেন জীবনটা হয়েছে পোকাখেগো ছিঁটেবেড়া। জীবনভর হাতের চাকার মতো আমরা গড়িয়ে চলি, যেন তোমার মেশিন। চালালে চলি, তেল না দিলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করি।'

কানাই তার নিজের অভিজ্ঞতায় চ্যাপ্টা মুখে হেসে বলে, 'বিগড়ে যাও।'

'বিগড়ে যাব ?'

'হ্যাঁ। দেখ না, মেশিন বেগড়ালে তার পায়ের তলায় শুয়ে তেল মাখি। তেমনি বিগড়ে যাও।'

একমুহূর্ত কানাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে গোবর, 'ঠিক শালা বিগড়ে যাব, আমরা বিগড়ে যাব।...'

আড়তের বাবু জপের মালাটি কপালে ছুঁইয়ে ভরে রাখেন কাশ বাক্সে। বলেন, 'হারামজাদাদের চেঁচানিতে একটু ঠাকুরের নাম করার জো নেই।'

বাঁধা কুলিটা বলে আত্মসন্তুষ্ট গলায়, 'শালারা ঈশ্বরের জঞ্জাল।'

ইতিমধ্যে আবার কে গান শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু করল না। তালে যেন ভাঙন ধরে গেছে। এর মধ্যেই সূর্য কখন লাটিমের মত পাক খেয়ে উঠে এসেছে মাথার উপর। তেতে উঠেছে ছড়ানো বালি আর টালিভাঙা টুকরো।

সকলেই তারা ভ্রূ কুঁচকে তাকায় গঙ্গার উত্তর বাঁকে। না এখনো দেখা দেয়নি দশ মাল্লাই নৌকার চ্যাটালো গলুই, কানে আসেনি দশ বৈঠার ছপ্‌ছপ্ শব্দ, দেহাতি মাঝির দাঁড় টানার গান।

সকলেই তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কখন আসবে কখন ? এখানে তারা কেউই একক নয়। সকলের একই ভাবনা, একই দুশ্চিন্তা একই কথা।

সে যেন তাদের মন-পবনের নাও। না এলে যে সব ফাঁকি। পেট ফাঁকি গান ফাঁকি, ফাঁকি এ দিনটাই তাদের জীবনের গুনতিতে।

কখন বেজে গেছে চটকলগুলোর দুপুরের ভোঁ। এখন আর কোথাও পাওয়া যাবে না রোজের সন্ধান। আর আড়তের নৌকো না এলে মাল খালাস না করলে কেউ তাদের হাত তুলে দেবে না একটি পয়সা।

কৈলাস হাঁকে, 'হেই বাবু, মাল আসবে কখন ?'

জবাব আসে খিঁচানো সুরে, 'আমি কি মালের সঙ্গে আছি ?'

বাঁধা কুলীটা বলে গম্ভীর গলায়, 'যখন আসবে, তখন দেখতেই পাবে।'

শ্যামা বলে তিক্ত হেসে, 'সাইবী ?'

বাঁধা কুলিটা খ্যাক ক'রে উঠতে গিয়ে চুপ মেরে যায়। আর সবাই হেসে ওঠে, কিন্তু খাপছাড়া হাসি। আর হাসি আসে না। কাজ নেই, হাত খালি, শুধু মাথা গুঁজে বসে থাকা। এ জীবনেরই একটা মস্ত বিরোধ, যেন আগুনকে চাপা দিয়ে রাখা।

কিন্তু দিনমজুরির এই দস্তুর। কাজ নেই তো, নেই পয়সা। না মুখ চেয়ে বসে থাক তো ভাগো। কোথায় যাবে ? সেখানেই তো কেবলি ভাগো ভাগো ভাগো !—

আড়তের বাবু মুড়ির বস্তা খুলে কিছু মুড়ি ঢেলে দেন বাঁধা কুলিটার কোঁচড়ে। এ সময়ে বসে-থাকা মানুষগুলোরও কথা দেওয়ার কথা দু'আনা

হিসেবে পয়সাটা কাটান যাবে ওদের মজুরি থেকে। কিন্তু কাজ নেই মজুরিও নেই, উশুল হবে কোত্থেকে ?

মুড়ির বস্তা বন্ধ করে, চালাঘরে তালা মেরে আড়তদার পথ ধরেন ঘরের।

কুলিটা আড়চোখে এদের দিকে দেখে আর মুড়ি চিবোয়।

এ মানুষগুলো চুপচাপ দেখে, আর ঢোক গেলে। সকলেই পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে ঐ মুড়ি খাওয়ার দিকেই দেখতে চায়।

কৈলাসের চোখ পড়ে লাল শাড়ির চোখে। চট করে মুখ ফিরিয়ে নেয় উভয়ে। কামিনী বক্‌বক্‌ করে শ্যামার সঙ্গে, 'তিন বছর আগে এট্টা বাঁধা কাজ পেয়েছিলাম জানলি, মিন্‌সে ত্যাখন বেঁচে। সোহাগ ক'রে বললে, যাসনি। পুরুষ-মানুষের সোহাগ।'

হারিয়ে যায় কামিনীর গলা জোয়ারের শব্দে।

হঠাৎ দেখা যায়, তারা সকলেই এ জীবনটার উপর বিরাগে নিজেদের মধ্যে গুলতানি শুরু করে দিয়েছে।

কেউ বলে, 'একবার আমি এট্টা কাজ পেয়েছিলাম. একনাগাড়ি তিন মাসের।'

কেউ বলে, 'আমারও একবছর হয়েছে। কলকাতায় এট্টা বিড্‌লিন বানিয়েছেন।'

আর একজন বলে, 'আরে আমারে তো শালা এখনো অপরেশবাবু এট্টা বাঁধা কাজের জন্য ডাকে।'

'আর তুই খালি যাস্‌ না।' অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় ব'লে কৈলাস।

কেউ কেউ নীরবে হাসে।

কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে সুর, কেটে যাচ্ছে তাল, কথাও আর ভাল লাগে না।

বুড়ো গোবর তার মোটা গলায় বলে আফ্‌সোসের সুরে, 'ওস্তাদ তোমার মতো কাজ জানলে'···

বলতে বলতে হঠাৎ তার গলা হারিয়ে যায়। গোঁফ ধরে টানে আর ভাবে। আবার বলে, 'অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফুরসত পেলাম না এখনো।

ড্রাইভার কানাই বলে, 'জানালেই বা কী হত ? লাইসেনটা পকেটে ফেলে মোটরওয়ালাদের দোরে দোরে ঘুরতে। কাজ কোথায়, কাজ নেই।'

'কাজ নেই!' যেন বাঘাকুত্তার মত গর্‌গর্‌ করে ওঠে গোবর, অস্থির হয়ে ওঠে হঠাৎ। ওস্তাদ এ পেটে উপোসের মেলা দাগ আছে, কিন্তু হাতে একদিনেরও একটা আরামের দাগ পাবে না। কাজ না থাকলেই মানুষ পাগল হয়ে যায়।

কাজ নেই, বাতাস তার পালে ঢিল দেয়। বৈশাখী সূর্য জলে গন্‌গন্‌ ক'রে মাথার উপর। আগুন গলে গলে পড়ে গায়ে, মুখে। গা জলে ঘাম ঝরে

ঝলসে যাওয়া রূপালির মত।

আশেপাশে ছায়া নেই কোথাও। মানুষগুলো গণ্ডুষভরে পান করে জোয়ারের ঘোলা জল, ছিটা দিয়ে চোখে মুখে। কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। কেউ কেউ মাথায় গামছা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ন্যাড়া গাছগুলো যেন মরাকাঠের খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে আছে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে চাওয়া যায় না। যেন ঝলসানো আগুন। ঘোমটা-টানা খোঁপার কৃষ্ণচূড়া শুকিয়ে বিবর্ণ। যেন কামিনদের মুখ:

টাবুটুবু গঙ্গার তীব্র জোয়ারের স্রোত নিঃশব্দ ভরাট। উত্তরের বাঁকে যেন ঝিলিমিলি করে মরীচিকা, বাঁকের পাক খাওয়া জলে উজান ঠেলে আসে না কোন নৌকা।

লাল শাড়ি রোদে জলে দপ্‌দপ্‌, জলে পেট। বুঝি প্রাণটাও।

মনে মনে বলে কৈলাস, চাস্‌নি…এদিকে চাস্‌নি। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে ঠোঁট বেঁকিয়ে। ভিত্‌ নেই…ভিত্‌ নেই।…'

মদন বলে, 'কী বকছ?'

বলছি, সারাদিন বসে গেলাম, তো, প'সা কেন দেবে না?'

'তাই দস্তুর।'

'কেন দস্তুর?'

মদন আবার বলে, 'ওটা আইন।'

হঠাৎ কেমন ক্ষেপে উঠতে থাকে কৈলাস।—'শালার আইনের আমি ইয়ে করি।'

'যতই কর, হবে না কিছু।'

'করলেই হয়।'

মদনও কেমন খচে যায়। বলে, 'আইনটা তোর বাপের কি না?'

'বাপ তুললি তো বলি, তবে বাপেই আইন হবে। তোরাই তো—'

'ফের? মেলা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করবি তো'—প্রায় ঘুষি পাকায় মদন।

ঠিক এসময়েই আড়তদারের ছোট ভাই অর্থাৎ ছোটবাবু আসেন রিক্‌শা থেকে নেমে ছাতা মাথায় দিয়ে। এসে বলেন, তিন মাইল দূরে বাঁকাতলায় মালের নৌকো আটকে রয়েছে, জোয়ার কিনা তাই ঠেলে আসতে পারছে না।

যাক্‌ তাহলে আসছে! সবাই অমনি আবার উঠে বসে।

কয়েকজন বলে, 'তবে আমরাই কেন না গুণ টেনে লাও নিয়ে আসি।'

ছোটবাবু বলেন, 'সে তোদের ইচ্ছে। অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে আপত্তি কি।

অমনি তারা সবাই ছোটে মেয়েরা বাদে।

মাইলখানেক গিয়ে দেখা গেল আড়তদারবাবু আসছেন রিক্‌শায় করে। জিজ্ঞেস করেন, 'যাচ্ছিস কোথা সব?'

'বাঁকাতলায় নাকি মাল নিয়ে লাও দাঁড়িয়ে আছে? বললে ছোটবাবু?'

বাবু মাড়ি বের করে ফোঁস করে হেসে উঠলেন।—'আরে ধুস ভায়া বুঝি তাই বলল? আমি ওকে বললুম যে, বাঁকাতল্লার আড়তে কোন খবর আসেনি। ...সে কখন আসবে তার ঠিক কি...'

মুহূর্তে মুখগুলি যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আবার তারা রোদ মাথায় করে ফিরে আসে গঙ্গার ধারে।

এসে বসে পড়ে তপ্ত বালুর উপর। হাঁপায়। এখন আর মানুষগুলো রং-বেরং নয়, গঙ্গার পাড়ে যেন কতকগুলো কালো কালো শকুন বসে আছে।

কাজ নেই।...গরম জলের কেটলি ঢাকার মতো যেন ফুটতে থাকে কথাটা সবার মাথার মধ্যে। কাজ নেই।...তাঁদের জীবনের দিনগুনতিতে একটা বিরাট শূন্য, ফাঁকা।

সূর্য চলে গেছে, ছুটির ভোঁ বেজে গেছে চটকলগুলোতে। কলরব ক'রে ফিরে চলেছে খেয়া নৌকায়. ছুটি পাওয়া মানুষেরা। ফিরে চলেছে স্টীমলঞ্চ গাধাবোটকে খালাস দিয়ে। লঞ্চের ছাদে, পশ্চিম মুখে বসে নামাজ পড়ে সারেঙ্গ সাহেব।

ভাঁটা পড়েছে, জল নেমেছে, আবার পড়েছে পলি।

'হেই বাবু, লাও আসবেনি?' বারবার জিজ্ঞেস করে সবাই।

'জানিনে।' একই জবাব।

সন্ধ্যা নামে প্রায়।

হঠাৎ মদন খেঁকিয়ে ওঠে, 'এই কৈলেস শালার জন্যেই তো এতখানি ছোটা?'

কৈলাসও চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বাবার জন্যে।'

ওদিকে চেঁচিয়ে ওঠে কামিনী বুড়ি, হঠাৎ গালাগাল পাড়তে আরম্ভ করে বউকে। গলা শোনা যায় লাল শাড়িরও। শ্যামার ঝগড়া লেগেছে তার মরদ গণেশের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের মহল্লার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই তা বেড়ে উঠতে থাকে।

কোথায় তাদের সেই সকাল, সেই গান ও গল্প।

বুড়ো গোবর অ্যাসিডের গন্ধ পাওয়া সাপের মত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'এই গোঁয়ারগুলান, চুপো চুপো তাড়াতাড়ি।'

কে চুপ করে। চকিতে দেখা গেল মানুষগুলো পরস্পর মারামারি শুরু করে দিয়েছে। কে কাকে মারছে, তার ঠিক নেই। সবগুলোতে মিলে একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছে মানুষের। শোনা যাচ্ছে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন, চীৎকার, কান্না।

একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে ধসিয়ে ফেলছে দুনিয়াটাকে। মাটি কাঁপছে থরথর করে। ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ফেঁড়ে ফেলবে আকাশটাকে। কেউ

উলঙ্গ হয়ে গেছে, কয়েকজনের পায়ের তলায় পড়ে গেছে কেউ।…কেন এই মারামারি, তারা নিজেরাই যেন জানে না।

আড়তদার বাবুরা দুই ভাই কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি ক্যাশবাক্সে চাবি বন্ধ করে প্রায় কান্নাভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রামদাস, লাঠি পাকড়ো।'

রামদাস অর্থাৎ সেই বাঁধা কুলি। সে তখন ঘরের পেছন দিয়ে নেমে গেছে গঙ্গার নাবিতে, কালো আঁধারে, আর মনে মনে বলছে, 'আরে বাপরে, শালারা আমার জান নিকেশ করে দিতে পারে।'

হঠাৎ সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে তীব্র মোটা গলায় গোবর হাঁক দিল, 'লাও আসছে, লাও। জোয়ান, তৈয়ার হো।…'

মুহূর্তে যেন জাদুমন্ত্রে থেমে গেল সমস্ত গোলমাল, মারামারি, হাতাহাতি। সকলে ফিরে তাকাল উত্তরের বাঁকের দিকে, নিঃশব্দে।

পুবে উঠেছে, আধখানা চাঁদ, ভাঁটার জলে তার ঝিলিমিলিতে দেখা যায় অদূরেই কতকগুলো বিরাট বড় বড় নৌকো, গঙ্গার বুকে ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে। মোটা মাস্তুল উঠেছে আকাশে।…

সেই নৌকো থেকে ভেসে এল একটা স্বর, হো-ই-ই…

আসছে, আসছে তাদের মন-পবনের নাও। মাঝবেলায় এসেছে সকলে। কারুর দাঁত ভাঙা, ঠোঁট কাটা, চোখ ফোলা, নখের ক্ষত। কারুর হাতে কার ছিঁড়ে নেওয়া এক মুঠো চুল কিংবা পরিধের কাপড়ের টুকরো।

অকস্মাৎ ভাটার ছল্‌ছল্‌ তালে তাল দিয়ে কে গেয়ে উঠল সরু গলায়,

ওই আসে গো, ওই আসে লা'য়ে ভরা টালি,
মাঝি এস তাড়াতাড়ি,
আর যে ভাই রইতে নারি
আঁধার নামে গাঁয়ে ঘরে, লাও করব খালি।

গান গাইছে লালশাড়ি। সুর তুলেছে আবার, তাল লেগেছে আবার, শরীরের পেশীতে পেশীতে।

এগিয়ে আসে গোবর, 'কামিনী বুড়ি, তুই এখন চোখে দেখতে পারিনে, ঘরে যা। শ্যামা তুই পালা, ঘরে তোর ছেলে রয়েছে। ভোলা তুইও যা, তোর চোট বেশী।

তারা বলল, 'আমরা খাব কী?'

'তোদের মজুরিটা আমরা গায়ে খেটে তুলে দেব।'

সবাই বলে উঠল, 'রাজী আছি!'

যেন এ মানুষগুলো কিছুক্ষণ আগের সেই হিংস্র প্রাণীগুলো নয়।

কামিনী বুড়ি বলে গেল, 'বউ হুঁশিয়ার।…'

তারপর এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে যায় কাজের। নৌকো লাগে পাড়ে। শুরু হয় মাল তোলা। গানে, কাজের উন্মাদনায়, হাঁকে-ডাকে মুখরিত গঙ্গার ধার।

পাঁচ নৌকো খালাস হলেই একদিনের রোজ পাবে কুড়িজন।

কোনখান দিয়ে সময় কেটে যায়, কেউ টেরও পায় না। জুড়ি বেছে নিয়ে সব মাল তুলে দেয় লরীতে। একটা যায়, আর একটা আসে।

ঝুড়ি কোদাল জমা দিয়ে, রোজের পয়সা নেওয়া হলে লালশাড়ি সকলের চোখের আড়ালে আড়ালে কৈলাসের হাত ধরে টেনে নেমে গেল গঙ্গার ঢালু পাড়ের নিচে। বলে রুদ্ধ গলায়, 'সারা মুখ রক্তারক্তি। এস, ধুয়ে দি।...'

কৈলাস বলে অদ্ভুত হেসে, 'রক্ত তো তোর মুখেও, ধুয়ে আর তা কত তুলবি।...'

কিন্তু কেন...কেন? ফুঁপিয়ে উঠল লালশাড়ি।

আবার জোয়ার আসায় দক্ষিণ হাওয়ার ঝাপটায় ভেসে গেল তার গলা।

তখন অনেকেই নেমে এসেছে গঙ্গার কিনারে।

আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে শিবির টেপা ঠোঁটের হাসিটা যেন গজলের প্রথম বিস্তারের মত ব্যাপারটাকে লহরার দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর বিষ্টুপদ না-হাসি না-রাগ গোছের মুখে অপ্রতিভ তবলচির ডুগিতে একটা শব্দ করে থেমে যাওয়ার মত জিজ্ঞেস করল, 'মাইরি?'

শুনে শিবি সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তার মিঠে গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল যেন তালফেরতা পেরিয়ে তবলায় বাজল দ্রুত রেলার বোল।

বলল, 'মাইরি আবার কি। মিছে বলছি বুঝিন?'

মনে হল বিষ্টুপদের মুখে একটা ঘুষি মেরেছে কেউ। সে প্রায় খ্যাক ক'রে উঠল, 'তাহলে সাত নম্বর?'

শিবি অমনি ঘোমটা একটু সরিয়ে ছোট মেয়ের মত মুখখানি বেজার ক'রে বলল, 'আমার দোষ নাকি? এই নিয়ে তো আট হত একটা চলে গেল তাই—।'

বিষ্টুপদ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। সে অবাক হয়ে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শিবির দিকে।

তার বউ শিবি। লম্বা চওড়ায় দোহারা শরীর মাজা মাজা রং, সাধারণ দুটো চোখ। বয়স প্রায় তিরিশ। বিচার করলে রূপ তার কিছুই হয়তো নেই। কিন্তু তার এ সাদাসিধে চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অপরূপের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যে, পেছন ফিরলে আবার ফিরে দেখতে হয়। তার বয়স হয়েছে, বয়সের দাগটা পড়েনি। যেন পাতি হাঁসটার হাজারবার জলে ডোবানো, তবু ঝরঝরে শরীরটার মত! মুখটা কাঁচাটে অর্থাৎ রূপের যদি কোন কাঁচামিঠে স্বাদ থাকে, তবে তাই। ওই মুখে তার নিয়ত হাসির কারণ বোঝা দায়।

বিষ্টুপদর সাতসকালে এ বিস্ময় ও ক্ষুব্ধতা এখানে নয়, অন্যত্র। সে ভাবছে, এই মেয়ে ন' বছর বয়সে, তার ঘরে এসেছে, তেরো বছর বয়স থেকে যথানিয়মে সন্তান প্রসব ক'রে চলেছে। শরীর একটু টসা দূরে থাক, বিষ্টুপদ যখন জ্বালা-যন্ত্রণায় রোজই বলছে, 'এবার শালা কেটেই পড়ব, ঠিক তখনই শিবি সোহাগ করে, হেসে, থাপ্‌চি কেটে কেটে বললে কিনা, 'মিঠুর দোকান থেকে এট্টুস নক্কার আচার এনে দেবে?' এই সামান্য কথাটাই একটা মস্ত সর্বনাশের মহাইঙ্গিতপূর্ণ বিষ্টুপদর কাছে। এই কথাটা যতবার সে শুনেছে শিবির মুখ থেকে, ততবারই তার পিতৃত্বের শঙ্খনি বেজে উঠেছে আঁতুড়ঘরে। যেন মৃত্যু ঘোষণা করেছে বিষ্টুপদর। তাই সে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়েই জিজ্ঞেস করেছে, 'মাইরী?' যেন তাহলে সে শুনতে পাবে, 'না।' কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত শিবি হেসে উঠেছে খিলখিল্ ক'রে। উপরন্তু মুখ বেজার ক'রে

বলছে, এই নিয়ে তার আট হ'ত। বোঝ, যেন গাছের ফল।

এই মুহূর্তে সে শিবির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল যেন শিবি তার কোন নিষ্ঠুর আততায়ী। পরমুহূর্তেই মোটা ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'নকার আচার না, এবার আমার মুণ্ডুটা এনে দেব। রইল শালার সম্সার আর ঘর আর রোজগার।'

বলেই ঘট্‌ঘট্‌ করে বেরিয়ে যেতে যেতে তার সেই স্বভাবসিদ্ধ ইংরেজী কথা ক'টি শোনা গেল, 'অল শালা ব্রাডি বোগাস্‌।'

কাদের দুড়-দাড় ক'রে ছুটে পালাবার শব্দ শোনা গেল। আর কেউ নয়, বিষ্টুপদর ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়ের দল পালাচ্ছে বাপের খ্যাকানি শুনে, আর ছ'টি সন্তানের মা শিবি প্রায় একটি বালিকার মত অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর বালিকার মতই ঠোঁট কেঁপে চোখ ফেটে তার জল এল। কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন জন। শিবির ধন নেই কিন্তু পুত্র দিয়ে লক্ষ্মী লাভের সৌভাগ্য যে সংসারে এত বিড়ম্বনা, তা কে জানত!

বিষ্টুপদ চলেছে হন্‌হন্‌ ক'রে। চলা না ব'লে তাকে ছোটা বলাই ভাল। লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের উপর, গায়ের রং ক্ষয়-পাওয়া-রোদে পোড়া ন্যাড়া গাছের মত। তেমনি শুকনো শক্ত হাড়কাঠ সার শরীর। খোঁচা খোঁচা গোঁ-মারা চুলগুলিকে তেল-জলের সার দিয়ে যেন পেড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চুল ভাঙে তো মচ্‌কায় না। মোটা ঠোঁট আর যাকে বলে অশ্বনাসিকা। গুলিভাটা গোল চোখ। আর খাকী ফুলশার্টের হাতে গলার বোতামটি পর্যন্ত আটকানো। দশ হাত কাপড় হাঁটুর বেশ নামেন নি। তার তলা থেকে নেমে এসেছে আগুনে সেঁকা বাঁশের মত শিরবহুল সরু পা। পায়ে পরেছে পুরানো ফাটা টায়ার কাটা বে-সাইজের স্যাণ্ডেল।

এই হল বিষ্টুপদর চেহারা। বংশমর্যাদায় কুলীন কায়েত। কোন্‌ অজানা যুগে নাকি বাপ-ঠাকুরদা প্রজা শাসনও করত। আর সে এখন কাজ করে মিউনিসিপ্যালিটিতে। ডেজিগনেশন লেখা আছে, কন্‌সারভেন্সি সুপারভাইজার ২নং ওয়ার্ড। বিষ্টুপদ নিজে বলে, এ এস আই অর্থাৎ অ্যাসিস্টাণ্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ডোম মেথর ধাঙড়ধাঙড়িরা বলে, ছোট সোনাটরবাবু। মানে স্যানিটারিবাবু। পাড়ার ছোঁড়ারা আড়ালে বলে, শালা ধাওড়ার ভূত, ধাঙড়-সর্দার।

সত্যি, চলেছে যেন তে-ঢিঙ্গে লম্বা একটা একরোখা ভূতের মত। সামনে পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, কোনদিকে হেলে না। মোটা ঠোঁট কুঁচকে রয়েছে অসহ্য তিক্ততায় ও যেন কিসের প্রতিজ্ঞায় ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা আর কোঁচকান চোখ জোড়ার দূরে নিবদ্ধ অপলক চাউনিটা হ'য়ে উঠেছে শিকারসন্ধানী হিংস্র শ্বাপদের মত।

ফাল্গুন মাস, আকাশ নির্মেঘ। হাওয়া পাগল। সকালবেলাটা যেন

গোলাপী নেশার আমেজে ঢুলছে। রোদে তাত নেই। পাতা নেই গাছে গাছে। ধুলো উড়ছে, শুকনো পাতা উড়ছে, উড়ছে কাগজের টুকরো আর শুকনো রাবিশের ভাঁই।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকতে না ঢুকতেই ফ্যালা ডোম হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে তাকে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে সোনাটিরবাবু, এসে পড়েছ?'

বিষ্টুপদ থমকে দাঁড়াল। তার চোখ মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল রাগে। ক্ষেপে উঠে ভেঙচি কেটে বলল, 'তা' পথের মাঝে কেন, অফিস থেকে ঘুরে এলে হ'ত না! কানা ডোম কোথাকার!'

ব'লে সে যেন বাতাসে ধাক্কা মেরে চলে গেল অফিসে। ফ্যালা আবার হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে আপন মনে বলল, 'যাও অর্ডারটা নিয়ে এস।'

সত্যি, ফ্যালা একে ডোম, তায় কানা। চেহারাটা এমনিতে মন্দ ছিল না। কালো মাংসালো মাঝারি শরীর, ঘাড়ের কাছে বেয়ে পড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় কালো সুতোয় বাঁধা মাদুলি। কিন্তু এক-চোখো। একটা চোখ তার ভাল, এমন কি টানা সুন্দরও বলা যায়! আর একটা চোখে মণি নেই। সাদা ক্ষেত্রটা সাদানীলে মেশানো ঘষা কাচের আবরণ ব'লে মনে হয়। হাসলে কিংবা রাগলে তার ভাল চোখটা বুজে যায়, আর কানা চোখটা বড় হয়ে ঠেলে ড্যালা পাকিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে গজ-দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখটা।

ফ্যালা বিষ্টুপদর সারাদিনের কাজের সঙ্গী হলেও সকালবেলা ওই এক-চোখো ডোমের মুখ দেখতে সে রাজী নয়। কিন্তু কপাল গুণে দোষ। বোধ করি ফ্যালার মুখটা দেখার দোষেই অফিসে ঢুকতে না ঢুকতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ছেঁড়া শোলার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তাকে এক বিদঘুটে নতুন হুকুম শুনিয়ে দিল। নতুন নয় এর আগে অবশ্য আরও দু-চারবার তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। তাকে কুকুর মারতে যেতে হবে। কিন্তু লাঠি দিয়ে কুকুর মারা সাম্প্রতিক আইনে নিষিদ্ধ। তা'ছাড়া খাবারে বিষ দিয়ে মারলে হয়রানিও কম। ইন্সপেক্টর স্টিকনিয়া বিষের শিশিটা আর কটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেরিয়ে পড বাবা বিষ্টুচাঁদ। তোমাদের এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি দরখাস্ত এসেছে। গাদা গাদা বাড়তি কুকুরে নাকি এলাকা ছেয়ে গেছে। তার উপরে একটা নাকি পাগলা খেপী, দু'জনকে কামড়েছে। টাকা দিয়ে মেঠাই মণ্ডা যা কিনবে, ভাল দেখে কিনো আর কুল্যে এক কুড়ি না হোক, ডজন খানেক সাবড়ে এস, বুঝলে?'

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল বিষ্টুপদ। এখন তার দাঁত চাপা মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তার চোখের সামনে ভাসছিল ফ্যালা ডোমের মুখটা। পরমুহূর্তেই সে চাপা দিয়ে দেখা দিল শিবির টেপা হাসির সোহাগী মুখ। আসলে ঐ অশুভক্ষণটি থেকেই আজকের এই অভিশপ্ত দিনটার শুরু।

তবেই গোঁ-ধরা ভূতের মত কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শক্ত হাতে বিষের শিশিটা

তুলে নিল। মনে মনে বলল, 'সেই ভাল, আজকের থেকে সকলের মুখে আমার বিষ দেওয়ার পালাই শুরু হোক।'

তারপর কি মনে ক'রে খ্যাপা শিম্পাঞ্জীর মত দাঁতগুলো বের ক'রে খ্যাক ক'রে উঠল. 'তা' এবার আমার ওই ডেকিজনেশন না ডেক্‌চিনেশনে সোপার ভাইজারটা কেটে ডোম করেই দেওয়া হোক্।'

স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হি-হি করে হেসে বলল, 'আরে ছ্যা, ডোম তো তোমার শাগরেদী করবে। তোমার পোস্টটা তা'হলে বিষ্টুচাঁদ ডগ্‌কিলার করতে হয়।'

'ডগ্‌কিলার?'

'হ্যাঁ, ডগ্ মানে কুকুর, আর কিলার মানে খুনী।' ব'লে ময়লা হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আবার হি-হি করে হেসে উঠল ইন্সপেক্টর।

নাকের পাটা ফুলিয়ে, চোখ-ঘোঁচ ক'রে বিষ্টু বলল চাপা গলায়, 'তার চে' মানুষ-খুনী পোস্টই ভাল।'

জবাব দিতে গিয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের জিভে কামড় পড়ে চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল।

বিষ্টুপদ ততক্ষণে টাকা ক'টা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। পিছনে তার ফ্যালা ডোম।

খানিকটা গিয়ে ঘাড়ের থেকে লোহা-বাঁধানো লাঠিটা নামিয়ে বলল ফ্যালা, 'আচ্ছা সোনাটারবাবু, আগে তো শালা ডাণ্ডা হেঁকেই কাজ হ'ত আজকাল এ নিয়ম কেন?'

'আইন নেই।'

কেশো গলায় খ্যাল্‌খ্যাল্ ক'রে হেসে বলল ফ্যালা, 'শালা এ্যাইনটা বড় মজার। মারো, তবে পিটে নয়, বিষ দিয়ে।... অল শালা বেলাড়ি বোকাস্।'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে চোখের কোণ দিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বিষ্টু বলল, 'খচাসনি ফ্যালা, টুঁটি চেপে এই বিষ ঢেলে দেব গলায়।'

ফ্যালার কানা চোখের সাদা ড্যালাটা বেরিয়ে এসে তার চাপা হাসির মত কাঁপতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে তারা দুজনে যখন আধা শহর, আধা গ্রামাঞ্চলটার সীমানার নিরালা মাঠের ধারে, বাজ পড়া মাথা মুড়নো তালগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল, তখন মনে হল যেন যমালয়ের দুটো গুপ্তচর নেমে এসেছে মারণ-যন্ত্র নিয়ে।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনের রোদে একটু একটু তাত ফুটতে আরম্ভ করেছে। হাওয়াটা উদাস বৈরাগীর দীর্ঘশ্বাসের মত একটা চাপা হাহাকার তুলে যাচ্ছে মাঠের মাঝে। ফ্যালা ট্যাঁক থেকে একটা কলা পাতায় পুরিয়া বের ক'রে ভেতর থেকে কালো মত একটা ছোট ড্যালা বাড়িয়ে দিল বিষ্টুর দিকে। জিনিসটা বাটা সিদ্ধি। বলল, 'ইচ্ছাপূরণের গুলিটা খেয়ে লাও সোনাটরবাবু। ব্যেটাকে

ধরবে আর প্রাণ নিয়ে সেটাকে ফিরতে হবে না।'

বস্তুটির দিকে এমনভাবে তাকাল বিষ্টু যেন এতেও তার মেজাজ খচে যাচ্ছে। দাঁত চেপে বলল, 'শালা মাতাল কোথাকার।' বলেই ছোঁ মেরে সিদ্ধিটুকু মুখে দিয়ে কোঁত্ করে গিলে ফেলল।

ফ্যালাও একটা গুলি মুখে পুরে, ভাল চোখটা বুজিয়ে কানা চোখটা দিয়ে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে বোগড়া দাঁত বের করে ফেলল। সুড়ুত্ ক'রে মুখের নালটা গিলে নিয়ে বলল, 'ওই বস্তু একখান বার কর সোনাটরবাবু। নইলে ইচ্ছা শালা আধখ্যাচড়া থাকবে।'

'মাইরি?' বলেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ফিরিয়ে বিষ্টু সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল। অনুপায় বুঝে পেছন ধরল ফ্যালা।

খানিকটা গিয়ে বিষ্টুর হাত চেপে ধরল ফ্যালা। দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। আঙুল বাড়িয়ে হাত কুড়ি দূরে একটা কুকুর দেখাল। একেই বলে ডোমের চোখ। তাও কানা। যেন দুটো গুপ্তঘাতক শিকার পেয়েছে।

বিষ্টু দেখল, কুকুরটাও থমকে দাঁড়িয়েছে। সাদা কালো মেশানো বেশ বড়সড় কিন্তু হাড় বের করা ক্ষীণজীবি জানোয়ারটার হলদে চোখের ভাবটা, এ লোক দুটোকে দেখে খ্যাঁক ক'রে উঠবে কি উঠবে না। বিষ্টুর নজরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে দোআঁশলা মন্দা। এক লম্বর ওয়ার্ডের মাল তো?'

ঠোঁট উল্টে বলল ফ্যালা, 'না-ই বা হল। এলাকাটা তো তোমার?'

'যা বলেছিস। তুই ব্যাটা ডাণ্ডা নিয়ে একটু তফাত যা।' ব'লে সে হাঁড়ির শালপাতার ঢাকনা খুলে বের করল একটা রসগোল্লা। ছুরি দিয়ে রসগোল্লাটা একটু ফুটো ক'রে তার মধ্যে পুরে দিল এক টিপ্ বিষ। তারপর ফুটোটা বন্ধ ক'রে সে ফিরে তাকাল কুকুরটার দিকে। এবার তার গুলিভাটা চোখে খুনীর হিংস্রতা। যেন সে কারুর পেছন থেকে ছুরি মারতে উদ্যত হয়েছে।

কুকুরটা চাপা গলায় গর্জাচ্ছে। অর্থাৎ এদের মতলবটা কি। কিন্তু সেই সঙ্গেই ল্যাজ নেড়ে, জিভ দিয়ে গাল চেটে লুব্ধ চোখে দেখছে রসগোল্লাটা।

বিষ্টু জিভ দিয়ে তু তু করতেই, কুকুরটা কয়েক পা পেছিয়ে ঘেউ ক'রে উঠল। কিন্তু পালাল না। বিষ্টু এবার কয়েক পা এগিয়ে গেল। কুকুরটাও পেছুল। কিন্তু লোভ আর সন্দেহের দো-টানায় পড়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করছে।

বিষ্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে, একটি পরিষ্কার জায়গায় রসগোল্লাটি রেখে সটান পেছন ফিরে একেবারে সেই ন্যাড়া তালগাছটার তলায় ফ্যালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কুকুরটা কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল। তারপর আড়চোখে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রসগোল্লাটার কাছে।

উত্তেজনায় বিষ্টুর দাঁতগুলি চেপে বসেছে ঠোঁটের উপর। চাপা গলায় বলল,

'খা খা শালা।' ফ্যালার সাদা চোখটা বড় হয়ে হাঁ করা মুখের কস দিয়ে লাল গড়িয়ে এল খানিকটা আর নিশপিশ্ ক'রে উঠল লাঠিধরা হাতটা।

কুকুরটা আর একবার তাদের দিকে দেখেই কপ্ ক'রে রসগোল্লাটা মুখে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটে গেল। কিন্তু লোক দুটোকে না আসতে দেখে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে গেল। খেয়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

'খেয়েছে শালা, খেয়েছে।' সাফল্যের উল্লাসে বিষ্টুর বেজীর মত চোখ দুটো যেন আরও জ্বলে উঠল। বলল, 'চ দেখি টেঁস ক'রে ম'ল কিনা!'

ফ্যালারও গজ দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়েছে খ্যাপা কুকুরের মত। বলল, 'মরবে না আবার! তবে এক্টা রসগোল্লা খেয়ে ম'ল মাইরি!'

বলে সে লালার দরানি জিভ্ দিয়ে চেটে নিল। তারপর দুজনেই মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

কুকুরটা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছিল একটা আসশেওড়া ঝোপের তলায়, লোক দেখেই ছুটে পালাল। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না। খানিকটা গিয়েই টলতে লাগল আফিমখেগো আড়-মাত্লার মত।

তীরবিদ্ধ শিকারের পেছনে পেছনে ক্ষিপ্ত ব্যাধের মত ফ্যালা আর বিষ্টু ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল পাড়ায়।

কুকুরটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে ঝিম্ ধরা মাতালের মত।

চোখ দুটো আধবোজা রক্তবর্ণ। ঘং ঘং ক রে কাশছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে বুকের পাঁজরা। ঠিক যেন একটা মুমূর্ষু বুড়ো। উগরে ফেলতে চাইছে পেটের বিষ।

বিষ্টু এক নজরে মুখ বিকৃত ক'রে এ মরণলীলা দেখছিল। ফ্যালা হঠাৎ খ্যাল্খ্যাল্ ক'রে হেসে হেড়ে গলায় চীৎকার করে গান ধরে দিল :

'ও তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল
যম দাদাকে যেয়ে ব'লো,
খেয়েছি মণ্ডা মেঠাই,
সোনাটরবাবুর হাতে।'

আবার হাসতে গিয়ে থেমে বলল, 'সোনাটরবাবু ঠাউরের নাম লেও।'

'কেন'

'এট্টা পাণী হত্যে ক'রলে, পাপ লাবাতে হবে না?'

পাপ? বিষ্টুর প্রাণের কোথায় চাপা পড়া আগুন যেন উস্কে উঠল পাপ কথাটায়। তীব্র চাপা গলায় বলল, 'দাঁড়া! ঘর বার সব সাবড়াই প্রাণ খুলে, তারপর দেখা যাবে তোর ঠাকুরের নাম।'

ব'লে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল।... কুকুরটা সামনের দিকে বাড়ানো পায়ের মাঝখানে হাঁটুতে মাথা গোঁজার মত এলিয়ে পড়েছে, আর ঠেলে বেরিয়ে আসা নিষ্পলক চোখ দুটো তাকিয়ে আছে

বিষ্টুর দিকে। মরে গেছে কুকুরটা।

বিষ্টু মুখটা ফিরিয়ে এগুতে এগুতে বলল, 'ফ্যালা বিকেলে গাড়ি করে ভাগাড়ে নিয়ে ফেলে দিস! তারপর হঠাৎ নাকটা কুঁচকে বলল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস।'

তারপর চলল সারা এলাকা জুড়ে কুকুর মারার পালা। কখনো গঙ্গার ধার থেকে পুবের রেল লাইন পর্যন্ত, কখনো লাইনের উপর উত্তর দক্ষিণের এক নং ওয়ার্ডের দুই সীমানা পর্যন্ত।

কি রকম একটা নেশায় পেয়ে বসেছে বিষ্টুপদকে। ক্ষিপ্ত হিংস্র, একরোখা। যেন কোন খুনী হত্যালীলায় মেতেছে।

ফ্যালার হাতের লাঠি ঠাণ্ডা তো ফ্যালাও ঠাণ্ডা। তার কোন উত্তেজনা নেই। সে খালি লুব্ধ কুকুরগুলির মতই জলজ্বলে চোখে দেখছে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটা আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে।

কিন্তু সোনাটরবাবুর খ্যাপামি দেখে চাঁইতে ভরসা পাচ্ছে না। যা হয় ওই দেখে দেখেই। আশা আছে শেষের বেলায়। বোধ হয় শেষের বেলার কথা ভেবেই কালা চোখটা নাচিয়ে নাচিয়ে হাতের লাঠিতে তাল ঠুকে গুন্‌গুন্ করছে সে।

কিন্তু বিষ্টুর নজর শুধু একদিকে, কুকুর। যেমনি দেখা, অমনি রসগোল্লা, ছুরি আর বিষ। তারপর, 'খা, খা শালা জন্মের মত।' বলে আর জিজ্ঞেস করে, 'ক' নম্বর হল ফ্যাল্যা?'

ফ্যালা আধ ডজন নম্বরে দাঁড়াল।

পেছনে পেছনে ভিড় করে পাড়ার বাচ্চা ছেলের দল। বিষ্টু খেঁকোয়, 'দোব রসগোল্লা?' ফ্যালা তাড়া দেয় বাচ্চাগুলোকে।

কেউ বলল, 'অমুক কুকুরটা মেরে দিও তো। রোজ শালা রাত ডিউটি থেকে ফেরবার পথে কামড়াতে আসে।'

কেউ বা বলল আবার, 'অমুক কুকুরটা মেরো না হে বিষ্টুপদ। ওটা সারারাত খেঁকোয়, আমি তাই জেগে থাকি। যা চোর ডাকাতের ভয় বাবা।'

বিষ্টু ওসব কমই শোনে। যেটাই সামনে পড়ুক, গলায় দড়ি, বেল্ট বাঁধা না থাকলেই হল। কিন্তু সেই খেপী কুকুরটা কোথায় গেল? খেঁকি খেপীটা?

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় বিষ্টু। বলে, 'ফ্যালা, ওই যে একটা শুয়ে আছে।'

ফ্যালা কানা চোখ বড় করে হেসে বলে, 'ওটা শোয়া নয়, মরা।'

'মরা? কে মারল?'

'কেন, তুমি, সোনাটরবাবু।'

তা বটে। খেয়াল নেই বিষ্টুর। প্রায় সব পাড়াতেই গাদা গাদা কুকুর দেখে তার মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করে, 'ফ্যালা, এত কুকুর এল কোত্থেকে?'

ফ্যালা বলে, 'কেন, ভাদ্দর মাস গেছে, হারামজাদীরা বিইয়েছে কাড়ি কাড়ি।'

বিষ্টু খানিকক্ষণ চুপ করে মাথা নেড়ে বলে 'হুঁ'। কি খেয়ে বাঁচে এগুলো?'

'কি আবার, পচা পাত্‌কুড় বিষ্ঠা।'

খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ ক'রে বোধ হয় বিষ্টু হেসেই ফেলে। বলে, ঠিক মানুষের বাচ্চার মত, না? বলেই বিকৃত মুখটা ফিরিয়ে আবার হন্‌হন্ করে এগোয়। আবার চলতে থাকে কুকুর নিধন অভিযান। আর ফ্যালা আবার বাড়িয়ে দেয় ইচ্ছাপূরণের গুলী। শুধু তার ইচ্ছা পূরণ হয় না।

ফাল্গুনের হাওয়া থেকে থেকে অনাগত চৈত্রের ঘূর্ণিতে মেতে উঠছে। বেলা বাড়ছে চড়চড় করে। নীল আকাশটা ধুলোয় ধুলোয় ফ্যালা ডোমের ঘষা চোখটার মত রং ধরেছে। হঠাৎ ফ্যালা বলে, 'আচ্ছা সোনাটরবাবু, মানুষও কি শালা বাড়তি হয়ে গেছে?'

বিষ্টু বলে, 'নইলে এত মরে? খাবে কি! খায় তো সব পচা বিষ।'

ফ্যালা ভাল চোখটা বুজিয়ে বলে, 'তা'হলে মানুষের মাথার পরেও শালা সোনাটরবাবু আছে বল! সে ব্যাটা কে?'

হঠাৎ বিষ্টুর অপ্রতিভ মুখে কোন কথা যোগায় না। তারা দুজনেই তিনটে নেশাচ্ছন্ন চোখে পরস্পরের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। দু'জনেই তারা কি এক ভাবনায় যেন তলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। বোধ হয়, সত্যিই ভাববার চেষ্টা করে, মানুষের বিষবাহী সেই জীবটা কে।

পরমুহূর্তেই বউ শিবির সকালবেলা মুখটা মনে হতেই সে রেগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ত্যাখ কানা ডোম, কাজের সময় বকিস্‌নি। নিকুচি করেছে তোর মান্‌ষের সোনাটারের। শালা মরুক সব। হেজে যাক, সেই ভাল। এবার হিসেব দে, কটা মরেছে।'

ফ্যালা ভাবে, কুকুর মারার মত মানুষের সোনাটারবাবুও বোধহয় এ রকমই ভাবে। বলে, 'তা কুল্যে আটটা হল!'

'মাত্তর!'

আবার শুরু। আবার সন্ধান। বিষের শিশি যেমন তেমনিই তো আছে। খরচ কোথায়? সেই খেপীটা কোথায়, যেটা কামড়ায়? ঘোর দুপুর নিঝুম! ফাঁকা পথ, লোকজন নেই। ঘরে ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ। এখানে ওখানে মরা কুকুর। চারদিকে মাটির উল্লাস। হয়তো আকাশে উড়ে চলেছে শকুনকে সংবাদ দিতে। আর ভ্যানভ্যান করে উড়ে চলেছে বিষ্টুর সঙ্গে হাঁড়ির গায়ে গায়ে।

আর এ বসন্ত দুপুরে, বিষ্টু ও ফ্যালাকে মনে হয়, সত্যিই বুঝি দুটো হন্তে হওয়া যমেরই অনুচর।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই ফ্যালা, শীগগির আয়, এখেনে রয়েছে সেই খেপীটা।' দুজনেই তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়েই পালাল।

দেখা গেল অদূরেই নর্দমাতে মুখ নিচু করে কি যেন খাচ্ছে একটা কুকুর। রোগা, লম্বা, ছাই রং-এর মাদী কুকুর! সমস্ত শরীরের ভারটা নিচের দিকে ছ'টা পুষ্ট স্তনের ভারে ঝুলে পড়েছে। নিটোল মেটে বর্ণের চোষা স্তন।

দেখেই বিষ্টুপদর চোখের দৃষ্টি যেন জ্বলে উঠল। বলল, 'ফ্যালা, হারামজাদী বিইয়েছে।'

ফ্যালা বলল, 'ওই জন্তই বোধ হয় খেঁকি হয়েছে। দেখ না, মেয়েমানুষে বিয়োলে খেঁকি হয়?'

'হুঁ। এটাকে মারলে একটা বিউনী কমবে। ওকে শালা আমি জোড়া রসগোল্লা খাওয়াব।' বলে সে দুটো রসগোল্লা বের করে কেটে বিষ পুরে দিল।

কুকুরটা হঠাৎ নর্দমা থেকে মাথা তুলল। এদের দেখে আরও খানিকটা গলাটা টান করে ঘাড় বাঁকিয়ে বিষ্টুর হাতের বস্তুটির দিকে তাকাল। হলদে মণি আর লাল চোখে সামান্য একটু কৌতূহল ফুটল। কিন্তু একটা শাণিত খ্যাপামি ও সন্দেহে চক্‌চক্ করছে চোখ দুটো!

বিষ্টু রসগোল্লা দুটোর কাছে এসে এক মুহূর্ত মাথা নিচু করে দাঁড়াল। আবার মুখ তুলে একবার বিষ্টুকে দেখে, হঠাৎ পেছনে ফিরে দুধের বাঁধ দুলিয়ে দুলিয়ে চলে গেল।

বিষ্টু আর ফ্যালা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে এগিয়ে এসে দেখল, কুকুর খাবার ছোঁয়নি পর্যন্ত। আশ্চর্য! আশাতীত।

রাগে বিস্ময়ে বিষ্টু জ্বলন্ত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরে শালা, হারামজাদী যে মানুষের বাড়া দেখছি।'

ফ্যালা বলল, 'সেয়ানা হয়ে গেছে। হবে না, ও যে মাদী। পেটের বাচ্চা পালতে হবে যে।'

দৃঢ় চাপা ক্রুদ্ধ গলায় গর্জে উঠল বিষ্টু, 'পালাচ্ছি বাচ্চা। যাওয়াচ্ছি ওর মাই দুলিয়ে দুলিয়ে।'

খপ্ করে সে রসগোল্লা দুটো তুলে নিয়ে পলকে দেখে নিল, বাঁ দিকের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। বলল, 'চ' ফ্যালা, বিষ, না হয় তোর ডাণ্ডা দিয়েই ওকে সাবাড় করতে হবে।'

ফ্যালার ওতে কিছু যায় আসে না। বলল, 'চল। কিন্তু দুটো মিষ্টি নষ্ট করলে তো সোনাটরবাবু।'

বিষ্টু খেঁকিয়ে উঠল, 'তবে কি তোকে দেব?'

ফ্যালা কানা চোখের ড্যালা কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'আমাকে না হয়, আমার ডোমনিটাকে তো দিতে পারতে?' বলে হা হা করে হাসে। 'জানলে বাবু বউটা

ওই হাঁড়ির জিনিসটা এখন খালি পেতে চায়। মানে, পোয়াতি কি না।'

বিষ্টুর গায়ে যেন আগুন লাগে কথাটা শুনে। বলে, 'ও তাই সক্কাল থেকে মিষ্টি দেখে তোমার এত ফূর্তি। বলি, ক'বিউনী হল তোর বউ?'

'তা' তোমার এবার লিয়ে পাঁচবার।'

মনে হল বিষ্টু এবার ঘুষি কশাবে ফ্যালার ওই চোখটাতে। ভেংচে বলে, 'আরও চাই?'

ফ্যালার হাসিটা অদৃশ্য হয়ে যায়। ভাল আর কানা দুটো চোখই মেলে ধরে চাপা গলায় বলল, 'তবে আর তোমাকে বলছি কি। পাইখানা-ঘাটা ধাঙড়ার মায়ের পেটের ছেলে যে বাঁচে না। এও জান না। চারটে তো শালা মরেই গেছে।'

বিষ্টু তেমনি ভেংচে খেঁকিয়ে বলে, 'তবে বিষ পুরে দোব খনি, সবশুদ্ধ গায়েব হয়ে যাবে।'

কিন্তু ফ্যালা ডোমের প্রাণ তাতে বাগ মানে না। ওই ভরদুপুরে বেসুরে গলায় গেয়ে ওঠে,

'ভালবেসেছিলুম বলে
মালাটি দিলে গলে
সোহাগ করে কোলে দিলে
নাদাপেটা ছে—লে!'

বিষ্টু আচমকা মুখ চেপে ধরে ফ্যালার। বলে, 'থাম্ শালা, ওই ছাখ।'

দেখা গেল সেই মাদী কুকুরটা একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঠিক মানুষের মত উঁকি মেরে তাদের দেখছে।

দুজনেই একটু দাঁড়াল। ফ্যালা বলল, 'সরে এস, পেছু দিয়ে যাব।'

বলে তারা পেছনে ফিরে একটা বাগানের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগুল। এদিকটা এলাকার শেষ, তাই জায়গাটা গাছে, জঙ্গলে, বাঁশঝাড়ে ছাওয়া গ্রাম্য নিঝুমতায় আচ্ছন্ন।

বাগানের পেছন দিয়ে, খুব ধীরে সেই ঝোপটার কাছে এসেই তারা হতাশ ভরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেই কুকুরটা। কোথায় গেল?

হঠাৎ খড়খড় শব্দে চমকে ফিরে দেখল, বাগানের মাঝখান দিয়ে কুকুরটা ছুটছে। তারাও দুজনে ছুটল। কিন্তু খানিকটা ছুটেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। নিঃশব্দ। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইল। শুধুই হাওয়ার সড়সড়, পাতার মড়মড়। দুজনেই থেমে গেছে।

বিষ্টুর চোখ দুটো আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেই ছোঁয়াটা লেগেছে এবার ফ্যালারও। ঠেলে উঠেছে তার কানা চোখটা। বলল, 'হারামজাদী আমাদের চেয়েও সেয়ানা। চল দেখি ওই বাঁশঝাড়ের দিকে।'

দু'জনেই পা টিপে টিপে বাঁশ বাগানের মাঝখান দিয়ে চলল। খানিকটা গিয়েই

বিষ্টু ফ্যালার হাত ধরে দাঁড়াল। বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাদের ডানদিকের বাঁশঝাড়টা দিয়ে কে যেন যাচ্ছে!'

দু'জনেই কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই।

কিন্তু আবার তারা পা বাড়াতেই প্রতিধ্বনির মত ডান দিক থেকে শব্দ শোনা গেল। তারা থামলেই ওই শব্দটাও থেমে পড়ে। তারা তিন চোখে বোকার মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে। ভূত নাকি? তবে তারা দুজনে কি?

বাঁশ বাগানটা শেষ হওয়ার মুহূর্তেই তাদের চমকে হতাশ ক'রে দেখা গেল কুকুরটা তাদের চোখের সামনে দিয়ে সড়সড় ক'রে মাঠের দিকে ছুটল। তার ছোটার দোলায় যেন ছিটকে পড়ার উপক্রম করল পেটের তলার স্তনগুলি।

এবার দুজনেরই রোখ চেপে গেল। দু'জনেই ছুটল মাঠের দিকে মাথা নিচু করে। দেখল, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে কুকুরটা। ছুটে একেবারে পুবের সড়কটার উপর গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু এরা দু'জনেই মাথা নিচু করে রইল। তবু কুকুরটা উত্তর দিকে হঠাৎ রাস্তার নাবিতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

সূর্য ঢলে পড়েছে। দুপুর শেষ হতে চলেছে। এই নিঝুমতার সুযোগে হাওয়া যেন আরও দুর্বার হয়ে উঠেছে!

হাঁপাচ্ছে বিষ্টু আর ফ্যালা ডোম। ফ্যালা বলল, 'আজ ছেড়েই দেও, কাল হবে।'

বিষ্টু খ্যাপার মত উঠে দাঁড়াল—'না, আজই ওকে নিকেশ করব, চ'পা চালিয়ে।' তারা যখন ছুটতে ছুটতে সড়কে এল, তখন দেখা গেল কুকুরটা রেল লাইন দিয়ে ছুটছে। আরও উত্তর দিকে খানিকটা ছুটে পুবের নাবিতে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বিষ্টু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'যাঃ ইউনিয়নবোর্ডের এলাকায় চলে গেল?'

দুজনেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই মাথা ন্যাড়া তালগাছটার তলায়। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে চলল আবার মাঠ ভেঙে। বিষ্টুর চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে শিকার ফস্‌কানো নিষ্ফল আক্রোশে। ফ্যালার ভাল চোখটা বন্ধ থাকায় ভাবটা ঠিক ঠাওর করা গেল না।

ক্লান্ত পায়ে মাঠ পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে ঠাকুরপাড়া ঘুরে মুচিপাড়ার ঝোপে ছাওয়া সরু গলি দিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

মুচিপাড়ার শেষ সীমানায় বিষ্টু আবার থমকে দাঁড়াল। দেখল এর মধ্যেই ফিরে এসেছে সেই মাদী কুকুরটা। শুয়ে পড়েছে একটা মানকচু গাছের পাতার ছায়ায়। মেলে দিয়েছে ঠ্যাং, ছড়িয়ে দিয়েছে বুক পেট। আর তার পুষ্ট স্তন-গুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কতগুলো নধর তুলতুলে ছোট ছোট বাচ্চা। চকচক্ শব্দে মাই খাচ্ছে, আর আরামে কুঁই কুঁই করছে।

ফ্যালা দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে ডাণ্ডাটা তুলতেই বিষ্টু চেপে ধরল তার হাতটা। ফ্যালা অবাক হয়ে লাঠিটা নামিয়ে নিল।

ক্লান্ত কুকুরটা টেরও পেল না তার দুশমনেরা এসে দাঁড়িয়েছে। দুধের ভারে তার টনটনে স্তন হালকা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাঠাসা বুকে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাওয়া বইছে আর কোথা থেকে একটা বসন্ত পাখি উল্লাসভরে ডাকছে।

বিষ্টুপদর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত বিকট মুখটার সমস্ত আঁকাবাঁকা রেখাগুলো জাদুবলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের ক্ষিপ্ততা কেটে গিয়ে একটা চাপা বেদনায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল দৃষ্টিটা! বারবার তার চোখের সামনে ভাসছে এমনি একটা ছবি। এমনি, তবে সেটা গাছতলা নয়, ঘরের নিরালা কোলে একটা মানুষীর, দুপুরে অথবা মধ্যরাত্রে শুয়ে থাকার ছবি। এমনি, কিন্তু বাচ্চাগুলো মানুষের। এমনি, কিন্তু সে তার শিবি, খেপী নয়, তবু খেপী।

যেন ঘুম না ভাঙে, এমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল বিষ্টু, 'শুধু এই জন্যে জানিস, হারামজাদা ছুটছিল। ছেড়ে দে এবারের মত।' বলে সে খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়াল! আবার মুখটা বিকৃত ক'রে, চোখ কুঁচকে পকেট হাতাতে হাতাতে বিড়্‌বিড়্ ক'রে বলল, 'অল-শালা বাড়ি বোগাস। ফ্যালা!'

ফ্যালা ভাবছিল শালা পাগলা সোনাটরবাবু। বলল, 'বল।'

'চারটে পয়সা দিবি?'

ফ্যালা ট্যাঁক হাতড়ে একটা আনি দিয়ে বলল, 'কেন, ওই হারামজাদীকে দেবে নাকি?'

বলে খ্যালখ্যাল ক'রে হেসে ফেলল। বিষ্টু তখন ভাবছে, এতক্ষণে বোধ হয় মিঠুর লঙ্কার আচারের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। আনিটা নিয়ে রসগোল্লার হাঁড়িটা হাতে দিয়ে বলল, 'যাঃ শালা নিয়ে যা।'

বলে উল্টো দিকে ফিরে হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে গেল। তে-ঢিঙে লম্বা, ভূতের মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে চলেছে সেই মাথা মুড়নো তালগাছটা।

ফ্যালা একবার হাঁড়ি আর একবার সোনাটরবাবুর দিকে ভাল চোখটা বুজিয়ে বলল, 'অল শালা বেলাডি বোকাস।'

বলে হাঁড়ি নিয়ে ডাণ্ডা কাঁধে ফেলে ধাওড়ার দিকে ছুটল।

নিষিদ্ধ ছিদ্র

'শুয়োরের বাচ্চা!' কান্ত কুণ্ডুর হুংকার।

'আজ্ঞে।' বৃন্দাবন—বৃন্দা—বেন্দার জবাবের সুরে অন্যমনস্কতা।

'বান্‌চোত!' কান্ত কুণ্ডুর হুংকারে পূর্ব সম্বোধনের তুলনায় ঝাঁজের মাত্রা তীব্রতর।

'বলেন কত্তা।' বেন্দা ছুটে কাছে এল, পূর্ণ সচেতন স্বর, মুখে কাঁচুমাচু ভাব, কপট ভয়। আসবার আগে স্টেশনারি কাউন্টারে দাঁড়ানো দশ-এগারো বছরের ছেলেটাকে চোখের ইশারা করল।

কান্ত কুণ্ডু বলল, 'ভেড়ার বাচ্ছা, কানে শুনতে পাস না, না? তিন নম্বরের তাক থেকে মিছরির টিনটা ঈশেনকে দে।' কান্ত কুণ্ডু হুসহুস করে ভাজা তামাকের সিগারেটে টান দিল, মুদিখানার কাউন্টারের সামনে ধু'ত পাঞ্জাবি পরা পৌঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'লোকে এসব জানে না। চিনি দিয়ে পায়েস খায়। আরে শীতের সময় পায়েস খেতে হলে নলেন গুড়ের পায়েস খাবে, নয় তো অন্য সময় মিছরি দিয়ে। মিছরি হল ঠাণ্ডা জিনিস। মিছরির পায়েসে পেট ঠাণ্ডা থাকে। আমি রোজ পায়েস খাই, মিছরির পায়েস। হ্যাঁ, আপনার কী চাই? দালদা? নেই।…তুমি কি চাইলে? ভেলি গুড়?'

কান্ত কুণ্ডু ক্যাশ বাকসের সামনে শীতলপাটি পাতা গদীতে বসে এক-একজন খরিদ্দারকে জিজ্ঞেস করছে, কর্মচারীদের সওদা মেপে দিতে বলছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী হল ঈশেন? দেড় কে. জি. মিছরি ওজন করতে কতোক্ষণ লাগে? ভেলি গুড় কতোটা? পাঁচ কে. জি? আচ্ছা। এই—এই ভোঁদড়ের বাচ্চা!'

বেন্দা স্টেশনারি কাউন্টারে দাঁড়ানো নেই ছেলেটার সঙ্গে তখন কথা বলছিল, 'পটলা? যে পটলা রোজ এখান থেকে চারটে লজেন্স কেনে? ও গোল দিল? ওর পায়ের ডিম খুব শক্ত, না?'

ছেলেটি বলছিল, 'হাঁ, ও রোজ নাকি কচ্ছপের মাংস খায়। আমাকে একটা ছ-পয়সার টফি দে।'

বেন্দা বলছিল, 'দিচ্ছি। আচ্ছা, ইস্কুলের মাঠে বিকালে রোজ খেলা হয়?' এই জিজ্ঞাসার সময়েই, 'ভোঁদরের বাচ্ছা' ডাক শুনে ও জবাব দিল, 'বাবু।'

'গুখেগোর ব্যাটা, এদিকে আয়, ভেলি গুড়ের টিনটা এক নম্বরের তাক থেকে ঈশেনকে দে।' কান্ত কুণ্ডু হুকুম করল।

বেন্দা কাউন্টারের সামনে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারায় দাঁড়াতে বলে

মাল ঠাসা তাকের দিকে ছুটে গেল। ওর বয়স বারো। খালি গা, হাফ প্যাণ্ট পরা। গায়ে ময়লা থাকলেও, আশ্চর্য রকমের ফরসা, গোরাচাঁদ বললেই হয়। আরো আশ্চর্য, ও মোটেই হাড় জিরজিরে রোগা না। একটু যেন থলথলে নরম শরীর। খোঁচা খোঁচা পাঁশুটে চুল, চোখ ছুটো প্রায় গোল। নাকটা বড়ির মতো। ময়লা দাঁত বের করে হাসলে, চোখ ছুটো বুজে যায়। অথচ দাঁতগুলো সবই নতুন। এক নম্বর তাক থেকে প্রায় কুড়ি কে. জি. ওজনের ভেলি গুড়ের টিনটা দাঁতে দাঁত চেপে তুলল। তুলে ধরতে পারল না, মেঝের ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঈশেনের কাছে, পাল্লার সামনে রাখল। ঈশেন বেন্দার পশ্চাদ্দেশে একটি চিমটি কাটল। বেন্দা পাছায় হাত ঘষে, স্টেশনারি কাউণ্টারে গিয়ে টফির বোয়েম থেকে রঙিন কাগজে মোড়া একটা টফি বের করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিল। ছেলেটি একটি পাঁচ, আর একটি এক পয়সা বেন্দার হাতে দিল। বলল, 'তুই কলেজের মাঠে খেলা দেখতে আসতে পারিস না?'

বেন্দা বলল, 'ছুটি পাই না।'

ছেলেটা বলল, 'কেন, বেস্পতিবার তো দোকান বন্ধ থাকে।'

বেন্দা বলল, 'বেস্পতিবার কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মার কাছে যাই। যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গেলে মা রাগ করে, 'আর বাবুও প্যাদায়।' বলে কান্ত কুণ্ডুকে চোখের ইশারায় দেখাল।

ছেলেটা মোড়ক ছাড়িয়ে টফি মুখে দিয়ে বলল, 'মার কাছে তোর যেতে ইচ্ছে করে না কেন?'

বেন্দা মুখ বিকৃত করে বলল, 'মায়ের লোকটাকে আমার ভাল্ লাগে না। আমাকে খুব খাটায়, আর খিস্তি দেয়।'

ছেলেটা অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মায়ের লোকটা কে? তোর বাবা না?'

বেন্দা বলল, 'আমার বাপ তো কবেই পটল তুলেছে। এখন মায়ের একটা লোক আছে। আর মায়ের অনেক ছেলেমেয়ে। আমার ভাল্ লাগে না। একটা বেস্পতিবার আমি কাট মারব, মেরে খেলা দেখতে যাব।'

ছেলেটা নির্ভেজাল অবুঝ বিস্ময়ে বেন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। বেন্দা আবার বলল, 'আমার খুব খেলতে ইচ্ছা করে। ফুটবল। এয়সা গেদে শট মারতে ইচ্ছা করে যে বল ফাটিয়ে দিই।'

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোনো খেলা করিস না?'

বেন্দা ঘাড় কাত করে, চোখ ঝলকিয়ে বলল, 'খেলি, রোজ রাত্রে ইঁদুর মারা খেলি।' বলতে বলতে ওর মুখে কঠিন খুশি ঝলক দিল, 'আমি তো রাত্তিরে দোকানের পেছনকার ঘরে থাকি। ঘর অন্ধকার করে ইঁদুর মারা খেলি। আমি অন্ধকারে দেখতে পাই—'

'এই কুত্তার বাচ্চা!' কান্ত কুণ্ডুর হুংকার শোনা গেল, 'খইলের বস্তা থেকে

ঠোঙায় করে পাঁচ কে. জি. থইল ভরে দে।'

বেন্দা বলল, 'যাই বাবু।' যাবার আগে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারা করে গেল।

কান্ত কুণ্ডু নরম স্বর চড়িয়ে বলল, 'গোপাল, তুমি কী কর, বান্‌চোতটা খালি গল্প করে।'

স্টেশনারি কাউন্টারের এক পাশে, প্রৌঢ় স্বাস্থ্যহীন গোপাল একটি টুলে বসে ঝিমুচ্ছিল। সে কান্তর আগের পক্ষের শালা। স্টেশনারি বিভাগ সে দেখাশোনা করে। সে কান্তর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ছেলেটিকে বলল, 'তোমার কী চাই খোকা?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। গোপাল বলল, 'তা হলে এখন চলে যাও, ও কাকের বাচ্ছাটা খালি গল্প মারে।'

এই সময়ে একজন খরিদ্দার এসে টুথপেস্ট চাইল। ছেলেটা দাঁড়িয়েই থাকল। বেন্দা ঠোঙায় থইল ভরে, ঈশেনের কাছে এগিয়ে দিল। দিয়ে আবার স্টেশনারি কাউটারে এল। গোপাল তখন আলমারি খুলে খরিদ্দারকে টুথপেস্ট দিচ্ছে। ও সব কাজ বেন্দার না। তেল সাবান টুথপেস্ট স্নো পাউডার হিমানী খাতা কাগজ কলম পেনসিল, এ সবে ওর হাত দেবার হুকুম নেই। ও কেবল লজেন্স আর চানাচুর দিতে পারে। আর গোটা দোকানের ফাইফরমাস খাটে। ও সামনে আসতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তোকে কেউ নাম ধরে ডাকে না কেন?'

বেন্দা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলল, 'তোকে সবাই শুয়োরের বাচ্ছা নয়তো কাকের বাচ্ছা, এসব বলে কেন?'

বেন্দা হেসে নিচু স্বরে বলল, 'ওহ্! ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্ছা।'

'বাঁদরের বাচ্ছা—' হঠাৎ আবার কান্ত কুণ্ডুর হুংকার, 'ঠোঙায় আড়াইশো সরষে দে।'

'এই যে বাবু।' বেন্দা ছুটে চলে গেল।

কান্ত কুণ্ডুর জমজমাট দোকান। স্টেশনারি, মুদিখানা। পাশেই র‍্যাশনশপ। র‍্যাশনশপের দায়িত্বভার এ পক্ষের শালার ওপর। হিসাবনিকাশ সলাপরামর্শ সব কান্তর সঙ্গেই। কান্ত সব কিছুর মালিক। বেন্দা তার সব থেকে অল্প বয়সের কর্মচারী। খাওয়া-পরা পায়, মাইনে কুড়ি টাকা ওর মা এসে মাসে মাসে নিয়ে যায়। খেতে যায় কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে। তার আগে রাস্তার কলে চান করে যায়। কান্তর প্রথম বউ মরেছে। ছেলেপিলে ছিল না। এ পক্ষে বিয়ে করেছে চার বছর। ছেলেপিলে হয় নি। এ বউটার বয়স কম, দেখতে সুন্দরী। নিজের বিধবা মাসীকে হেঁশেলে রেখেছে। সে বেন্দাকে বলে বোঁটকা পাটা। ওর গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ। কান্তর বউ বলে ওল কচু।

ওর মুখটা নাকি ওল কচুর মতো দেখতে। ওর নিজের মা বলে, 'ধ্যাংরামুখো, ঘেঁড়ো, ড্যাক্‌রা, মড়া ভাতারের ছা'...।' বাদ বাকি উচ্চারণের যোগ্য না। উচ্চারণের যোগ্য না, এমন অনেক বিশেষণ কান্তর আছে।

বেন্দার তাতে কিছুই যায় আসে না। ও সবাইকে মনে মনে ইঁদুর বলে, বা ইঁদুরের বাচ্চা। কান্তর মাসী-শাশুড়িটা খেতে কম দেয়। তবু ওর কিছু যায় আসে না। জীবনে একটি মাত্র উত্তেজনা নিয়ে ও বেঁচে আছে। একটি মাত্র কারণে। ইঁদুর মারা খেলা। এই খেলার সঙ্গে আছে উত্তেজনাময় বাজী। জুয়ার মতো। এক নেংটি ইঁদুরে পাঁচ পয়সা। একটা ধাড়ি ইঁদুরের জন্য দশ পয়সা। কান্ত কুণ্ডু দেয়।...

রাত্রি সাড়ে ন-টা। বেন্দা খেয়ে এল। কান্ত কুণ্ডু এ পক্ষের শালার সঙ্গে বসে, হিসাবপত্র শেষ করে, চাবির গোছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দোকানের সামনের দরজা আগেই বন্ধ হয়েছে। দোকানের পিছনে একটি খালি গুদামঘর আছে। বেন্দা রাত্রে সেই ঘরে থাকে। সেই ঘরের পিছনে যাবার একটি দরজা আছে। দরজার বাইরে তিন ফুট চওড়া লম্বা ফালি, তার পশ্চিম সীমান্তে খাটা পায়খানা। ফালি জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গাঁথা, তার ওপরে তিন প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া। দোকানঘর থেকে গুদামঘরে ঢোকার একটিমাত্র দরজা। বেন্দাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কান্ত কুণ্ডু চারটে তালায় চাবি দিল। তারপরে বাইরের দরজা, তার ওপরে কোলাপসিবল গেট টেনে, এক ডজন তালা মেরে চলে গেল। ব্যবস্থা সব পাকা।

বেন্দা এখন গুদামঘরে একলা। মোমবাতি আর দেশলাই এক জায়গায় রাখা থাকে। এ ঘরে বিজলিবাতি আছে, তার সুইচ দোকান ঘরে। রাত্রে নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেন্দাকে আলোর প্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালাতে হয়। ও অন্ধকারে এগিয়ে গেল একটা পিপের কাছে। হাত বাড়াল পিপের ওপরে অব্যর্থ জায়গায়। দেশলাই হাতে নিয়ে, কাঠি জ্বালিয়ে, পিপের ওপরে দাঁড় করানো সরু মোমবাতি জ্বালল। দুই বস্তা ভুষির ফাঁক থেকে টেনে বের করল কাঁথা আর তেলচিটে বালিশ। ভুষির বস্তার ওপরে তা পাতল। একটা বালির ছোট কৌটো বের করল ছোলার বস্তার আড়াল থেকে। খুলে দেখল তিনটি বিড়ি আছে। একটি বিড়ি নিয়ে, কৌটো যথাস্থানে রেখে, মোমবাতির শিষে বিড়ি ধরাল। তারপর গুদামঘরটার চারদিকে দেখল।

সরু মোমবাতির আলোয় লম্বা ফালি গুদামঘরের সবটা দেখা যায় না। রক্তিম আলোর গায়ে বস্তা টিন পিপে, নানা কিছুর ফাঁকে ফাঁকে খামচা খামচা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আর লাল আলোয় ওর ছায়াটা বিরাট, যার অবয়বটা অমানুষিক। বেন্দা বিড়ি টানতে টানতে, পাঁচিলের দিকের দরজাটা খুলল। প্যান্ট তুলে প্রস্রাব করল। পাঁচিলের ওপাশে বাজার। ও প্রস্রাব করে দরজা

বন্ধ করে আবার পিপের কাছে ফিরে এল। স্থির অপলক চোখে চারিদিকে দেখতে লাগল। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নাক মুখ দিয়ে। ওর মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠছে, চোখ জ্বলতে আরম্ভ করেছে। ভিতরে বাইরে, যে-কোন শব্দ ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। সারাদিনের কাজের মধ্যে ওর এই চেহারা দেখা যায় না। ও যেন কোন মন্ত্রের সাধনে শরীরে শক্তি সঞ্চার করছে, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে চোখে মুখে। বিড়ি টানতে লাগল, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল, ওর নরম থলথলে-শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। মুখে ফুটে উঠতে লাগল একটা কঠিন হিংস্রতা। গুদামের কোথায় খুট করে একটা শব্দ হল। ও মুখ ফেরাল না, চোখের পাতা নামিয়ে ঘাড় কাত করে উৎকীর্ণ হয়ে শুনল।

বিড়ি টানা শেষ হল। বিড়ির অঙ্গারটা একবার চোখের সামনে তুলে দেখল, তারপর অনায়াসেই অঙ্গার দুই আঙুলে টিপে নিভিয়ে বিড়িটা ফেলে দিল। পিপের পেছনে হাত বাড়িয়ে বের করে নিয়ে এল একটা বাঁশের লাঠি। তেল চকচকে, এক দিক মুগুর মতো মোটা। লাঠিটা তুলে একবার চোখের সামনে দেখল। তারপর সরু দিকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। মুখ ফিরিয়ে মোমবাতির শিষটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঝুপ করে নামল একটা ভারি পর্দার মতো। বেন্দা পিপের কাছ থেকে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে হেঁটে কয়েক পা গিয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়াল।

বেন্দার পৃথিবীও এখন নিশ্চল। জগৎসংসার অন্ধকার, মানুষ নামক জীবদের অস্তিত্বহীন। সময় থমকিয়ে আছে।

বেন্দা দেখতে পেল, দুটি ছোট লাল অঙ্গারের বিন্দু। দেখা দিয়েই তারা একদিকে ছুটে চলে গেল। বেন্দা স্থির। আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওপরের চালের কাছে ফুটে উঠেই, দ্রুত নিচের দিকে অন্ধকারে মিশে গেল। বেন্দা নিশ্চল। চারটি অঙ্গারবিন্দু ওর কয়েক হাত দূর দিয়ে এপার ওপার চলে গেল। বেন্দা পাথরের মূর্তি। দুটি অঙ্গারবিন্দু ঝটিতি এগিয়ে এল, মুহূর্তেই থমকিয়ে পিছনে হারিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওর বাঁ পাশ থেকে, পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, চকিতেই পায়ের পাশ দিয়ে ডান দিকে চলে গেল।

এইরকম জোড়া জোড়া অঙ্গারবিন্দুরা, ওপরে নিচে, দূরে সামনে, ছুটে ছিটকে বেড়াতে লাগল। তারপরে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সম্মোহিতের মতো, কতগুলো অঙ্গারবিন্দু ওর সামনে এসে লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাতের মুঠি শক্ত হল, লাঠি উঠল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত লাঠি প্রচণ্ড আঘাতে উঠল, থামল। ও লাফিয়ে দাপিয়ে লাঠির মোটা মুণ্ডু দিয়ে পেটাতে লাগল। তারপরেই আর একপাশে সরে গিয়ে আবার পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াল। পৃথিবীও আবার থমকিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল।

সময়ের কোনো হিসাব নেই, অন্ধকারের গাঢ়তার কোনো মাপজোখ নেই। আবার জোড়া জোড়া অঙ্গারবিন্দু ওপরে নিচে মেঝেয় বস্তায় পিপেয় জেগে উঠতে লাগল। ছুটে ছিটকে ঘুরে ফিরে আবার সম্মোহিতের মতো বেন্দার কাছাকাছি কতগুলো অঙ্গারবিন্দু লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাত আবার উঠল, আর প্রতিটি আঘাত যেন বিদ্যুচ্চকিতের মতো পড়তে লাগল। তারপর পিপের কাছে সরে এসে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরালো। মোমবাতির আলো আস্তে আস্তে অন্ধকারে ঠেলে ঠেলে সরালো। বেন্দা এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল তিনটে নেংটি একটা ধাড়ি ইঁদুরের মৃতদেহ। তুলে রাখল পিপের ওপরে মোমবাতির কাছে। চকচকে চোখে তাকিয়ে দেখল। ওর উত্তেজিত মুখে হিংস্র হাসি। গায়ে মুখে ঘাম চিকচিক করছে। মাথার চুলগুলো কপালে গালে ছড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'শালা, ইঁদুরের বাচ্ছা ইঁদুর!'...লাঠিটা পিপের পিছনে রাখল। ফুঁ দিয়ে নেভাল মোমবাতি। অন্ধকারে অব্যর্থ ভুষির বস্তার ওপরে পাতা কাঁথার ওপরে গিয়ে, চিটে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

সারাদিন নামহীন জীবনের দুর্জয় পরিশ্রমের পরে, অনেক অপমান আর অপূর্ণ খাওয়ার পরে, এই এক সুখের খেলা। এতো সুখ, গভীর ঘুম আসতে দেরি হয় না। এই সুখ আর আরাম ভোর পর্যন্ত। তারপরে আবার শুরু আর একটা অভিশপ্ত দিনের। রাত্রি ন-টার পরে আবার সেই খেলা, খেলার উত্তেজনা আর সুখ, তারপরে গভীর নিদ্রার আরাম।

বৃন্দার ভাববার অবকাশ নেই, কোন্ অজ্ঞাত শক্তির হাতে, ওর এই দিন ও রাত্রের জীবন নির্ধারিত আর পরিচালিত হয়। এই জীবনের শেষ কোথায়, ওর জানা নেই। এই জীবনযাপনের শরীরে কতগুলো ছিদ্র ক্ষণেকের জন্য ফেটে বেরোয়। সেই সব ছিদ্রে ভেসে ওঠে খেলার মাঠে খেলার ছবি। অনেক কিশোরের উল্লাসের ধ্বনি। সেই সব ছবি আর শব্দ থাকে নিষেধের গণ্ডীতে। ছিদ্রগুলো নিষিদ্ধ।

পেলে লেগে যা

'হেই শালা আরশোলার বাচ্চা!' কান্ত কুণ্ডুর ক্রুদ্ধ হুংকার বা গর্জন না, চিৎকারের হাঁক শোনা গেল। হাঁকের মধ্যে হুকুমের থেকে, এক ধরনের মত্ততার ঝাঁজ বেশি। বৃন্দাবন-বৃন্দা-বেন্দার পক্ষে এই চিৎকারের হাঁকই যথেষ্ট। কিন্তু ও শুনতে পেল না। ওর দশ বছর বয়স থেকে, দশ-এগারো-বারো তিন বছরের জীবনে এরকম একটা ঘটনা এই প্রথম। দশ বছরে পড়তেই কান্ত কুণ্ডুর মস্ত দোকানে ও কাজে এসেছিল। এখন বারো পার হব হব করছে। এই তিন বছরের মধ্যে এমন একদিনও হয়নি, কান্ত কুণ্ডুর নামহীন ডাক ও শুনতে পায়নি। কান্ত কুণ্ডু কখনোই ওর নাম ধরে ডাকে না। দরকারও হয় না। হয়তো বেন্দাকে সে মানুষের বাচ্চা বলে মনে করে না, বা কখনো তা ভাববার অবকাশ হয়নি। সে, বা তার দুই শালা যাদের একজন দোকানের স্টেশনারি বিভাগ, আর একজন পাশের র‍্যাশন শপের দায়িত্বে আছে, তারা এবং বাড়িতে তার দ্বিতীয় পক্ষের বড়, আর হেঁশেল ঠেলে যে মাসী, কেউ-ই ওর নাম ধরে ডাকে না। ডাকলে, সেটা ওর আশ্চর্যের ব্যাপার হত। এমন কি ওর মা-ও ওর নাম ধরে ডাকলে, হয়তো ওর পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব হত না। ওর অনভ্যস্ত কান নিশ্চয়ই ভুল করত। বা ভুল শুনেছে ভেবেই নির্বিকারভাবে চুপ করে থাকত।

কান্ত কুণ্ডুর এখন এই চিৎকারের হাঁক না শোনাটাও, আরো আশ্চর্য আর অস্বাভাবিক ব্যাপার। বেন্দা ডাক শুনতে পেল না, বরং বেশ খানিকটা উঁচুতে শূন্যে লাফিয়ে উঠেও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'পেলে লেগে যা!'

'পেলে লেগে যা'। কতগুলো অসম স্বর মত্ত চিৎকারে প্রতিধ্বনি করলো।

কথাগুলোর অর্থ কী, বেন্দা জানে না। অথচ একটা উল্লাস আর উত্তেজনা বোধ করছে। কথাগুলো ও কান তৈরি হবার পর থেকেই শুনে আসছে। আজও শুনেছে। যাদের মুখ থেকে, শুনেছে, তাদের স্বরেও উল্লাস-উত্তেজনা। এমনই এক আশ্চর্য কথা, উল্লাস আর উত্তেজনার মধ্যে একটা মত্ততাও থাকে— যা আছে এখন বেন্দার গলা ফাটানো চিৎকারেও। এতকাল শুনেই এসেছে, এরকমভাবে কখনো বলেনি। কথাটার অর্থ আগে জানত না, এখনো জানে না। কথাটার পিছনে যেন অনেক অবাক মজা আর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। আর সেই জন্যই, কথাগুলো যতবার চিৎকার করে বলল, তারপরে প্রত্যেকবারই কেউ যেন ওর ভিতর থেকে অবাক নিচু স্বরে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'পেলে লেগে যা'! তারপরেই হঠাৎ হাহা করে হেসে উঠতে লাগল। আবার হাত পা ছুঁড়ে নেচে চিৎকার করে সেই একই ধ্বনি করতে লাগল কিন্তু কান্ত কুণ্ডুর ডাক ও শুনতে পেল না।

এখন অবিশ্যি দোকান খোলা নেই। বেন্দা দোকানের বাইরে, খানিকটা দূরে রাস্তার ওপরে, একটু আগে এসে হাজির হয়েছে। আশেপাশের দোকানে বা বাজারে কাজ করে, এরকম আরো কয়েকজন ওর সঙ্গে ছিল। যারা সকলেই ওর থেকে বয়সে কিছু বড়। তারাও সবাই বোকার মতোই হাত পা ছুঁড়ে নাচছে, আর উত্তেজিত উল্লাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনি করছে. 'পেলে লেগে যা'।

আজকের দিনটা সকাল থেকেই অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। আজ দুর্গা পূজার দশমী। এখন পুরোপুরি বিজয়াদশমীর উৎসবের আবহাওয়া। রাত্রি প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। কিন্তু এখনো রাস্তায় বেশ ভিড়। কল-কারখানা, বিশেষ করে চটকল আজ ছুটি। অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ, কেবল মিষ্টির দোকান ছাড়া। এখন এই ভিড় উৎসবের, কেনাবেচা নেই। কান্ত কুণ্ডু ওর মুদিখানা স্টেশনারি র‍্যাশনশপের সামনে রাস্তার ধারে বেঞ্চি পেতে বসে আছে। তার দুই পাশে দুই শালা। প্রথম পক্ষের বউ মারা গিয়েছে, কোনো ছেলেপিলে হয়নি। দ্বিতীয় পক্ষের বউটির বয়স অল্প, সুন্দরী। চার বছরে কোনো ছেলেপিলে হয়নি। আগের পক্ষের শালা, স্টেশনারি বিভাগ দেখা শোনা করে। দ্বিতীয় পক্ষের শালা র‍্যাশনশপ চালায়। কান্ত কুণ্ডু নিজে তার বাবার আদি ব্যবসা মুদিখানায় বসে। সকলের মাথার ওপরে সে। তার কর্মচারীদের মধ্যে সব থেকে বয়সে ছোট বেন্দা।

মিষ্টির দোকান, আর মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছাড়া সবই বন্ধ। কান্ত কুণ্ডুর পাশাপাশি দোকানগুলোও বন্ধ। মুদিখানা আর স্টেশনারি, একই লম্বা ঘরের দুই প্রান্তে। র‍্যাশন শপটা আলাদা। বেন্দার কাজ মুদিখানা আর স্টেশনারিতে। স্টেশনারি বিভাগের টফি লজেন্স আর চানাচুর বোয়েম থেকে বের করে ও বিক্রি করতে পারে। আর কিছু না। মুদিখানার ওজনদারের কাছে বিভিন্ন মালের বস্তা বা টিন এগিয়ে দেওয়া একটি বড় কাজ। অনেক দিনের পুরনো আর ব্যস্ত দোকান।

বেন্দা সব থেকে খুশি হয়, যখন ওর বয়সী কোনো ছেলে টফি লজেন্স চানাচুর নিতে আসে। ও তাদের কাছ থেকে জেনে নেয় ইস্কুলের বা শহরের মাঠে কবে কোন্ দিন কী খেলা হয়। স্পোর্টসের প্রস্তুতি কেমন চলছে। ওর কাছে সেই সংবাদগুলো অনেকটা স্বপ্নের মতো। অথচ মাঠে গিয়ে খেলা দূরের কথা, খেলা দেখতে যাবারও সময় নেই। কেবল কল্পনাই করতে পারে, যার ফলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কাজের কথা ভুলে যায়। তখন কান্ত কুণ্ডু ওকে চিৎকার করে ডাকে, 'এই শুয়োরের বাচ্চা' কিংবা 'কুত্তার বাচ্চা', আর তা শুনেই ও সচকিত হয়ে ওঠে। কারণ ও জানে, এই সব নামেই ওকে ডাকা হয়ে থাকে। স্টেশনারি বিভাগে, কান্ত কুণ্ডুর আগের পক্ষে শালা ওকে 'কাকের বাচ্চা' বা 'ফড়িং-এর বাচ্চা' ইত্যাদি বলে ডাকে। লোকটা প্রায় সময়েই বসে

বসে ঝিমোয় আর পাখি পতঙ্গের বাচ্চা বলে ডাকে। কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে ও খেতে যায় দু বেলা। সেখানে কান্ত কুণ্ডুর বউ তাকে 'ওল কচু' বলে ডাকে। ওর মুখটা নাকি সেইরকম। আর হেঁশেলে থাকে, খেতে দেয় যে-মাসী, সে বলে 'বোঁটকা পাঁটা'। ওর গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ।

বেন্দার বয়সী কোনো খরিদ্দার বালক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে এরা কেউ তোকে নাম ধরে ডাকে না কেন?' বেন্দা হেসে জবাব দেয়, 'ওহ্, ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্চা।'

তথাপি মানতেই হবে, বেন্দার তিন বছরের জীবনে, এরকম ঘটনা এই প্রথম, ও কান্ত কুণ্ডুর ডাক শুনতে পেল না। সকাল থেকেই আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। কাটছে একেবারে অন্যভাবে। গত দু বছরে এই দিনটাতে, কাঁচরাপাড়ার কলোনিতে ওকে ওর মায়ের কাছে যেতে হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন বেস্পতিবার আর বছরে চৈত্রসংক্রান্তি আর বিজয়াদশমীর দিন কাঁচরাপাড়ার কলোনিতে মায়ের কাছে ওকে যেতেই হত। ওর মাসের মাইনেটা মা এসে নিয়ে যেত। তাতেও ওর কিছু আসত যেত না। কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়াটা, ওর কাছে নরকে যাবার থেকেও খারাপ ছিল! ওর বাবা অনেক দিন আগেই মরে গিয়েছে। এখন ওর মা অন্য একটি লোকের সঙ্গে থাকে! প্রত্যেক বছরই মায়ের একটা করে ছেলে মেয়ে হয়। ওর মা আর লোকটা ওকে খুব খাটিয়ে মারে। ওর মা ওকে, 'খ্যাংরামুখো, বেঁড়ো, মড়া ভাতারের ছাঁ' ইত্যাদি বলে ডাকে।

কিন্তু তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম, আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। বেন্দা এই ব্যতিক্রমে খুশিই হয়েছিল। কান্ত কুণ্ডুর আগের পক্ষের শালা গোপাল, দোকানের তালা খুলে বেন্দাকে বের করেছিল। মুদিখানা আর স্টেশনারি দোকানের পেছনে, দেওয়াল দিয়ে আড়াল করা, তিন ফুট চওড়া, লম্বা ফালি একটা গুদামঘর আছে। দোকান থেকে গুদামঘরে যাবার একটি মাত্র দরজায় তালা মারা থাকে। গুদামের পিছনে একফালি লম্বা জায়গা, তার পশ্চিম প্রান্তে একটা খাটা পায়খানা। পায়খানায় যাবার জন্য গুদামঘরে একটি দরজা আছে। বেন্দা রাত্রে কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে খেয়ে এসে, সেই গুদামঘরে শোয়।

আজ সকালে গোপাল দোকানের সামনের দরজাগুলোর তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গুদামঘরের দরজার তালা খুলেছিল। বেন্দা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ও জানত, ওকে যেতে হবে কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মায়ের কাছে। কান্ত কুণ্ডুর দেওয়া নতুন হাফপ্যাণ্ট আর ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে ও তৈরি ছিল। গতকাল রাত্রে খেয়ে ফেরার পথে, প্রতিমার দেখবার জন্য ওর আধ ঘণ্টা ছুটি ছিল। ফিরে এসে, গুদামঘরের অন্ধকারে ও মাত্র দুটো নেংটি ইঁদুর মারতে পেরেছিল। একটা নেংটি ইঁদুরের রেট পাঁচ পয়সা, একটা ধাড়ি ইঁদুর দশ পয়সা। কান্ত কুণ্ডু ওকে দেয়।

বেন্দা মাঠে ঘাটে খেলতে যেতে পারে না। এই একটি মাত্র খেলাই ওর জীবনে ছিল। সারা দিন পরে, গুদামঘরের অন্ধকারে জোড়া জোড়া লাল বিন্দু জ্বলে ওঠে। একটা বিড়ি খাবার পরে ও লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। ওর শরীরে জেগে ওঠে একটা আশ্চর্য শক্তি। যেন মন্ত্রের সাধনে শক্ত-হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। আর জোড়া জোড়া অঙ্গারের বিন্দুগুলো, কাছে দূরে উঁচুতে নিচুতে ছোটাছুটি করতে করতে, যেন সম্মোহিতের মতো ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। সাপের ফণার থেকেও ভয়ংকর উদ্যত হয়ে ওঠে ওর লাঠি। বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে জোড়া জোড়া লাল অঙ্গার বিন্দুগুলোর ওপর। কয়েক বার এই খেলার পরে, মোমবাতি জ্বালিয়ে ও খেলার ফলাফলগুলো লম্বা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নেয়। ক'টা নেংটি, কটা ধাড়ি। তারপরেই কয়েকটা বস্তার ওপরে ও শুয়ে পড়ে। নামহীন জীবনের সারাদিনের প্রচণ্ড খাটুনি আর পেটপুরে না খেতে পাওয়ার মধ্যে, এই একটি মাত্র খেলা, যেন গভীর সুখের আর একমাত্র জীবনধারণের জন্য।

আজ সকালবেলা গোপাল গুদামঘরের দরজা খুলে বেন্দার দিকে তাকিয়ে, কালো ঠোঁট ছুঁচলো করে হেসেছিল। নিশ্চয় নতুন ঢলঢলে সস্তা জামা প্যাণ্ট দেখেই হেসেছিল। বেন্দার চাকরির এটাও একটা সর্ত, বছরে একটি জামা আর প্যাণ্ট। গোপাল বলেছিল, 'গুয়ো শালিকের বাচ্চা! সাজগোজ করে বসে আছিস?'

বেন্দার জবাব দেবার কিছু ছিল না। ও দোকানের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। আজ দোকান বন্ধ। গোপাল জিজ্ঞেস করেছিল, 'যাচ্ছিস কোথায় রে উচ্চিংড়ের বাচ্চা?'

'কাঁচরাপাড়া' বেন্দা জবাব দিয়েছিল।

গোপাল বলেছিল, 'উঁহু। আজ তোকে কর্তা তার বাড়িতে যেতে বলেছে। দশেরার দিন, মেলাই কাজ। কাজের লোকের অভাব।'

অথচ কান্ত কুণ্ডুরই কড়া হুকুম, ছুটির দিনে বাড়িতে মায়ের কাছে যেতে হবে। বেন্দা যাতে কোনোরকমেই এদিকে ওদিকে যেতে না পারে সেইরকম ব্যবস্থা ওর মা-ই করে রেখেছিল মনিবের সঙ্গে। সকালে গোপালের কথা শুনে ও খুশি হয়ে উঠেছিল। আজকের এই দিনটিতে মায়ের কাছে ছাড়া যে কোনো জায়গাতেই যেতে হোক, ও তাতেই খুশি। বলতে গেলে ও তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে ছুটেছিল।

কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে আজ অনেক কাজ। নারকেল দিয়ে নিরামিষ ঘুগনি, নারকেলের ছাঁচ তৈরি হয়েছিল। রোজকার রান্নাবান্না তো ছিলই। কলাপাতা কাটা, মাটির ভাঁড় ধোয়া ছিল। দুপুরের খাবার পেতে বেলা তিনটা বেজেছিল। কিন্তু তারপর থেকে বলতে গেলে কোনো কাজই করতে হয়নি। একটানা সন্ধে পর্যন্ত ছুটি পাওয়া গিয়েছিল। কাঁচরাপাড়ায় গেলে এ ছুটি কখনোই পাওয়া যেত না। মায়ের আর তার লোকটার ফাইফরমাস খাটতে হত।

মায়ের ছেলেমেয়েগুলোকে কোলে কাঁখে করে রাখতে হত। তার বদলে পূজা-মণ্ডপে যেতে পেরেছিল। ঢাকের বাদ্যির তালে তালে নাচতে পেরেছিল, আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পেরেছিল, 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন।' তারপর ভাসানের সময় সেই ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, 'পেলে লেগে যা।'

কোনো সন্দেহ নেই আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। বেন্দা ওর জীবনে এই প্রথম একটা ভাসানের দলের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে অনেক দূর গিয়েছিল। অনেক ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় ওকে কান্ত কুণ্ডুর বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল। সেখানে ওর অনেক কাজ ছিল। যদিও সত্যি কাজ তেমন ছিল না। বাড়িতে তখন নমস্কার আর কোলাকুলির ব্যস্ততা। তার মধ্যেই উটকো ফাইফরমায়েস। কারোকে এক ভাঁড় জল দেওয়া কারোর জন্য কলাপাতা এনে দেওয়া।

বেন্দার খুব ভালো লেগেছিল। হাসি খুশি উৎসবে মুখর ছিল মনিবের বাড়ি। সবাই সিদ্ধি খেয়েছিল। বেন্দাকে দেওয়া হয়েছিল। একবার নয় কয়েকবার। কান্ত কুণ্ডুর এই পক্ষের ভায়রাভাই নিজে ভাঙ তৈরি করে সবাইকে খাইয়েছিল। বেন্দাকে খাওয়াতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। আর লোকটা তাকে নাম ধরেই ডেকেছিল। এ সবই অভাবিত আর বিস্ময়কর! মনিবের ভায়রাভাই ওকে নাম ধরে ডেকেছিল। ওর খেয়ালই ছিল না, কখন থেকে ও মেতে উঠে বারে বারে চিৎকার করেছিল, 'পেলে লেগে যা।'

ওর কথা শুনে সবাই হেসেছিল। আর ও কান্ত কুণ্ডুর বউ থেকে শুরু করে বড়দের সবাইকে বারে বারে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করেছিল। ওর নমস্কারের ঘটা দেখে কেউ ওর চুল ধরে টেনে দিয়েছিল, ঘাড়ে মাথায় চাটি লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা মারবার বা পীড়নের উদ্দেশ্যে নয়। এবং সবাই খুব হেসেছিল। সবাই ওকে নিয়ে মজা পেয়ে গিয়েছিল। এমনকি, যাকে রাণীর মতো সবাই খাতির করছিল, সেই কান্ত কুণ্ডুর বউ পর্যন্ত ওর মুখে মিষ্টি আর ঘুগনি গুঁজে দিয়েছিল। এরকম ঘটনার কথা ও কল্পনা করতে পারে না। আজকের দিনটাই অন্যভাবে শুরু হয়েছিল।

আজ কান্ত কুণ্ডুর হেঁশেলের মাসীও বেন্দাকে নিয়ে মজা করেছিল। ভাঙের নেশার ঝোঁকেই ও বারে বারে ভাত চেয়েছিল। মাসীও দিয়েছিল। আর ও মাসীর পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠেছিল, 'পেলে লেগে যা'। সারা গায়ে খাবার মাখিয়ে ও যত হাত পা ছুঁড়ে নাচছিল, সবাই ওকে তত ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বলির মহিষ বৎসকে মদ খাইয়ে, অণ্ডকোষে খোঁচা দিয়ে যেমন ক্ষেপিয়ে তোলা হয় ওকেও সেইরকমই নাচিয়ে কুঁদিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। আর সবাই হাততালি দিয়ে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল।

বেন্দা নিজেকেই ভুলে গিয়েছিল। এখনো ভুলে আছে। ওর পক্ষে এখন

কান্ত কুণ্ডুর চিৎকারের হাঁক শোনা সম্ভব নয়। আজকের দিনটাই শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। ওর জীবনে আজকের দিনটা একটা ব্যতিক্রম এ কথা ওর এখন মনে নেই। ভাঙের প্রকোপে ও এমন মত্ত, কাদের সঙ্গে নাচতে নাচতে দোকানের কাছে চলে এসেছে বুঝতে পারছে না। এখন ওর খালি গা, জামাটা গলায় জড়ানো। সারা গায়ে মাথায় মুখে খাবারের দাগ আর মিষ্টির রস লাগানো। কিন্তু ওর নাচন-কোঁদনে এখন আর তেমন জোর নেই। চোখের পাতা সীসার মতো ভারি হয়ে এসেছে। কী ভাবে কোমরের প্যাণ্টটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল, ও জানে না। সেটা এক হাতে চেপে ধরে আছে। এখন ওর জিভটাও সীসার মতোই ভারি। তবু লাফিয়ে উঠে হাঁকল 'পেলে লেগে যা।'

দোকানের সামনে কান্ত কুণ্ডু মদের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'গোপাল, এবার বাড়ি যেতে হয়। ঘাউরার বাচ্চাটাকে গুদামের মধ্যে ঢুকিয়ে দোকান বন্ধ কর। ওকে বোধ হয় বাড়ি থেকে গুচ্ছের ভাঙ গিলিয়ে দিয়েছে।' বলে সে হাসল, এবং আবার বলল, 'বানচোত ছাগল বাচ্চার মতন লাফাচ্ছে।'

গোপাল উঠে গেল বেন্দার কাছে। ওর গলায় জড়ানো শার্টটা চেপে ধরে বলল, 'এই গোঁদো পিঁপড়ের বাচ্চা, এবার শুয়ে পড়বি চল।' বলে টেনে নিয়ে চলল।

বেন্দা কোনো আপত্তিই করল না। এক হাতে খসে পড়া প্যাণ্টটা ধরে টানতে টানতে এগিয়ে এল। দোকানের দরজা খুলে, ওকে ভেতরে ঢোকানো হল। তারপরে গুদামের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে, গোপাল দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

বেন্দা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। কোনো শব্দও ওর কানে আসছে না। কোমরে প্যাণ্ট ধরা হাতের মুঠি আলগা হতেই সেটা খুলে গেল। ও টানতে লাগল। আর টলতে টলতেই জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'পেলে লেগে যা।'

লাফাতে গিয়ে কয়েকটা বস্তার ওপর গড়িয়ে পড়ল। এখনো ও হাসছে আর অবাক মজার কথাটাই মনে মনে বলছে, 'পেলে লেগে যা।'

অন্যান্য দিন গুদামঘরের অন্ধকারে ও যে খেলা করে আজ আর ওর সে উপায় নেই। জীবনের একটি মাত্র খেলার কথা আজ ওর মনে নেই। কিন্তু সেই লাল অঙ্গার বিন্দুগুলো কাছে দূরে উঁচুতে নিচুতে জ্বলে উঠতে লাগল। তারপরে এক সময়ে অনেকগুলো, প্রায় অগুনতি লাল অঙ্গার বিন্দুগুলো, সম্মোহিতের মতো ওর সামনে এগিয়ে এল। সম্ভবত ওর আঘাতের জন্যই তারা অপেক্ষা করল। কিন্তু ওকে একেবারে স্থির নিশ্চল দেখে ওরা ওর গায়ের ওপর ওঠল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আর ওর গায়ে ঠোঁটে কানে চুলে, গলায় বুকে পেটে বস্তিদেশে, যত জায়গায় যত খাবার লেগেছিল সেগুলো খেতে আরম্ভ করল।

পরের দিন সকালবেলা গোপালই গুদামঘরের দরজা খুলল। বেন্দার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল। অন্ধকারের দৃষ্টিটা সরে আসতে বেন্দার

নগ্ন শরীরটা চোখে পড়ল। গোপাল ডাকল, 'এই টিকটিকির বাচ্চা।'

বেন্দা নড়ল না, কোনো জবাব দিল না। কেবল ওর গায়ের কাছ থেকে কয়েকটা ইঁদুর ছুটে পালাল। গোপাল ঝুঁকে মাথা নিচু করে দেখল। দেখা গেল বেন্দার সারা গায়ে মুখে লাল ঘায়ের মতো দাগ। কোথাও কোথাও ঘায়ের থেকে যেন টাটকা রক্ত চুইয়ে পড়ছে। গোপালের গাটা কেমন শিরশির করে উঠল। সে ডাকল, 'বন্ধুই একবার এদিকে এসো।'

কান্ত কুণ্ডু এগিয়ে এল। দোকানঘর থেকে আগেই গুদামের আলোর সুইচটা টিপে দিল। গুদামের ভিতরে এসে সে বেন্দাকে দেখল। খানিকক্ষণ দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এই শুয়োরের বাচ্চাটার চোখের মণি, নাকের ডগা শুদ্ধ খেয়ে ফেলেছে। বানচোৎ কি বেঁচে আছে এখনো?'

গোপাল, আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে খেয়েছে?'

'ওরই পাঁচ দশ পয়সার রেটের মালেরা।' কান্ত কুণ্ডু বলল, 'নেংটি আর ধেড়েগুলো।' বলে সে দোকানের অন্যান্য কর্মচারীদের চিৎকার করে ডাক দিল। বলল, 'এই ইঁদুরের বাচ্চাটাকে বের করে রাস্তায় নিয়ে যাও। গোপাল তুমি তারাপদ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।'

কয়েকজন নগ্ন বেন্দাকে ধরাধরি করে রাস্তায় এনে শুইয়ে দিল। দেখলেই বোঝা যায়, ওর সারা শরীরটা একটা কাপড়ের মতোই কুটিকুটি করে খাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শরীরের অস্থিহীন নাম সব অংশই খেয়ে নিয়েছে। ও নিশ্চয়ই অচেতন অবস্থায় হাঁ করে ছিল। জিভটা পর্যন্ত কিছুটা কুরে খাওয়া হয়েছে।

ভিড় বাড়তে আরম্ভ করেছিল। তারপর ডাক্তার এলেন। দেখে বললেন, 'বেশিক্ষণ মরেনি। যে ভাবে খেয়েছে, বাঁচানো যেতো না। গোটা শরীর বিষিয়ে গেছে। ওকে একটা ঢাকা দিয়ে দাও।'

সকালের রোদ পড়েছে বেন্দার গায়ে। চোখের রক্তাক্ত কোটর দুটোতে রোদ চিকচিক করছে। একটা খুশির দিনের ব্যতিক্রম কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে, ও কি তা জানত? বোধহয় না।

মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা...

আজ ছুটি। আজ উৎসবের দিন। আজ পনেরই আগস্ট। আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পূর্তি দিবস। আজ ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। (মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল!) লক্কা পায়রা ওড়াবার খবর পাওয়া যায়নি, তবে একুশবার তোপধ্বনির খবর সারা দেশের লোক জেনে গিয়েছে। কারণ এখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

আজ যে-যাই বলুক বা বলুন, 'গণতন্ত্রের আসন্ন বিপদের সংকেত দেখা দিয়েছে' 'দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে' কিন্তু আজ আনন্দের দিন। আজ পতাকা ওড়াবার দিন, গৃহস্থেরাও সন্ধ্যা পর্যন্ত পতাকা ওড়াতে পারে, আজ রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবীদের বিশেষ ব্যস্ততার দিন, কারণ আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে, জনসাধারণকে তাদের মহান কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, বিশাল বোঝা বহন করবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, তথাপি আজ বড় আনন্দের দিন. (মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল।) কারণ এই বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, অতএব আজ আলিপুরের চিড়িয়াখানা শিশু উদ্যানে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খোকাখুকুদের বিনা পয়সায় ঢুকতে পারা থেকে শহরে গ্রামে গঞ্জে তাবৎ বাচ্ছাদের মিষ্টি খাওয়াবার দিন, নানা রকম খেলাধূলা ছবি আঁকা ইত্যাদির হারজিতের দিন, নানা রকম কুচকাওয়াজের দিন, ভবিষ্যতে তারা কী হবে বা হতে যাচ্ছে, সে-কথা ওদের মনে করিয়ে উপদেশ দেবার দিন, কারণ, ওরা কারা? ('বাচ্ছালোগ, এক দফে হাততালি লাগাও, ইয়ে হ্যায় মাদারিকে খেল' রাস্তায় আজ এখন খেলোয়াড় খেলা দেখাচ্ছে, কেন না আজ ছুটির দিন, খুশির দিন। চটপট হাততালি পড়ছে, এবং সেই সঙ্গে 'লে হালুয়া, লে হালুয়া!' খুশির চিৎকার শোনা যাচ্ছে।) ওরা দেশের ভবিষ্যৎ!

আজ এই উৎসবের দিনে তাই দিকে দিকে মাইকের চড়া আওয়াজে গান বাজছে, কে কতো আওয়াজ বাড়াতে পারে, তার জন্য রেষারেষি চলছে। সব অবশ্য দেশাত্মবোধক গান না, কেন না আজ ফুর্তির দিন ও তো বটে! যাদের যেমন ইচ্ছা, হিন্দি, বাংলা, সিনেমার গান, পপ্ সঙ সবরকমই শোনা যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা? বৃষ্টি পড়ছে? বাজার চড়া? তা হোক, আজ ছুটি, আজ উৎসব, আজ পনেরই আগস্ট। আজ এই উত্তর শহরতলির পথে পথেও লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, জটলা করছে, আর হাসিখুশির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করছে! কেন না প্রতিবাদও তো করতে হবে। খুশি উৎসব ছুটি প্রতিবাদ, সব মিলিয়েই আনন্দ। সেই কতকালের দুর্ভাগিনী দেশমাতাকে ডাস্টবিনের

পাশ থেকে তুলে এনে, খড়মাটি রঙ দিয়ে নতুন করে বানানো হয়েছে। মায়ের আজ বত্রিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তার সঙ্গেই এ বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পড়ে গিয়েছে। মায়ের জন্মদিনে আজ শিশুদেরই তো সব থেকে বেশি কদর করতে হবে।

'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল!'…আট দশ থেকে চৌদ্দ পনেরো বছরের, খালি গায়ে ধুলা-কাদা মাখা, বেশে সব ছেঁড়া ঝোল ঝাপ্‌পা পাত্‌লুন ইত্যাদি পরে আধ ন্যাংটার দল। একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, একটা ছেলের মড়া কাঁধে বয়ে, রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে, আর চেঁচাচ্ছে, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল!'—মড়া ছেলেটার ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা ঝুলে পড়েছে, আর বাঁশ কাঁধে ছেলেদের নাচের তালে তালে, ছেলেটার মাথাও নাচছে।

খুশির দিনে অবাক জলপান! কী মজা! হা-ঘরে ভিখিরি, শহরের আপদগুলোর ধ্বনি আর নাচের তালে, অনেকেরই শরীরে তাল লেগে যাচ্ছে। হাসছে কেউ, অবাক কেউ। শহরের যতো খুদে আপদ, নেংটি ইঁদুরের বাচ্ছাগুলো এ আবার কী সঙ্‌ বের করেছে? সত্যি মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি মজা মারছে। বাঁশে বাঁধা ছেলেটা কি আজই মরেছে নাকি? বড ভালো দিনে মরেছে তো!

আজ বড় ভালো দিন!

কিন্তু আজকের ভালো দিনটিতে প্যাল্‌গা ফরসা মরেনি। সে সৌভাগ্য ও করে আসেনি। ও মরেছে গতকাল দুপুরের একটু পরে। শহরের যে খাল নর্দমাটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, যার দুপাশে ঘিঞ্জি শহরের খাটা পায়খানা, বাড়ি-বাজারের পিছন দিকে, যতো নোংরা জল আবর্জনা ভেসে যায়, তারই ধারে কোনো এক কালের একটা পুরনো ধ্বসে পড়া বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে, লোক চোখের আড়ালে, ওদের একটা আস্তানা আছে। শহরের বাজারের পাশে একটা গলি দিয়ে ঢুকলে, খোলা খাল নর্দমাটার ধার দিয়ে সেই পোড়োর চাতালে যাওয়া যায়। ডান দিকে ঘিঞ্জি পাকা বাড়ি, নিচে সবই দোকান-পাট, দোতলা তেতলায় মানুষ থাকে। সামনের দিকে শহরের বাজার দোকানের রাস্তা। পিছন দিকে খোলা খাল নর্দমাটা, যতো নোংরা ফেলার পক্ষে বড় সুবিধা।

বাঁদিকে, খাল নর্দমাটার পাড় বাঁচিয়ে, বেশ্যাপল্লী, জুয়ার আড্ডা, বেআইনি মদ চোলাইয়ের কারখানা। যে-টুকু পাড় বাঁচিয়ে রেখে শহরের এই অংশ মৌমাছির চাকের মতো জমে উঠেছে, সেই পাডটুকুতে যে-কোনো বয়সের মেয়ে পুরুষরাই প্রস্রাব পাইখানা করে। নোংরা জঞ্জাল তাদেরও কিছু কম না। সবই খাল নর্দমার ধারে ধারে জমা হয়। তারই পাশ কাটিয়ে, ময়লা নোংরা মাড়িয়ে, প্যাল্‌গা ফরসাদের পোড়োয় যাবার রাস্তা। আর গঙ্গার ধারের ক্যাওরাপাড়ার যতো ধাড়ি শুয়োরের দল, সেই খাল দিয়ে, বাজারের গলির মোড় অবধি যাতায়াত করে। বাড়ি বাজারের যতো নোংরা, জঞ্জাল, বিষ্ঠায় আর খালের পাঁকে, ধারে ধারে জঙ্গলের

শিকড় মূলে খাবারের বড় মোচ্ছব তাদের।

গতকাল দুপুরে প্যাল্‌গা ফরসার বন্ধুরা, পোড়ো বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে গিয়ে দেখতে পায়, ও একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে। সাধারণত, ঘোর দুপুরে বাজার যখন ফাঁকা থাকে, দোকানপাটগুলো ঝিমোয়, রাস্তাঘাটে লোকজনের ভিড় কমে যায়, এমন কি রেল ইস্টিশনেও যাত্রীদের আনাগোনা কম, আর সিনেমা ম্যাটিনি শো (আজকাল বেলা একটা দেড়টার মধ্যেই ম্যাটিনি শো শুরু হয়ে যায়।) শুরু হয়ে যায়, তখন ওরা যে যেখানেই থাকুক, ওদের নিরালা আস্তানায় এসে জড়ো হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যার যা আয়, সব ওরা নিজেদের সামনে ঢেলে দেয়। আয়ের সব থেকে মূল্যবান বস্তু হলো পয়সা। সবই ভিক্ষের পয়সা। চুরি, পকেটমারা, বাটপাড়ি করে পয়সা রোজগারের পথে এখনও ওরা যায়নি। অথবা যাবার সাহস হয়নি। তার জন্যে শহরে আলাদা দল আছে। তারা ওদের সঙ্গে মেশে না, বরং কাছে পিঠে দেখলেই তাড়া করে। তাদের চেহারা আলাদা, ভাবভঙ্গি আলাদা আর তাদের আস্তানাও অন্য জায়গায়। সেখানে অনেক বড় বয়সের লোকেরা আছে। সেই সব লোকেরা আবার শহরের পুলিশদের, বাবুদের কপালে হাত ঠুকে সেলাম করে, হেসে কথা বলে, হাবভাব অনেকটা বাবুদের মতো। তাদের আস্তানাটাও প্যাল্‌গা ফরসার বন্ধুরা চেনে। পাড়ায় ঢোকবার বাঁ পাশেই দিদি, মাসীদের (বয়স অনুপাতে, বেশ্যাদের ওরা এই রকম সম্বোধন করে, এমন কি খুড়ি জেঠি দিদিমাও আছে) পাড়ার ভিতরে তাদের আস্তানা। এই আস্তানায় এদের যাওয়া নিষেধ। ওদের যাবার কোনো দরকারও হয় না। পাড়ার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করলেই সব জানা যায়।

বরং সেই আস্তানার অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ ওদের জঙ্গল ঘেরা পোড়োর চাতালে হানা দেয়। চোখ পাকিয়ে মুখ শক্ত করে ওদের দিকে তাকিয়ে ভাখে, আশেপাশে নজর করে, জিজ্ঞেস করে, 'কী রে ছুঁচো হারামীর দল, কী করছিস? ছিঁচকেমির মালগুলো কোথায় গাপ্‌ করে রেখেছিস?'

প্যাল্‌গা ফরসাদের মধ্যে সব থেকে যার বয়স বেশি, ওর নাম চটা। চটা শব্দের মানে নাকি চড়ুই পাখি, এটা ও নিজেই বলে। কিন্তু দলপতি হিসাবে ওর সাহস সব থেকে বেশি। ও ওর ছেঁড়া পাতলুনের গিট খুলে ভাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'ভাখ কোথায় রেখেছি।'

চটার কাণ্ড দেখে, ওর বন্ধুরা হেসে ওঠে, আর 'আস্তানা'র চোখ পাকানোর দল তেড়ে মারতে আসে। চটারা তখন এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করে, কিন্তু হাসে, আর জবাব দেয়, 'আমরা চোর চোট্টা নই, বুইলে বাবা? আমরা মেগে নিই, ভেবেচিন্তে খাই।'

'আর রোজ যে ভিখ্‌ মেগে নগদ পয়সা নিয়ে আসিস, সেগুলো কোথায় যায়? আস্তানার ওস্তাদরা জিজ্ঞেস করে, চোখে তাদের কুটিল সন্দেহ। অবিশ্যি এই যে

ওস্তাদরা কেউই বয়সে খুব বড় না। চটাদের থেকে দু-চার বছরের বড়, দলের হয়ে কাজ করে। ওরাই মাঝে মাঝে চটাদের ওপর খবরদারি করতে আসে। এটাই নিয়ম। একদল, আর এক দলের ওপর সর্দারি করে। চটারাও সর্দারি করে। শহরের একেবারে পুঁচকে মাগার দলগুলো, নাকে শিকনি, চোখে পিচুটি, পেটে মদ পড়লে রাস্তার যেখানে-সেখানেই বসে যায়, অনেকের মুখের বুলি এখনও পরিষ্কার ফোটেনি, চটারা তাদের ওপর সর্দারি করে।

চটারা জবাব দেয়, 'নগদ পয়সা? বাবুদের হাতে ঘা, নগদ কে দেবে? যা দু এক পয়সা পাই, তখুনি কিছু কিনে খেয়ে ফেলি। যাবে আবার কোথায়? ওই যে, দেখছ না? ওখেনে সব আছে।' চারপাশে ছড়ানো বিষ্ঠা দেখিয়ে দেয় আর হাসে।

আস্তানার ওস্তাদেরা গরগরিয়ে তেড়ে আসে। যাকে ধরতে পারে, চাটি দুটো মেরে, সারা গায়ে মাথায় হাতড়ায়। হয়তো কারো ছেঁড়া ঝোল-ঝাপ্‌পার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দু একটা দুই পাঁচ দশ পয়সা। তাই নিয়েই কেটে পড়ে। যাবার আগে হেঁকে যায়, আবার আসবে।

আসে ওরা, পায় ওই রকমই, তার বেশি না। কিন্তু চটাদের সকাল থেকে দুপুরের নগদ আয়, সাত আট জনের মিলিয়ে, কোনদিনই এক দেড় টাকার কম হয় না। অবিশ্যি সবদিন না। কোনো কোনো দিন আরও অনেক কম হয়। তবে, কোন সকালে বেরিয়ে, ঝিমনো দুপুরে ফিরে আগে ওরা যে যার নগদ পয়সা একসঙ্গে হিসাব করে করে। তখন একজনকে চাতালের থেকে এগিয়ে, জঙ্গলের ধারে লুকিয়ে পাহারা দিতে হয়, কেউ আসছে কী না। নিজেদের মধ্যে নিয়মটা কেমন করে গড়ে উঠেছে, ওরা নিজেরাই জানে না। আসলে, এদের সাত আট জনের দলটা যখন কয়েক বছর থেকে গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই, ওরা যে যার মেগে পেতে পাওয়া যা কিছু একসঙ্গে জড়ো করে। হিসেব নিয়ে ঝগড়া মারামারিও আছে। কেন না, কেউ হয়তো যা পেয়েছে, তা থেকে খরচ করে খেয়ে ফেলেছে বেশি। হিসাব তো কেউ দেয় না। একজন আর একজনের চোখে পড়ে যায়। ইস্টিশান আর বাজার আর সিনেমা হল ঘিরে, শহরে মেগে বেড়াবার চৌহদ্দি খুব বড় না।

পয়সার হিসাবের পরে, আগেই সেগুলো চালান হয়ে যায়, পোড়োর পিছনে জঙ্গলে একটা ইট, চুন সুরকির চাংড়ার নিচে। পাহারাদারকে ডেকে এনে, তারপরে যে যার ভিক্ষের ঝুলি ঝোলকোটা খোলে। একটা খবরের কাগজ পেতে, তার ওপরে সব ঢালে। মুড়ি, চিঁড়ে, ভাঙা বিস্কুটের টুকরো, পাঁউরুটির টুকরো, বাবুদের মুখের থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সিঙাড়া, জিলিপি, গজা, এমন কি রসগোল্লা সন্দেশের কুচিও তার মধ্যে থাকে। সব মিলিয়ে মাখিয়ে, এক এক জনের এক আধ মুঠো করে হয়ে যায়। তারপর যে যার ঝোল-ঝাপ্‌পার কষি কোমর খুঁজে বের করে পোড়া সিগারেটের টুকরো।

আগেই বড়গুলো বাছাই করে, যে যার মতো তুলে নেয়। দেশলাইও একটা থাকে। আগে একজন ধরায়, বাকিরা তার কাছ থেকে ধরায়। শুরু হয় ধূমপানের মজলিস আর খ্যাকর খ্যাকর কাশি। প্যালগা ফরসা বা কোড়ে, ওদের বয়স আট-নয়ের বেশি না। লুকা, চেনো, রামের দশ-বারোর মধ্যে। চটা, টোনা তের-চৌদ্দর কাছাকাছি। বগ্‌গিরও তাই, তবে ও প্রায়ই দলছুট হয়ে হঠাৎ কোথায় কোথায় হাওয়া হয়ে যায়। দলের মধ্যে বগ্‌গিই একমাত্র বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। প্রায়ই ভবঘুরের মতো এদিকে ওদিকে চলে যায়, আবার ফিরে আসে।

প্যাল্‌গা ফরসা, কোড়ে, লুকা, চেনো, রাম ওরা এখনও পাকা সিগারেট-খোর হয়ে উঠতে পারে নি। টানতে টানতে কাশে, কাশতে কাশতে লালা ঝরে, চোখগুলো লাল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসে, হাঁপায়, তবু টানতে ছাড়ে না। ওরা এ শহরের ছেলে না, নানা জায়গা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে। কার বাপ-মা কোথায় কেউ জানে না। কারো কারো বাপ মায়ের কথা একটু আধটু মনে আছে, কোথায় কবে যেন ছিল। এখন আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না! কাকে কার বাবা মা এ শহরে ছেড়ে গিয়েছে, মনে করতে পারে না। কতটুকু বয়সে কে এই শহরে এসেছিল, মনে নেই। বাজারের ধারে, ইস্টিশানে, রাস্তার ধারের দোকানের ঝাঁপের তলায় থাকতে থাকতে ওরা এ বয়সে পৌঁছেছে। আস্তে আস্তে মিলেছে। এ শহরে খুঁজলে এরকম আরও দু চারটে দল পাওয়া যাবে।

কে বা কারা ওদের নামগুলো রেখেছে? তাও ওরা জানে না! ওরা নিজেরা নিজেদের নাম রাখেনি, অথচ যে যার একটা নাম নিয়েই এসেছিল। এর থেকে বোঝা যায়, একদা কেউ ওদের ছিল, বোধহয় যারা জন্ম দিয়েছিল, আর তারাই নামগুলো দিয়েছিল। কেবল প্যাল্‌গার নাম পাগলা কী না এটা ওরা, কোনোদিন ভেবে দেখেনি। ও নিজের থেকেই বলত ওর নাম প্যাল্‌গা। আর ফরসা কথাটা জুড়ে দিয়েছে দলের সবাই মিলে। কারণ ওর রঙ বেশ ফরসা। কেউ কেউ শুধু ফরসা বলেই ডাকে। পুরো নাম প্যাল্‌গা ফরসা।

দুপুরে শহর যখন ঝিমোয়, সে সময়টা ওদেরও আড্ডা বিশ্রাম গল্পের সময়। কেউ চিত হয়ে শুয়ে পড়ে তার ঘাড়ে আর একজন। কেউ কারো পিঠে তাল ঠুকে গান গায়। কেউ কোমরের ঝোল-ঝোপ্‌পা খুলে, বসে যায় খাল নর্দমার ধারে, আর দরকারে নর্দমার জলই ব্যবহার করে। ধাড়ি শুয়োরের দল সাধারণত গন্ধের ঝোঁকে আসে। দুপুরে এসে গেলেই ওরা ইট ছুড়তে শুরু করে। খাল নর্দমায় শুয়োরের দাপাদাপি, চিৎকার, তার সঙ্গে ওদেরও শিকারের হৈ হল্লা উন্মাদনা। কে ঠিক তাগ্‌ কষে মারতে পেরেছে, তাই নিয়ে বাদানুবাদ। বাদানুবাদ থেকে মারামারি। মারামারিটা

আসলে খেলা।

ওদের সব থেকে মজার গল্প হয় দোকানদার, রাস্তার, সিনেমার আর ইস্টিশানের বাবুদের নিয়ে। অধিকাংশ দোকানদারের হাতের কাছেই ছপ্‌টি থাকে, বিশেষ করে ওদের তাড়াবার জন্যই। একবারের বেশি দু-বার হাত বাড়ালেই, 'তবে রে হারামির বাচ্চা।'…কোন্ দোকানদারের ভাবভঙ্গি ভাষা কেমন, সব ওদের মুখস্থ, নকল করে দেখায়। ওরা তরিতরকারি মাছের বাজারে ঢোকে না কিন্তু খৈ মুড়ি চিঁড়ের বাজারে ওরা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। দড়ি ছেঁড়া গরু ছাগলের সামনে, শাকের খেতের মতো, খৈ মুড়ি চিঁড়ের বাজারটা। বড় বড় বস্তার মুখগুলো দোকানের সামনে খোলা থাকে। খদ্দের এসে হাতে করে ভালো মন্দ পরখ করে। খদ্দেরের ভিড়ের মধ্যে গরু ছাগল যে আসে না, তা না। বিশেষ করে গোটা দুয়েক ষাঁড়, তাদের জন্য দোকানীরা সব সময়েই ডাণ্ডা উঁচিয়ে আছে। ওরাও সেই ফাঁকে এক আধ মুঠো, ঝটিতি তুলে মুখে পুরে দেয়, না তো ঝোলায় ঢোকায়। দোকানীর চোখে পড়লেই ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া। মাঝে মধ্যে দু চার ঘা পিঠে পড়েই। আর খিস্তি খেউড ?

গালাগালগুলো ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে আর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। শহরের দোকানদাররা সবাই ওদের চেনা। কিন্তু বাবুরা না। বাবুদের এক একজনের এক একরকম ভাব। খিটখিটে মেজাজের বাবুদের চেনা যায়। 'বাবু, সারাদিন খাইনি বাবু, বাবু—' কথা শেষ হবার আগেই তারা খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভাগ, শালা! যত্তো এঁটুলির দল!'

ওরা মনে মনে বলে, 'তোর বাবা এঁটুলি।'…কিন্তু মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কোনো বাবু আছে, তাকায়ও না, কথাও বলে না। যেন দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। কিন্তু রাগও করে না, বড় জোর অন্যদিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। কোনো কোনো বাবু কেবল হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে, গায়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কোনো কোনো বাবু বলে, 'মাপ কর বাবা।' আবার এমন বাবুও আছে, কাছে গিয়ে হাত বাড়ালে, কথা বলে না, কপালে একটা আঙুল ছোঁয়ায়। যেমন অনেক বাবু রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে, বা ঠাকুর-দেবতার সামনে পড়ে গেলে, ঠিক একটি আঙুল কপালে ছোঁয়ায় সেইরকম।

এক এক বাবুর একরকম চাল। মা-দিদিমণিদেরও সেইরকম। সবাইকেই ওরা নিখুঁত নকল করে, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। আবার সেই সব বাবু মা-দিদিমণি দোকানদারদের কাছ থেকেই ওদের যা জোটবার জোটে। কে কেমন দেয়, কী ভাবে দেয়, কী বলে দেয়, সে-সবও ওরা নিজেদের নকল করে দেখায়।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পরেই আবার ওরা বেরিয়ে পড়ে। যাবার আগে, চাতালের পিছনে, ইট-চুন-সুরকির চাংড়ার নিচে থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে যায়। রাত্রের ভিড়টা কমে আসতে আসতেই, ওরাও গিয়ে জড়ো হয় ইস্টিশান

থেকে দূরে, রেললাইনে। সারাদিনের মেগে পেতে পাওয়া পয়সা নিয়ে, খাল নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে ফিরে যাওয়া মানে, সব হাপিস্। ও পাড়ার আস্তানার মস্তানরা এসে সব কেড়ে নেবে। এরকম কয়েকবার হয়েছে। সেই থেকে রেললাইনের নিরালায় বসে আগে পয়সার হিসাব করে। জমাবার কোনো প্রশ্ন নেই। রেললাইন থেকে চলে যায় শহরের হোটেলগুলোর দরজায় দরজায়। গরম টাটকা ভাত-তরকারি নিয়ে ওদের জন্য কেউ বসে থাকে না। বাসি, বাড়ন্ত নষ্ট সব মিলিয়ে যা জোটে, পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। কাগজে শালপাতায় মুড়ে খাবার নিয়ে ফিরে যায় আবার রেললাইনে। একপাল কুকুরও সঙ্গে জুটে যায়। একদিকে কুকুর তাড়ানো, আর একদিকে ভাগজোত। সারাদিনে সেটাই ওদের আসল খাওয়া। সব মিলিয়ে সাত-আটজনের পক্ষে অবিশ্যি সেই খাবার পেট ভরবার মতো না।

তারপরে ইস্টিশানের কলের জলে, পেট ঢাক করে, আবার খাল নর্দমার ধারে, জঙ্গলে ঘেরা পোড়োয়। আস্ত ঘর বলতে কিছু নেই, দু-একটা ঘরের মাথায় এখনও দু-চার হাত ছাদ ঝুলে আছে। তার সঙ্গে গাছপালার আড়াল। সেখানে গিয়ে যে যার ঘাড়ে-ঠ্যাঙে-মাথায়-পায়ে দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাঁদিকের পাড়াটা তখন, মেয়ে-পুরুষ মাতালের চিৎকারের হল্লায় সরগরম! ওদের তাতে কিছু যায় আসে না। নেহাত খুনটুন হয়ে গেলে, পুলিস এলে, ওরা খাল-নর্দমার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যায়।

পেছনে কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। দিন আসে, রাত যায়, ওদের জীবনটাও কাটে। জীবন? তাই বলতে হবে। সব জীবেরই জীবন বলে একটা বস্তু আছে। জীবন তো নিরবধি। মানুষ অমর, কোনো সন্দেহ নেই! না হলে নিরবধি জীবন মিথ্যা হয়ে যায়। সেই নিরবধি জীবনের ছোট একটা গুচ্ছ, গতকাল দুপুরে, খাল-নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে এসে দেখলো প্যাল্‌গা ফরসা একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে আছে। ফরসাটা তখন সাদা প্যাংলা। মুখের কষে রক্ত, ঠোঁটের ফাঁকে কয়েকটা মুড়ি লালায় জড়ানো। চোখ দুটো মরা মাছের মতো, তারা দুটো নড়ছে না। ঘাড় আর কানের কাছে দু-তিনটে বড় পটলের মতো ফুলে উঠেছে!

প্রথম এলো টোনা আর কোড়ে। কোড়ে বললো, 'ফরসা শালা কোথায় প্যাদানি খেয়ে এসেছে।'

টোনা কাছে এসে বললো, 'কীরে প্যাল্‌গা, কেউ মেরেছে?'

প্যাল্‌গা ফরসার গলা দিয়ে গোঙানো শব্দ বেরুলো, 'অঁ-অঁ-অঁ।'

'কে মেরেছে?' টোনা জিজ্ঞেস করলো।

প্যাল্‌গা ফরসা তখনই জবাব দিতে পারলো না। একে একে ওদের সবাই এলো। সবাই প্যাল্‌গা ফরসাকে ঘিরে বসলো। চটা প্যাল্‌গা ফরসার ঘাড় আর কানের কাছে হাত দিয়ে বললো, 'শালা, খুব জোর মেরেছে। কে মেরেছেরে?'

প্যাল্‌গা ফরসা গোঙানো স্বরে যা অস্পষ্ট উচ্চারণ করলো, তা বোঝা গেল না, শোনা গেল, 'কঁ-অঁ-সা।'

সবাই মুখ তুলে সকলের মুখের দিকে তাকালো। বগ্‌গি বললো, 'কদম সা, মুড়িওয়ালা।'

'শালা নিজে যেমন মোটা, ওর ঠ্যাঙাবার ডাণ্ডাটাও তেমনি।' রাম বললো।

লুকা বললো, 'ওর মুখে মুড়ি লেগে রয়েছে।'

চেনো জিজ্ঞেস করলো, 'বস্তা থেকে মুড়ি খেতে গেছিলি, না?'

প্যাল্‌গার গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো, 'অঁ-অঁ-অঁ…।'

'ওর মুখের থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।' রাম বললো।

জটা প্যাল্‌গাকে টেনে চিৎ করলো। প্যাল্‌গার হাত দুটো ল্যাটপেটিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। গা-টা ঠাণ্ডা।• জটা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, যন্তন্না হচ্ছে?'

প্যাল্‌গার গোঙানো স্বরটা আরও ঝিমিয়ে গেল, চোখের কোণ বেয়ে জল পড়লো। অথচ ও কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। চোখের তারা দুটো নিথর। মুখটা একটু হা-করা, কয়েকটা মুড়ি বাইরে ভিতরে লালায় জড়িয়ে এখন শুকনো, আর কষে রক্ত। রোগা ফরসা খালি গায়ের নানা জায়গায় ধুলো কাদা। কোমরে একটা ঢলঢলে ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা। একপাশের অর্ধেক নেই, আর এক পাশেরটা ছিঁড়ে সুতো ঝুলে পড়েছে।

বগ্‌গি জিজ্ঞেস করলো, 'কখন মেরেছে? কখন এখেনে এইচিস?'

প্যাল্‌গা ফরসার ঠোঁট নড়লো, কথা বেরুলো না। ওর ঠোঁটে মাছি বসছে দেখে, রাম হাত নাড়লো। কোড়ে ডাকলো, 'প্যাল্‌গা ফরসা! এই প্যাল্‌গা!'

প্যাল্‌গার ঠোঁটও নড়লো না, টোনা বলে উঠলো, 'ও মরে যাচ্ছে রে!'

চটা ঝুঁকে পড়ে দু হাত দিয়ে প্যাল্‌গাকে জড়িয়ে ধরে নাড়া দিল, ডাকলো, 'এই ফরসা! ফরসা!'

বগ্‌গি প্যাল্‌গার বুকে হাত দিল, বল্‌লো, 'ধুকধুকি নেই। নিশ্বেসও পড়ছে না।'

'কী হবে এখন?' লুকা লাফ দিয়ে দাঁড়ালো, ওর চোখে-মুখে ভয়।

ওর দেখাদেখি চেনো আর রামও উঠে দাঁড়ালো। টোনা বললো, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমরা কি মেরেছি?

রাম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'পুলিস ধরে নিয়ে যায় যদি?'

স্বাভাবিক! এ পাড়ায় কেউ মরলে, খুন হলে, আগেই পুলিস আসে, আর লোকজনকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যায়।

এসব চোখে দেখা ঘটনা। কেবল কোড়েটাই চটা টোনা বগ্‌গির সঙ্গে বসে, প্যাল্‌গা ফরসার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

চটা বললো, 'কিন্তু মরেছে কী না, কী করে বুঝব? মার খেয়ে তো অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। প্যাল্‌গাও সেই রকম রয়েছে কী না, কে বলবে?'

বগ্‌গি বললো, 'চল্‌ তালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

'এই দুপুরে কোনো ডাক্তারবাবুরা থাকে না।' টোনা বললো, 'এখন বাবুরা বাড়িতে খেতে গেছে। তবু ছাখ তো আবার ডেকে, কথা বলে কী না।'

কোড়ে প্রায় চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'প্যাল্‌গা! প্যাল্‌গা, এই প্যাল্‌গা!'

প্যাল্‌গা যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এখন দেখা গেল, ওর কানের ভিতর থেকে গালের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ল। বগ্‌গি বললো, 'মরেই গেছে মনে হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে লুকা চেনো রাম সরে পড়েছিল। একটু পরেই দেখা গেল, পাড়ার মেয়েপুরুষরা কেউ কেউ চাতালে এসে উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। একজন এগিয়ে এলো। পাতলুন আর শার্ট পরা, চোখ টকটকে লাল, ষণ্ডামার্কা। সবাই জানে, ওর নাম 'টাড়ু'। মদ চোলাই, জুয়া, আর বেশ্যাপাড়ার সব থেকে বড় মস্তান। হাতে লোহার বালা, গলায় সোনার হার। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মধ্যে থাকে না। পাড়ার সবাই ভয় পায়। সে এ পাড়ার যম। টাড়ু এসে চাতালে দাঁড়ালো, দেখলো, তারপরে আস্তে আস্তেই বললো, 'এ তল্লাট থেকে নিয়ে চলে যা। তোল।'

লুকা চেনো রাম টাড়ুর পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া টাড়ুর সাঙ্গপাঙ্গরা তো ছিলই। একমাত্র কোড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাব? এখন তো ডাক্তার পাওয়া যাবে না।'

'আর ডাক্তার দেখাতে হবে না।' টাড়ু মেজাজ না দেখিয়েই বললো, 'রাস্তার ওপরে নিয়ে যা। এখান থেকে ঝামেলা হটিয়ে ফ্যাল।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি নিজেদের মধ্যে একবার চোখাচোখি করলো। জানতো এর ওপরে কথা চলবে না। ইচ্ছা করলে ওরা দৌড়ে পালাতে পারে। কিন্তু প্যাল্‌গাকে ফেলে পালাবার মতলব ওদের ছিল না। প্যাল্‌গাকে সবাই তুলে, হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে বাজারের রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালো। শুইয়ে দিল রাস্তার ধারে। লুকা চেনো রাম অবিশ্যি পিছনে পিছনেই এলো, রইলো কিছু দূরে। বিকাল হতে না হতেই রাস্তায় ভিড় জমতে আরম্ভ করলো। তারপরে এলো একজন লাঠিধারী সেপাই। সেপাই এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?'

ওরা সবাইকে যা জবাব দিয়েছে, সেপাইকেও তাই বললো, 'কদমসা মেরেছে।'

সেপাই ডাণ্ডা তুলে বললো, 'বাজে কথা বলিস না। কদমবাবুর খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। চল্‌, থানায় নিয়ে চল্‌। রাস্তায় ভিড় করা চলবে না।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি আর কোড়ে প্যাল্‌গাকে বয়ে নিয়ে গেল থানায়। সঙ্গে সেপাই। তার পিছনে লুকা রাম চেনো ছাড়াও, আরও কিছু ওদেরই মতো ছেলের দল। দারোগা বাবু সব শুনলেন, দেখলেন। সেপাইকে কী বললেন। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ কদমসা প্রায় দশ-বারোজন লোক নিয়ে থানায় এলো। আর থানার ঘরের বাইরে উঠোনের অন্ধকারে, প্যাল্‌গার মড়া নিয়ে ঘিরে বসে রইল ওর সঙ্গীরা। ঘরের ভিতরের কথা ভিতরে চললো, ওরা

কিছুই জানতে বা শুনতে পেলো না।

এক সময়ে কদমসা সদলবলে থানা থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সেই সেপাইটা এসে চটাদের বললো, 'মড়া তোল্। আজ নিয়ে গিয়ে রেলগুদামের ধারে রাখ্, কাল সকালে আমি যাব। বৃষ্টি হলে গুদামের চালার নিচে থাকবি।'

চটারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝলো না। থানায় কোনো কথা বলতেও সাহস হলো না। প্যাল্‌গার মড়া বয়ে নিয়ে চলে গেল রেলগুদামের ধারে, লাইনের পাশে খোলা জায়গায়। লুকা চেনো রামও দূরে এসে দাঁড়ালো। খোলা জায়গাটার থেকে দূরে একটা মাত্র আলো। সেই আলোয় চটারা যে যার সকালের পয়সা বের করে হিসাব করলো। টোনা শহরে চলে গেল পয়সা নিয়ে হোটেলের দরজায় দরজায় ঘুরে যা পাওয়া গেল, বাসি-বাড়স্ত সারাদিনের ভ্যাপসা নষ্ট খাবার নিয়ে এলো। প্যাল্‌গার মড়া ঘিরে বসে গেল। রাস্তার ধারেই টিউবওয়েল। জল খেয়ে যে যার কোমরের কষি থেকে সিগারেটের পোড়া টুকরো বের করে, ধরিয়ে টানলো।

বগ্‌গি বললো, 'প্যাল্‌গাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে, নইলে কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।'

ওরা সবই জানে। বিশেষ করে ভবঘুরে বগ্‌গি। কিন্তু সেপাইটা প্যাল্‌গাকে এখানে নিয়ে আসতে বললো কেন? থানায় কদমসার দল এসে কী করলো? কী কথা হলো? থানার দারোগাবাবু কী বললেন? শুভদিনের আগের মেঘলা রাত্রে, ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কেউ ছিল না। বাতাসহীন গুমোটে জিজ্ঞাসাগুলো ওদেরই ঘিরে ভাসতে লাগলো। কেবল দেখা গেল, লুকা, চেনো, রাম, আস্তে আস্তে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে এলো, আর প্যাল্‌গাকে ঘিরে সকলে একসঙ্গে দলা পাকিয়ে শুয়ে রইলো। বগ্‌গি মিথ্যা বলে নি। কয়েকটা কুকুর সারা রাত্রিই ওদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করলো।

রাত্রে চটা আর বগ্‌গি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঘলা সকালে সবাই থানার সেপাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। তোড়ে বৃষ্টি ঝরছে না, কিন্তু ঝিপঝিপ ঝরছেই। কিন্তু প্যাল্‌গার মড়া আগলানো বন্ধুদের এ বৃষ্টিতে কিছু যায় আসে না। ওরা সেপাইয়ের অপেক্ষা করছে। কেন অপেক্ষা করছে, কী করতে হবে, কিছুই জানে না। এদিকে ঝিপঝিপ বৃষ্টি শহরের মেঘলা আকাশে, একটা একটা করে মাইকের গান বাজতে শুরু করেছে। বাদলা দিনেও শহরটা ক্রমেই যেন খুশি আর ব্যস্ততায় মেতে উঠছে। কেন? আজ কী? চটারা কিছুই জানে না। ওরা সেপাইয়ের অপেক্ষা করছে। কিছু কিছু ভিখিরি ভবঘুরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। আর নানারকম কথা বলছে। চটাদের মতো আরও যেসব ছেলেরা শহরে ঘুরে বেড়ায়, ওরাও আসছে। কেবল প্যাল্‌গা ফরসার গায়ে হাত রেখে, কোড়েটা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠেছে। কাঁদতে বারণ করলেই, দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, 'কদমসার ভুঁড়িটা শালা কামড়ে খেয়ে দেব।'...

অবশেষে সেপাইটি এলো। সে একলা না, সঙ্গে আর একজন, মাথায় ঢাকা

রিকশায় চেপে। গত দিনের সেপাইটি রিকশা থেকে নেমেই প্রথমে একটা গালাগাল দিল, 'কুত্তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'···তারপরে চারদিকের ভিড়ে একবার শাসানো নজর বুলিয়ে চটাকে হাত তুলে ডাকলো, 'এই ছোঁড়া এদিকে আয়।'

চটা উঠে তার কাছে গেল। সেপাই একটু সরে গিয়ে বলল, 'ওই মড়াটাকে পোড়াতে হবে, বুঝলি? পোড়াবার খরচ আমি দেব; কিন্তু তোদের হাতে ত টাকা দেব না, মেরে দিয়ে কেটে পড়বি। একটা বাঁশ টাঁশে ঝুলিয়ে মড়াটাকে নিয়ে শ্মশানে যা, আমি সেখানে থাকব। পোড়াবার কাঠ কিনে দিয়ে, ডোমের খরচা দিয়ে চলে আসব। বুঝলি?'

চটা ঘাড় কাত করে জানালো, বুঝেছে। সেপাইটি আর কোনো কথা না বলে, রিকশায় চেপে চলে গেল। তার পরে চটার মুখ থেকে খবরটা সবাই শুনে হৈ হৈ করে উঠলো। জীবনে এরকম একটা ঘটনার কথা ওরা ভাবতেই পারে নি! শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাবার কথা শুনে, সকলেই কেমন খুশি আর ব্যস্ত হয়ে উঠলো। একটা বাঁশ যোগাড়ের অসুবিধে হলো না। বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেল। তারপর কাঁধে ঝুলিয়ে যাত্রা। কে যেন প্রথমে বলে উঠলো, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল।'···

ঝরুক ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি, তবু আজ উৎসব। প্যাল্‌গা ফরসার শববাহীদের দলটা বাড়তে বাড়তে একটা বড় মিছিলের মতো হয়ে উঠেছে। শহরের লোকেরা নেংটি ইঁদুরের বাচ্চাগুলোর নতুন সঙ দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। কিন্তু একটা সিনেমা হলের সামনে যেতেই, কয়েকজন নানা বয়সের বাবু ছুটে এসে হাঁকলো, 'এই চুপ! এখানে তোরা ওসব হাঁক ডাক বাচলামো করবি না। মুখ বুজে চলে যা। এগিয়ে গিয়ে যতো খুশি হরিবোল দে!'

প্যাল্‌গার শববাহী বন্ধুরা, আরও অনেকে চুপ করে গেল, আর নিঃশব্দে সিনেমা হলটা পেরিয়ে গেল। দেখলো, হলের সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে একটা পুলিস ভ্যান। আশেপাশে বাবু মা আর খোকা খুকুদের ভিড়। হলের মধ্যে ঢোকবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। শুধু হলের মাথায় লাল কাপড়ের ওপর সোনালী অক্ষরের লেখাগুলো ওরা পড়তে পারলো না। সেখানে লেখা ছিল,

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯!

'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ'

'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠুক ওদের জীবন'

প্যাল্‌গা ফরসার শবযাত্রীরা সিনেমা হলটা পেরিয়ে আবার হাঁক দিল, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা···।' কেবল কোড়েটাই কাঁদছে, আর দুধের দাঁতগুলো চিবিয়ে বলছে, 'কদমসার ভুঁড়ির মাংস একদিন কামড়ে ছিঁড়ে খাব।'···

———